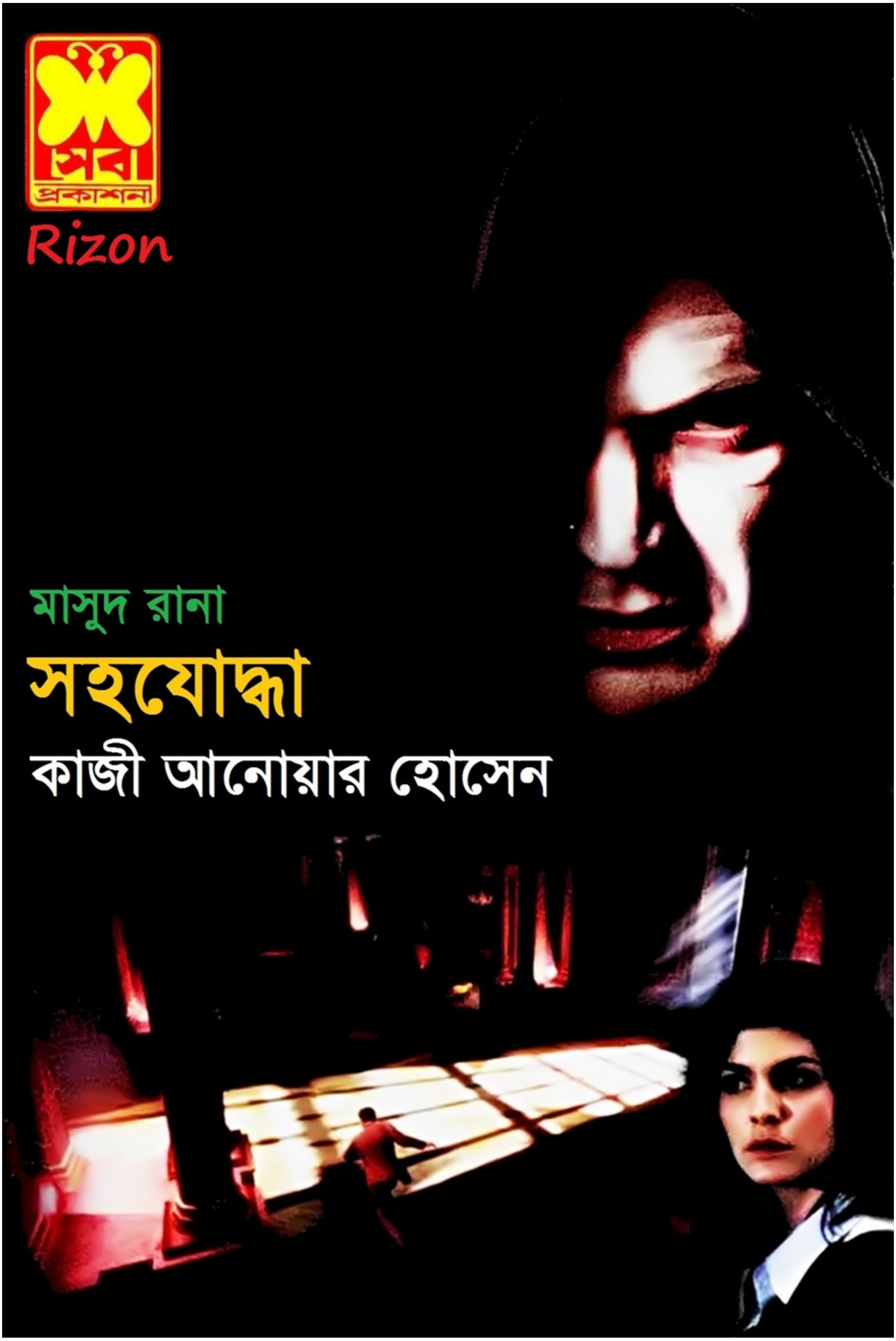
সেবা প্রকাশনা

Rizon

মাসুদ রানা

সহযোদ্ধা

কাজী আনোয়ার হোসেন




Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৬৭

সহযোদ্ধা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

আটান্ন টাকা

ISBN 984-16-7367-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-367
SHAHOJODDHA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-৯৯ *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু *আবার সোহানা *আরেক গডফাদার *অন্ধপ্রেম মিশন তেল আবিব *ক্রাইম বস *সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা *কালো নকশা কালনাগিনী *বেঈমান *দুর্গে অন্তরীণ *মরুকন্যা *রেড ড্রাগন *বিষচক্র শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস *মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন শেষ হাসি *স্মাগলার *বন্দি রানা *নাটের গুরু *আসছে সাইক্লোন।

এক

কাবুল, বাংলাদেশ এম্ব্যাসি।

সকাল এগারোটা।

সুদর্শন হাত-কাটা যুবক স্মার্ট ভঙ্গিতে অফিসে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিসিআই এজেন্ট ও ইন্টেলিজেন্স সেলের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেকেন্ড সেক্রেটারি ফরহাদ চৌধুরী, সেই সঙ্গে তার অধীনস্থ সব ক'জন স্টাফ। স্টাফদের মতোই আন্তরিক হাসি ফুটে উঠেছে সেকেন্ড সেক্রেটারির ঠোঁটে।

হাত বাড়িয়ে দিল ফরহাদ চৌধুরী। 'আসুন, সোহেল ভাই, বসুন। কেমন আছেন?'

'ভাল, তুমি কেমন আছো, ফরহাদ?' করমর্দন করে ডেস্কের এপারে তার জন্য নির্দিষ্ট করা দামি, আরামদায়ক, হাতলওয়ালা চেয়ারে বসল যুবক। সবাইকে একবার দেখে নিল। 'তোমরা সবাই কেমন আছো?'

'আমরা ভাল আছি, সোহেল ভাই,' স্টাফদের বসতে ইঙ্গিত করে নিজেও বসল এবার সেকেন্ড সেক্রেটারি ফরহাদ চৌধুরী। বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের চেয়ে বছর চারেকের ছোট হবে সে। দু'জনের সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 'সোহেল ভাই, চা চলবে, না কফি?'

'কফি,' সবার ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল সোহেল। বয়সে তরুণ সবাই, এদের মধ্যে তিনজন ওর বন্ধু মাসুদ রানার নিজের হাতে গড়া দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত

ভাবে চেনে ও, স্নেহ করে দেশপ্রেমিক ছেলেগুলোকে।

ফরহাদের সহযোগী আরিফ খন্দকার দু'দিন আগে, স্পেশাল ট্রেইনিং নিয়ে এখানে যোগ দিয়েছে। অন্যরা এসেছে তেরোদিন আগে। এদের নিয়ে গঠিত 'স্পাই সেল'-টার কাজকর্ম ঠিক করে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েই আজ ভোরের ফ্লাইটে পাঠানো হয়েছে সোহেলকে।

সোহেল খেয়াল করল, আবির ও তৌহিদ সিগারেট খেলেও ওদের বুক-পকেটে এখন সিগারেটের প্যাকেট দেখা যাচ্ছে না। কারণটা সম্ভবত ওর প্রতি অগাধ সমীহ।

ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিল ফরহাদ চৌধুরী। 'তনিমা, জলদি করে কফি!' তাকাল সোহেলের দিকে। 'সিগারেট, সোহেল ভাই?'

'নিচ্ছি,' ফরহাদ চৌধুরীর সামনে ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা বেনসনের প্যাকেট তুলে নিল সোহেল, এক হাতে খুলে টোকা দিয়ে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝুলাল। খেয়াল করল, প্যাকেটে এখনও তেরোটা সিগারেট আছে।

লাইটার জ্বেলে আগুন এগিয়ে দিল ফরহাদ চৌধুরী, সিগারেট ধরিয়ে আনমনা একটা ভাব করে বুক-পকেটে বেনসনের প্যাকেট রেখে দিল সোহেল, আড়চোখে ওর জুনিয়র বিসিআই-এজেন্টদের চেহারা দেখছে।

খুকখুক করে কাশল তৌহিদ, আবিরকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে চেহারাটা হাসি-হাসি করে একবার ফরহাদ ভাই, আরেকবার সোহেল ভাইকে দেখছে। অন্যরা হাসি চেপে নির্বিকার করে রেখেছে চেহারা। সবাই ওরা জানে, ভয়ানক কিপটে লোক ফরহাদ ভাই। চাকরি জীবনের শুরু থেকেই বেতনের সিংহভাগ টাকা জমাচ্ছেন তিনি প্রেমিকাকে বিয়ে করবেন বলে। আজ পর্যন্ত এমন রেকর্ড নেই যে টাকা ধার চেয়ে পেয়েছে কেউ তাঁর কাছে। শুধু আদেশ-নির্দেশ ও পরামর্শ দেবার বেলায় ওদের প্রতি কখনও

কোনও কার্পণ্য করেন না তিনি। প্রেমিকার জন্মদিনে একটা করে লাল গোলাপ উপহার দিয়ে থাকেন।

বিমর্ষ, কাতর ফরহাদকে উথলে ওঠা দীর্ঘশ্বাস চাপতে দেখে হঠাৎ করেই যেন সচেতন হলো সোহেল। 'আরে, দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন? ওহ্-হো, তোমার সিগারেটগুলো ভুল করে বুঝি পকেটে রেখে দিয়েছি?' বলে বের করল ও প্যাকেট, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে দিল ফরহাদের দিকে।

'ও কিছু না, সোহেল ভাই,' বলে ছোঁ মেরে প্যাকেটটা প্রায় ছিনিয়েই নিল ফরহাদ চৌধুরী। এতক্ষণে বেশ একটা সন্তুষ্টির ছাপ দেখা গেল তার চেহারায়।

তনিমা সবাইকে কফি দিয়ে সোহেলের দিকে মিষ্টি হেসে ফিরে গেল নিজের ঘরে। ঢোকার মুখেই তার সঙ্গে আলাপ সেরে এসেছে সোহেল, জেনেছে, শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট টাকা জমাতে পেরেছে ধারণা করে তনিমাকে প্রস্তাব দিয়েছে ফরহাদ, আগামী মাসে ওদের বিয়ে। সেই উপলক্ষে তিনদিনের ছুটিতে ঢাকায় গিয়ে অনুষ্ঠান সেরে আসবে ওরা।

এটা বললে মিথ্যে বলা হবে না যে, সোহেলের সুপারিশেই তনিমাকে ফরহাদের সঙ্গে ট্রান্সফার করা হয়েছে কাবুলে।

'এবার কাজের কথায় আসা যাক,' সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সোহেল। 'স্থানীয়দের সঙ্গে নতুন করে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে?'

'জী,' মুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে উঠল ফরহাদ চৌধুরীর চেহারা। 'গত বারোদিন আমরা ও নিয়েই কাজ করছি। কারযাই সরকারের আরও দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হাত করা গেছে। তথ্য সরবরাহও শুরু করেছে তারা। এছাড়া আন্ডারগ্রাউন্ডে তথ্য সংগ্রহ করছে তৌহিদ, আমাদের আরিফের অধীনে। আবির ও হাসান প্রয়োজনে তৌহিদকে সাহায্য করবে।'

'গুড।' সন্তুষ্ট হলো সোহেল। 'বারোদিনে কম এগোয়নি

কাজ। খুশি হলাম বিসিআই থেকে কেউ এসে ফাইনালি ব্রিফ করবে বলে বসে থাকোনি দেখে।'

'কিন্তু বাকিদের কাজ এখনও ভাগ করে দিইনি আমি, সোহেল ভাই,' বলল ফরহাদ। 'ঢাকা থেকে আমাকে জানানো হয়েছে আপনি সরেজমিনে অবস্থা দেখে সবার কাজ ভাগ করে দেবেন।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল সোহেল। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ফেলল। 'তোমাদের ফাইলগুলো দাও দেখি, চোখ বুলাব।'

পেট-মোটা কয়েকটা ফাইল ওর দিকে এগিয়ে দিল আরিফ খন্দকার।

প্রথম ফাইলটা খুলে মনোযোগ দিল সোহেল, ওর চেহারায় ফুটে উঠল গভীর অভিনিবেশের ছাপ। এখন শুধু শুধু পুড়ছে সিগারেট। আঙুলের ফাঁকেই নিভে গেল এক সময়।

নীরবে কেটে গেল পঁয়তাল্লিশ মিনিট, তারপর সিগারেটের ফিল্টারটা অ্যাশট্রেতে ফেলে ফাইলগুলো হাতে উঠে দাঁড়াল সোহেল। 'আপাতত আরমান-রফিক আমেরিকান এম্ব্যাসিতে যেসব আফগান কাজ করছে তাদের মধ্য থেকে ইনফর্ম্যান্ট যোগাড়ের দায়িত্ব পাচ্ছে। আফগান ইন্টেলিজেন্সে আমাদের যে ইনফর্মার আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে হাকিম। ...ফাইলগুলো আরও ভাল ভাবে স্টাডি করতে হবে আমাকে। পরে জানাব কাকে কী দায়িত্ব দেয়া যায়। ঠিক আছে?'

'কোথায় চললেন?' প্রায় হাহাকার করে উঠল সবাই, সোহেলের দেখাদেখি চেয়ার ছেড়েছে আগেই। 'আমরা সবাই ঠিক করেছি আজকে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন আপনি! তারপর আমাদের কারও বাসায় নিয়ে যাব। যে-কদিন...'

'লাঞ্চ আরেক দিন হবে,' মৃদু হাসল সোহেল। 'এখন আমি হোটেলে ফিরব।' কারও কোনও অনুরোধ-আপত্তি শুনল না ও, হাত নেড়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো অফিস থেকে। তনিমাকে বড়ভাই সুলভ আন্তরিক হাসি উপহার দিয়ে

চলে এলো গ্যারাজে, ওর জন্য রাখা টয়োটা প্রিমিয়ো নিয়ে রওনা হয়ে গেল। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সুইট বুক করা হয়েছে ওর নামে।

পরবর্তী তিনটে দিন যেন কেটে গেল হাওয়ায় উড়ে, বিস্তারিত আলাপ আলোচনার পর সবাইকে যার যার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল সোহেল।

দুপুরের আগে ফরহাদ চৌধুরীর অফিসে শেষ কাজটুকু সেরে বিদায় নিতে চাওয়ায় সবার পক্ষ থেকে আরিফ খন্দকার ওকে বলল, 'সোহেল ভাই, আপনাকে তো দশ দিনের ছুটি দেয়া হয়েছে শুনলাম, এবার তা হলে কয়েকদিন আমাদের বাসায় দাওয়াত খাবেন না?'

'পরেরবার এসে দেখব তোমরা কত খাওয়াতে পারো,' মৃদু হেসে বলল সোহেল। 'এবার নয়।'

'তা হলে দেশে ফিরে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল হতাশ ফরহাদ চৌধুরী।

মাথা নাড়ল সোহেল। 'না। এখানে বেশ কিছু বন্ধু আছে আমার, তাদের সঙ্গে দেখা করব। কিছু কাজও আছে। আবার কবে এখানে আসা হয় তার ঠিক নেই। ওরা যদি জানতে পারে এসেও দেখা না করে চলে গেছি, তা হলে খুব কষ্ট পাবে।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল ফরহাদের, চিন্তার ছাপ পড়ল চেহারায়। সোহেলের বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধে খানিকটা জানে সে। তারা তালেবান বিরোধী, তবে কারযাইয়ের লোকও নয় – আগ্রাসী বিদেশি শক্তির বিপক্ষে কাজ করছে। ওদের মধ্যে কয়েকজন আছে গোত্রপ্রধান, যাদের তালেবান অপবাদ দিয়ে খুন করবার চক্রান্ত চলছে। ফরহাদ দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বলল, 'কিন্তু এখানে এখন যেরকম পরিস্থিতি, তাতে ওসব জায়গায় যাওয়া কি ঠিক হবে আপনার? এমনিতেই সারা পৃথিবী জুড়ে এশীয় মুসলমানদের সবাইকে এখন তালেবান বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট সহ

গেলেও তো পেছনে লেজ লেগে যাবে।'

'পাসপোর্টের কোনও দরকার পড়বে না,' বলল সোহেল। 'আফগান সেজে যাব আমি। সাধারণের ভিড়ে মিশে চলে যাব বারিকোট, কোনার-ই খাস-এ। দু' দিনের সফর, কোনও ঝামেলা হবে না।'

তর্ক করতে পারত ফরহাদ, কিন্তু সোহেল ভাই যাবেনই বুঝে কথা বাড়াল না। শুধু সে-ই নয়, চিন্তিত বোধ করছে স্টাফদের সবাই। তবে সোহেল ভাইয়ের বিবেচনার ওপর দিয়ে কথা বলার মতো অশ্রদ্ধা প্রকাশ করল না কেউ।

বারিকোট, দক্ষিণ-পুব আফগানিস্তান।

হাজী আবদেল আবু খাদেমের বাড়িটা একতলা হলেও এলাকার অন্যান্য বাড়ির তুলনায় খানিকটা বড়। সামনে তিন ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত উঠান। অস্তগামী সূর্যের তেরছা, লালচে আলোয় উঠানে ছুটোছুটি করে খেলা করছে তিন-চারটে বাচ্চা ছেলে। আফগান আলখেল্লা পরনে হাত-কাটা আগন্তুককে উঠানে ঢুকতে দেখে তাদের চেহারায় ফুটে উঠল গভীর শ্রদ্ধার ছাপ। বোধহয় ভেবেছে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে লড়াইয়ে হাত হারিয়েছে যোদ্ধাপুরুষটি। বড়টা এগিয়ে এলো আগন্তুকের দিকে। বয়স তেরো-চোদ্দো হবে। চোখে প্রশ্ন। হাত তুলে সালাম দিল।

'খাদেম বাড়িতে আছে?' সালামের জবাব দিয়ে চোস্ত পশতু ভাষায় জিজ্ঞেস করল আগন্তুক, তার উচ্চারণে কোনও আঞ্চলিকতা নেই।

'আব্বু আছেন, আসুন,' হঠাৎ করেই ছেলেটার চোখে পরিচিতির চিহ্ন ফুটে উঠল। 'আপনি সোহেল চাচা না?'

'হ্যাঁ। তুমি তো রহিম?' কাঁধের ঝোলা থেকে কিটক্যাট চকলেটের বড় একটা বাক্স বের করে রহিমের হাতে দিল সোহেল। 'তোমাদের সবার।'

'জী।'

'ওরা?' অন্যদের দিকে তাকাল সোহেল। 'তোমার ভাই নিশ্চয়ই?'

'জী, ও হামিদ, ও বিল্লাল, এ আরাফাত,' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল রহিম। 'ওদের আপনি দেখেননি।' ওর বলার ভঙ্গিতে মনে হলো যেন বড় মানুষ হয়ে গেছে এই অল্প বয়সেই।

বাচ্চারা বিনীত ভঙ্গিতে সোহেলকে সালাম দিল।

মৃদু হাসল সোহেল। বাচ্চাদের সালামের জবাব দিল।

'কে এসেছে, রহিম?' বোরকা পরা এক মহিলা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'আব্বুর বন্ধু, সোহেল চাচা, ফুপু,' জবাব দিল ছেলেটা। সোহেলের হাত ধরে টানল। 'সোহেল চাচা, আসুন, বৈঠকখানায় বসুন, আমি আব্বুকে ডেকে আনছি।'

বোরকা পরা নারীমূর্তি চলে গেল অন্দরমহলে। রহিমের পিছু পিছু সামনের বৈঠকখানায় এসে বসল সোহেল। রহিম ছুটে চলে গেল ওর বাবাকে ডেকে আনতে।

খুব সাধারণ ভাবে সাজানো ঘর। বসার জন্য দু'দিকে দুটো চওড়া তাকিয়া। দেয়ালে কয়েকটা ঝকঝকে তলোয়ার ঝুলছে। মেঝের মাঝখানে ঘরে-তৈরি সুন্দর একটা কম্বল। এছাড়া আসবাবপত্র বলতে একটা লেখার টেবিল, দুটো কাঠের চেয়ার। ব্যস। আবদেল আবু খাদেম অত্যন্ত সৎ ও সত্যবাদী লোক, মাদক-ব্যবসায় জড়িত নেই বলে গোত্রপ্রধান হলেও দারিদ্র্য তার নিত্য সঙ্গী।

লম্বায় অন্তত সাড়ে ছ'ফুট হবে আবদেল আবু খাদেম, ঘরে ঢুকল যেন ঝড়ের মতো। সোহেল উঠে দাঁড়াতেই দু'-হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে পিষতে শুরু করল সে ওকে।

'দোস্ত, এতদিনে মনে পড়ল আমাদেরকে?'

'ছাড়ো, খাদেম, দোস্ত, মারা পড়ব তো!' আবদেল আবু

খাদেমের মতোই আন্তরিক হাসছে ও-ও। 'আরে, ছাড়ো!'

পুচপুচ করে সোহেলের দু'গালে দুটো ভেজা চুমু দিয়ে তারপর ওকে ছাড়ল গোত্রপ্রধান। তার গলা থেকে বেরিয়ে এলো বিকট এক হুঙ্কার। 'সরবত! রহিম! সরবত, কাবাব, রোটি!'

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কিশোর ছেলেটা, ছিটকে বেরিয়ে গেল।

হাত ধরে সোহেলকে বসাল হাজী আবদেল আবু খাদেম, মুখোমুখি হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে কুশল জিজ্ঞেস করতে শুরু করল।

সোহেল জানে, বন্ধুবান্ধব তাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করলে দুঃখ পায় আফগানরা, মনে করে তার প্রতি অন্তরের টান কমে গেছে বন্ধুর, কাজেই ধৈর্য ধরে একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করল ও। পরবর্তী দশ-বারো মিনিট ওর মনে হলো উকিলের জেরার মুখে পড়েছে। ওর প্রেমিকা নীলা, বস্ রাহাত খান, বন্ধু রানা, জাহিদ; সলীল, সোহানা, রূপা ও বিসিআইয়ের অন্যান্য সিনিয়র এজেন্ট – কারও প্রসঙ্গ বাদ থাকল না।

'এবার তোমার খবর বলো,' ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করল সোহেল।

শুরু হলো আবদেল আবু খাদেমের বয়ান। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অস্বাভাবিক দ্রুত শেষ করল সে, স্ত্রীর মৃত্যুর খবরটা দিয়েই চলে এলো রাজনৈতিক বিষয়ে, সোহেলকে ভাল মতো শোক প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই। অসন্তোষ প্রকাশ করল হামিদ কারযাই-এর সরকারের কর্মকাণ্ডে। তার কথা থেকে মনে হলো সাধারণ আফগানরা তালেবানদের যেমন ক্ষমতায় চায় না, ঠিক তেমনি আমেরিকার মদদপুষ্ট অত্যাচারী কারযাই সরকারকেও কেউ মেনে নিতে পারছে না। তাদের অন্যায়-অবিচারে ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে সাধারণ মানুষ। সেই সুযোগে এক-পা দু-পা করে ফিরে আসছে তালেবানরা।

'এখানে আসার আগে কাবুলে হামিন আর রহমানের সঙ্গে

দেখা করেছি, ওদের সঙ্গে আলাপ করেও মনে হলো তোমরা দেশের বর্তমান অবস্থায় অতিষ্ঠ,' আবদেল আবু খাদেমের কথা শেষ হবার পর বলল সোহেল, 'ওরা আভাস দিল বেশ কয়েকটা গোত্র এক হয়ে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করছে। আমার সার্ভিসের ছেলেদের রিপোর্টেও দেখলাম পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে। ...তোমরা যদি সত্যি এক হতে পারতে তা হলে ক্ষমতা দখল করতে অসুবিধে হতো না।'

'ঠিক বলেছ, দোস্ত,' সায় দিল আবু খাদেম। 'দেশের বেশিরভাগ মানুষ চাইছে গোত্রগুলো মিলিত হয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নিক। রাজধানীর আশপাশের গোত্রগুলোর বিরোধ মেটাবার কাজও প্রায় শেষ।'

'তা হলে এখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছ তোমরা?'

'হ্যাঁ, দোস্ত। আধুনিক অস্ত্র যোগাড় শুরু হয়েছে।' আবদেল আবু খাদেমের চেহারায় ক্ষণিকের জন্য গর্বের ছাপ পড়ল। 'তুমি তো জানো হাজার হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা টিকিয়ে রেখেছি আমরা, আফগানরা। কোনও বিদেশি শক্তি আজ পর্যন্ত আমাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। রাশিয়ানরা চেষ্টা করেছে, দশ লাখ মানুষ খুন করেও আমাদের দমিয়ে দিতে পারেনি। এখন আমেরিকানরা আমাদের দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। হারতে হবে তাদেরও। কোনও আফগানের শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকতেও সে কারও অধীনে থাকতে রাজি হবে না।'

রহিম বড় একটা ট্রেতে করে কাবাব-রুটির স্তূপ ও দু'গ্লাস সরবত নিয়ে ঘরে ঢোকায় আলোচনায় ছেদ পড়ল খাবারের ট্রে নামিয়ে রেখে ঘরের লণ্ঠন জ্বেলে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল রহিম, সোহেল তাকে বলল, 'রহিম, হামিদ, বিল্লাল, আরাফাতকে নিয়ে এসো, একসঙ্গে খাব আমরা।'

ওকে আতিথেয়তা করতে গিয়ে হয়তো নিজেদের খাবারই দিয়ে দিয়েছে আবদেল আবু খাদেম, আঁচ করছে সোহেল।

জিজ্ঞেস করলে মরে গেলেও স্বীকার করবে না খাদেম, কাজেই ছেলেদের খেতে ডেকেছে ও, সেই সঙ্গে ঠিক করেছে, লক্ষ্য রাখবে, যাতে খাদেমের বোনের জন্যও খাবার থাকে। খাদেমের স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে ছেলেগুলোকে মানুষ করছে বিধবা ওই ফুপুই।

মুসলিম রীতি অনুযায়ী খাবার সময়টা প্রায় কোনও কথা হলো না বললেই চলে। অল্প খায় আফগানরা, তবে খায় বেশ সময় নিয়ে। আধঘণ্টা পর সবার খাওয়া শেষ হতে অবশিষ্ট খাবার রহিমকে নিয়ে যেতে বলল সোহেল, আরও খাওয়ার ব্যাপারে আবদেল আবু খাদেমের কোনও অনুরোধ শুনল না।

বাচ্চারা চলে যাবার পর গল্পে মজে গেল দুই বন্ধু। তবে অতীতের স্মৃতিচারণের মাঝেও বারবার ওদের আলোচনায় এলো আফগানিস্তানের বর্তমান শাসক-দল ও ন্যাটো ফোর্সের নেতৃত্বে থাকা আমেরিকানদের কথা।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে বিদায় চাইল সোহেল। বলল, এবার যেতে চায় ও।

লণ্ঠনের আলোয় আহত দৃষ্টিতে ওকে দেখল আবদেল আবু খাদেম। 'চলে যাবে, দোস্ত? গরীবখানায় থাকবে না?'

'একবার কোনার-ই খাস-এ যাব,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল সোহেল। 'শুনেছি ওখানে জাবের আছে। ওর সঙ্গে দেখা করব। দেশে ফেরার আগে ওর সঙ্গে দেখা না করলে খেপে গিয়ে খুন করবে ও আমাকে।'

'ঠিক,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল গোত্রপ্রধান। 'খেপবেই তো। আমি যদি জানতাম আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেছ, তা হলে দুঃখ পেতাম। কিন্তু ওর ওখানে গেলে বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে। ও অস্ত্রের চালান আনতে বালাবাগে গেছিল, ফিরেছে কি না জানি না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সোহেল, ওর মন টানল যেতে। বুঝল,

ও যদি আফগান হতো, তা হলে বিনা দ্বিধায় দেশটার ওপরে যে জুলুমবাজি হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত সর্বশক্তি নিয়ে। সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল সোহেল, 'যাওয়াই উচিত। সবার সঙ্গে দেখা করলাম আর ওর সঙ্গে করব না? কেমন হবে ব্যাপারটা? পথ দেখানোর জন্য কাউকে তুমি সঙ্গে দিতে পারলে ভাল হয়।'

'আমার ছোট ভাই আবদেল আবু জামিলকে দিয়ে দেব তোমার সঙ্গে,' রাজি হলো খাদেম। 'মাঝরাতের আগেই পৌঁছে যেতে পারবে।' আরেকবার অনুরোধ করল সে, 'থেকে গেলে হয় না? কালকে না হয় যেয়ো?'

'থাকতে পারলে ভাল হতো, দোস্ত,' আন্তরিক স্বরে বলল সোহেল। 'কিন্তু কাল রাতে আমার ফ্লাইট। আজ না গেলে ওখানে আর যাওয়াই হবে না হয়তো।'

'ঠিক আছে, তুমি বসো, আমি জামিলকে ঘোড়া সাজাতে বলছি,' বেরিয়ে গেল হাজী আবদেল আবু খাদেম।

*

রাত এগারোটা। পাহাড়ি পথে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চলেছে দু'জন ঘোড়সওয়ার। তাদের মধ্যে কথা খুব কমই হচ্ছে। খানিক আগে পেছনে পড়ে গেছে কোনার-ই খাস। ওখানে জাবেরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জাবেরের স্ত্রী বাড়ির দরজার আড়াল থেকে জানিয়েছে, পেশোয়ারের বালাবাগ সীমান্ত থেকে ফিরছে জাবের, রাতে পথেই ক্যাম্প করবে। কোন পথে ফিরছে জাবের, সেকথা জানিয়ে দিয়েছে সে আবদেল আবু জামিলকে।

দু'পাশে খাড়া পাহাড়, চুড়োয় সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে, মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে উঁচু-নিচু পথটা। হিমেল হাওয়া শরীরে কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে দুই অভিযাত্রীর। চাঁদ উঠেছে আকাশে, ঘোলাটে আলো ছড়াচ্ছে। তবে ওই আলোয় ঘোড়া চালাতে অসুবিধে হচ্ছে না। জামিলের ঘোড়াটা একটু এগিয়ে আছে,

সোহেলেরটা ফুট তিনেক পিছনে।

'বালাবাগ আর বেশি দূরে নেই,' অনেকক্ষণ পর ঘাড় ফিরিয়ে বলল আবদেল আবু জামিল। 'জাবের ভাই এদিকেই কোথাও আছেন, মনে হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারব আপনাকে।'

নীরবে মাথা দোলাল সোহেল। পেরিয়ে গেল আরও বেশ কয়েকটা মিনিট, তারপর দেখা গেল সামনে পথটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে। ওপার দেখা যায় না। ঘোড়ার গতি কমাল দু'জন, বাঁক পেরোবার আগেই শুনতে পেল পশতু ভাষায় কথা বলছে কারা যেন। বেশ কয়েকজন আলাপ করছে। তাদের একজন হো-হো করে হেসে উঠল। ঘোড়া থামিয়ে ফেলল আবদেল আবু জামিল, নেমে পড়ল জন্তুটার পিঠ থেকে। সোহেলকেও নামতে ইশারা করল সে। তার হাতে উঠে এসেছে কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল।

'এদিকে প্রায়ই ডাকাতি হয়,' নিচু গলায় সোহেলকে বলল জামিল। 'পথযাত্রীরা সংখ্যায় কম হলে মেরেধরে সব কেড়ে নিয়ে যায়।'

শোল্ডার হোলস্টার থেকে .৩৮ ওয়ালথার পিস্তলটা বের করে জামিলকে এগোতে ইশারা করল সোহেল।

আবদেল আবু জামিলকে এগোতে হলো না, বাঁক ঘুরে এদিকে চলে এলো তিনটে উট। জন্তুগুলোর দড়ি ধরে এগিয়ে আসছে তিনজন আফগান। চাঁদের আলোয় অস্ত্র হাতে জামিল ও সোহেলকে দেখে থমকে দাঁড়াল তারা। ভাব দেখে মনে হলো না চমকে গেছে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আগেই পেয়েছে সম্ভবত।

'কে? কারা তোমরা?' মাঝখানের আফগান ভারী স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'আমি জামিল, জাবের ভাই,' গলার আওয়াজ চিনে বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল আবদেল আবু জামিল। 'অতিথি নিয়ে এসেছি।'

কালাশনিকভ নামিয়ে ফেলল সে।

'জামিল?' সামনে বাড়ল লোকটা, কাছ থেকে বন্ধুর ছোট ভাইয়ের চেহারাটা দেখল। তার দুই সঙ্গী এরই মাঝে দু'পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। এবার বোঝা গেল, তাদের পিছন থেকে পাহাড়ের কাঁধে আগেই অবস্থান নিয়েছে আরও বেশ কয়েকজন সশস্ত্র আফগান।

'সোহেল না? দোস্ত?' অন্ধকারে ভাল করে চেহারা দেখতে না পেয়ে ভারী গলার আফগান অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, দোস্ত,' জবাব দিল সোহেল। ওর হোলস্টারে চলে গেল পিস্তলটা। 'ভাবলাম দেশে ফেরার আগে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

এগিয়ে এলো জাবের আল কুতুব, সোহেলকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে শূন্যে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে দু'গালে চুমু খেল। 'কতদিন পর দেখা!' তাকাল জামিলের দিকে। 'আরেকটু গিয়েই ক্যাম্প করব আমরা, রাতে থাকছ তো?' জবাবের অপেক্ষা না করেই এবার আঞ্চলিক ভাষায় ঝড় বইয়ে দিল সে। পাহাড়ি ঢালের ওপর থেকে নামল তার দলের আফগান যোদ্ধারা। তাদের দু'জন সোহেল ও জামিলের ঘোড়ার দড়ি নিয়ে নিল।

'চলো, এগোই,' সোহেলের কাঁধে হাত রেখে বলল জাবের আল কুতুব

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরল সোহেল ও জামিল। পেছনে কোলাহল শুনতে পেল। একেকবারে বাঁক পার হয়ে আসছে তিনটে করে উট। সব মিলিয়ে সংখ্যায় চল্লিশটার কম হবে না।

সিকি মাইল হেঁটে এগোল সবাই, তারপর পথের চওড়া একটা অংশে ক্যাম্প করতে থামল। তাঁবু খাটাতে এবং রান্নার আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেশ কয়েকজন। ইতিমধ্যে সোহেলের কুশল জেনে নিয়েছে জাবের আল কুতুব, জানিয়েছে পঁয়তিরিশটা উটের পিঠে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে ফিরছে সে

পেশোয়ার সীমান্ত থেকে। অস্ত্রগুলো একযোগে যুদ্ধ করতে সম্মত হওয়া গোত্রগুলোর যোদ্ধাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। আফসোস করে বলল, 'দক্ষিণের গোত্রগুলো এখনও বিরোধ মেটাতে রাজি নয়। কান্দাহার, হেলমান্দ এবং আশপাশের এলাকায় যারা তালেবান নয়, তারাও নিজেরাই লড়াই করতে চায়। কাবুলের উত্তরের কয়েকটা গোত্রও ঠিক করেছে নিজেরাই আমেরিকানদের প্রতিহত করবে। এমন কী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগও করবে না ঠিক করেছে ওরা। অথচ ওরা সবাই আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে শক্তি অনেক বাড়ত আমাদের।'

'সেটা আগে হোক পরে হোক বুঝবে ওরা,' বলল সোহেল। 'জয়ী হবার জন্যে দেখবে ঠিকই সবাই একত্রিত হয়েছে।'

'হলেই ভাল, নইলে এমনও হতে পারে যুদ্ধটা আগামী বিশ বছরেও থামবে না।' সোহেল আর জামিলকে নিজের তাঁবুতে বসিয়ে খাবারের আয়োজন করতে বেরিয়ে গেল জাবের আল কুতুব। ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। 'ভাল কিছু নেই আমাদের সঙ্গে,' জানাল সে। 'বাছুরের মাংস আর শুকনো রুটি।'

এবার জামিলের কাছে আবদেল আবু খাদেমের খোঁজ নিল সে, তারপর বর্তমান পরিস্থিতির দিকে মোড় নিল তার কথা। জাবের আল কুতুবের বক্তব্য এবং ওর অন্যান্য আফগান বন্ধুদের বক্তব্যে কোনও তফাৎ পেল না সোহেল

আমেরিকান মদদ পেয়ে বর্তমান সরকারী সেনাবাহিনী ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, যাকেই সন্দেহ করছে তালেবান হিসেবে, তাকেই বিনা প্রশ্নে খুন করছে। সাধারণ মানুষ মেরে ফেলে দুঃখপ্রকাশের ধার ধারতেও আপত্তি আছে তাদের। সংবাদপত্র বা অন্যান্য নিউজ মিডিয়ায় যে হত্যাগুলোর কথা আসে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মানুষ মারছে তারা। একই কাজ করছে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী। সামনাসামনি লড়াইয়ের মুরোদ নেই, চল্লিশ হাজার ফুট ওপর থেকে মিসাইল ও বোমা হামলা করে

গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে তালেবানদের ঘাঁটি বলে সামান্যতম সন্দেহ হলেই। চরমপন্থীদের রুখতে গিয়ে নিজেরাই চরমপন্থীদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে অত্যাচারের দিক থেকে। সত্যিকার তালেবান চরমপন্থী মরছে হাতে গোনা, তবে সাধারণ মানুষ মরছে পিঁপড়ের মতো।

'অথচ আমাদের কারও কিছু করার নেই,' এক পর্যায়ে আফসোস করে বলল সোহেল। 'কারও সাহস নেই মুখ ফুটে কিছু বলে। শ্বেতাঙ্গরা একজোট হয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, অস্ত্রের শক্তির কাছে মানবতার কোনও মূল্য নেই।'

'সেটা তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই প্রমাণ করে দিয়েছে ওরা,' তিক্ত স্বরে বলল জাবের আল কুতুব। 'ওরাই তো জাপানে সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করেছে।'

ওদের আলাপে ছেদ পড়ল দু'জন আফগান যুবক খাবারের থালা নিয়ে তাঁবুতে ঢোকায়।

জামিল উসখুস করছে, লক্ষ করল সোহেল। কারণটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে যেতে হলো ওকে। দূরাগত আওয়াজটা ও-ও শুনতে পেয়েছে এবার।

ভারী, গম্ভীর ধিক্‌ধিক্‌ আওয়াজটা কাছে চলে আসছে। চট্‌ করে জাবেরের দিকে তাকাল সোহেল গম্ভীর হয়ে গেছে ওর চেহারা। ঝট্‌ করে উঠে দাঁড়াল আফগান নেতা, এক টানে সোহেলকে দাঁড় করিয়ে ফেলল।

'দোস্ত, আমেরিকান হেলিকপ্টার! এদিকেই আসছে! পরে আবার দেখা হবে, দোস্ত, যদি বাঁচি। রওনা হয়ে যাও তুমি। ওরা আমাদের ওপরেই হামলা করতে আসছে।'

আপত্তি করল সোহেল 'তা না-ও হতে পারে।' বাইরে ছুটোছুটির আওয়াজ পাচ্ছে ও। বোধহয় রান্নার আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে আগেই। আফগান যোদ্ধারা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জাবের আল কুতুব। 'এত রাতে এদিকে আসত না ওরা নির্ভরযোগ্য তথ্য না পেলে। পাকিস্তান সীমান্ত পেরোনোর সময় বোধহয় অস্ত্রের চালানের খবরটা জেনে গেছে ওরা।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল আবদেল আবু জামিল, ওর চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ দেখল সোহেল। লড়তে গেল আফগান তরুণ। প্রাণ থাকতে হার মানবে না।

'কী কী অস্ত্র আছে তোমাদের কাছে?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল সোহেল।

একটু থমকে গিয়ে বন্ধুকে দেখল আফগান গোত্রপ্রধান। 'ছাব্বিশটা উটের পিঠে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, নাইন এমএম বেরেটা পিস্তল, কয়েক রকমের গ্রেনেড, পঁয়তাল্লিশটা সাবমেশিনগান আর দুটো হেভি ক্যালিবারের মেশিনগান। বাকি আঠারোটা উটের পিঠে অস্ত্রগুলোর জন্য প্রচুর গুলি। রকেট লঞ্চারও আছে একটা। তবে এই চালানে রকেট আনতে পারিনি।'

হতাশ হলো সোহেল। আমেরিকান হেলিকপ্টার-গানশিপের হেভি আর্মারের বিরুদ্ধে এসব দিয়ে কিছুই করা যাবে না। রকেট থাকলেও প্রতিরোধের একটা চেষ্টা হয়তো করতে পারত জাবের।

ইঞ্জিনগুলোর আওয়াজ সোহেলের অভিজ্ঞ কানে পরিচিত ঠেকছে। ইরাকে ওগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে ওর। প্রতিটা বেল এএইচ-১ কোবরা কপ্টারে দুটো করে জেনারেল ইলেকট্রিক টার্বো-শ্যাফট ইঞ্জিন আছে, প্রতিটা ষোলোশো নব্বুই হর্সপাওয়ার, সর্বোচ্চ চোদ্দো হাজার সাতশো পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠতে পারে, প্রতি মিনিটে উঠে যেতে পারে উনিশশো পঁচিশ ফুট, সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় একশো পঁচানব্বই মাইল। পাইলট বসে পেছনে, তার সামনে থাকে গানার – তিন ব্যারেলের এম-১৯৭ বিশ মিলিমিটার কামান অপারেট করে সে সাতশো পঞ্চাশ গোলার রাউন্ড-অ্যামিউনিশনস্ কন্টেইনার। সেই সঙ্গে আছে

চারটে টো মিসাইল, আটটা হেলফায়ার মিসাইল, অথবা একটা এআইএম-৯এল সাইডওয়াইন্ডার মিসাইল ও যুনি রকেট লঞ্চার।

স্পষ্ট বুঝতে পারছে সোহেল, আমেরিকানরা ওপর থেকে পিঁপড়ের মতো মারবে হালকা অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়ানো আফগান যোদ্ধাদের। বাঁচবে না একজনও। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল ও, তাকাল জাবেরের চোখে। 'জাবের, এখানে থাকলে সবাইকে মরতে হবে। জানি কেউ পিছু হটতে চাইবে না, কিন্তু নেতা হিসেবে তোমার উচিত ওদের পালাতে নির্দেশ দেয়া। বেঁচে থাকলে পরেও লড়াই করা যায়।'

'যাবে না কেউ স্বেচ্ছায়,' বলল গম্ভীর জাবের আল কুতুব। 'আমি নিজে থাকছি, কাজেই আমার গোত্রের যোদ্ধারাও থাকবে। তুমি আর জামিল রওনা হয়ে যাও।'

অনেক কাছে চলে এসেছে হেলিকপ্টারের আওয়াজ। একাধিক যান্ত্রিক ফড়িং দ্রুত এগিয়ে আসছে।

তাঁবু থেকে জাবেরের সঙ্গে বের হলো সোহেল। উটগুলোকে বসিয়ে ফেলেছে আফগানরা, ধূসর বালিরঙা তারপুলিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছে ওগুলোকে।

ধক্ করে উঠল সোহেলের বুক। চারদিক থেকেই আসছে কপ্টার। সংখ্যায় আটটার কম হবে না। ওগুলোর আলো পুব-পশ্চিম-উত্তর ও দক্ষিণ থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পালাতে দেবে না কাউকে

'জামিল!' চিৎকার করে ডাকল সোহেল। তরুণ ওর থেকে ফুট বিশেক দূরে কালাশনিকভ হাতে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে

সোজা তার পাশে চলে গেল সোহেল। 'এক্ষুণি পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে যাও তুমি,' নরম গলায় বলল ও, 'খাদেমকে জানাবে এখানে হামলা হয়েছে আমাদের ওপর।'

'আমি থাকছি,' বলল নির্ভীক জামিল। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'বোকামি কোরো না,' বলল সোহেল, যদিও বুঝতে পারছে জামিলের আফগান রক্ত ওকে পিছাতে দেবে না। 'কালাশনিকভ দিয়ে কিছুই করতে পারবে না তুমি ওদের বিরুদ্ধে।'

'আপনি কিছু করতে পারবেন, সোহেল ভাই?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল জামিল। সরাসরি সোহেলের চোখে তাকিয়ে আছে সে।

থমকে গেল সোহেল। 'না।'

'তা হলে আপনি থাকছেন কেন? আপনি রওনা হয়ে যান।'

জবাব দিতে পারল না সোহেল। বলতে পারল না, পালানোর চেষ্টা করলে সামান্য হলেও বাঁচার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এখানে থাকলে নির্ঘাত মরতে হবে, তার পরেও জাবের ও তার দলের দুঃসাহসী যোদ্ধাদের ফেলে যেতে পারবে না ও, ঠিক যেমন পারবে না জামিলও। এটা ওর লড়াই নয়, কিন্তু এই লড়াই অন্যান্য দেশপ্রেমিক আফগানের মতোই জামিলেরও। জাবেরকে পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে সোহেল বলল, 'একটা সাবমেশিনগান দাও আমাকে।'

এক মুহূর্ত সোহেলকে দেখল জাবের, তারপর নির্দেশ দিল এক আফগান যুবককে। তাড়াহুড়ো করে সোহেলের হাতে একটা কালাশনিকভ ধরিয়ে দিল যুবক।

একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল জাবের দলের লোকদের। ছড়িয়ে পড়তে বলছে সবাইকে। তার পাশেই থাকল সোহেল।

অনেক ওপর থেকে নামতে শুরু করেছে কপ্টারগুলো। নাক নিচু করে ধেয়ে আসছে দ্রুত।

তালেবানদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে ন্যাটো বাহিনী। হেলিকপ্টারগুলো প্রথমেই রকেট ছুঁড়ল না, হামলা শুরু হলো দু'পাশের পাহাড়ের ওপর থেকে গর্জে উঠেছে শতখানেক একে-৪৭ ও এম-১৬ রাইফেল। কড়কড় আওয়াজে গুলি

ওগরাচ্ছে একটা মেশিনগান। মাথার ওপর যেন বাজ পড়ল আফগানদের। দু'পাশ থেকে আক্রমণ আশা করেনি তারা কেউ। নতুন করে অবস্থান নিতে হচ্ছে তাদের। ওপরে পাহাড়ের গায়ের বোল্ডারগুলো আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে হামলাকারীরা। লক্ষ্যস্থির করার জন্য প্রচুর সময় পেয়েছে তারা। তাদের কাছে আছে নাইটভিশন টেলিস্কোপ। হালকা অস্ত্রধারী, অপ্রস্তুত, মুক্তিকামী আফগানদের ভরসা চাঁদের ঘোলাটে আলো।

তার পরেও পাল্টা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল দুঃসাহসী, লড়াকু মানুষগুলো। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তাদের সামনে।

নিশ্চয়ই নীচের ট্রুপ রেডিও করেছে কপ্টারগুলোতে, চোখ ধাঁধানো আলোর রেখা পিছনে নিয়ে তীব্র বেগে নামতে শুরু করল টো মিসাইল ও যুনি রকেটগুলো। বিস্ফোরণের ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ পাথর ছিটকে যেতে থাকল চার ধারে চারদিকে ছাতু হয়ে যাওয়া রক্তমাংস ছিটাচ্ছে বিস্ফোরিত মিসাইল ও রকেট। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে জাবেরের যোদ্ধারা। চারপাশ থেকে আহতদের আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছে সোহেল। সে-আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে উটগুলোর ভীত ডাকাডাকি। যেগুলো এখনও আহত হয়নি, পালাতে চেষ্টা করছে সেগুলো, পিষ্ট করে যাচ্ছে মাটিতে শুয়ে প্রাণপণ লড়াইরত আফগান যোদ্ধাদের। তবে আফগানদের বেশ কয়েকজন পিছু হটছে দ্রুত। হয়তো ওদের মধ্যে কেউ কেউ নিরাপদে এই মরণফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

রকেট বিস্ফোরণের কমলা আলোর মাঝে পাহাড়ের ওপর থেকে আফগান সরকারী বাহিনীর সদস্যদের ছুটে নেমে আসতে দেখল সোহেল। তাদেরকে সামনে রেখেছে ন্যাটো ফোর্স। পিছনের নিরাপদ অবস্থান থেকে কাভারিং ফায়ার করছে তারা।

একটা বোল্ডারের পাশে শুয়ে পড়ল সোহেল। সরাসরি ওর দিকে নেমে আসা একদল আফগান সৈন্যের ওপর এক পশলা গুলি করল কালাশনিকভ থেকে। ঝাঁপ দিয়ে বড় বড় পাথরগুলোর

আড়াল নিল আফগান সৈন্যরা তবে তাদের আশপাশের সৈন্যরা সোহেলের কালাশনিকভের মাযল-ফ্ল্যাশ দেখেছে। গুলি করতে শুরু করল তারা সোহেলের দিকে

অবস্থান পাল্টাবার আগেই ডান কাঁধে তীব্র ব্যথা অনুভব করল সোহেল পাথরে লেগে ওর কাঁধের মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। একমাত্র হাতটায় মোটেই জোর পেল না ও। আস্তে করে মাটিতে পড়ে গেল কালাশনিকভ। ঘোরের মধ্যে কেটে গেল খানিকটা সময় তারপর এক সময় টের পেল, গোলাগুলি কমে আসছে। জ্ঞান হারাবে বলে মনে হলো ওর। ডানদিকে তাকাল, যেখানে জাবের অবস্থান নিয়েছিল বুকের ভেতরটা অদম্য ব্যথায় মুচড়ে উঠল ওর, মৃত জাবেরের শরীরের বিচ্ছিন্ন উর্ধ্বাংশ পড়ে আছে ফুটবল আকৃতির একটা পাথরের পাশে রকেট বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে জাবের

বোধহয় যারা সরে যেতে পারেনি সেসব আফগান যোদ্ধাও মারা গেছে বা আহত হয়েছে, গোলাগুলি কমে গেছে একেবারে। রকেট বিস্ফোরিত হচ্ছে না আর। গোঙানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে অবশ্য। তা-ও মাত্র দু'একজনের হেলিকপ্টার-গানশিপগুলো শ'খানেক ফুট ওপরে স্থির হয়ে সার্চলাইটের আলোর বন্যায় চারপাশ দিনের মতো আলোকিত করে তুলেছে

কানের পাশে বুটের আওয়াজ পেল সোহেল। আমেরিকান সুরে ইংরেজিতে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'কর্নেল, এটা দেখি পঙ্গু!' পর মুহূর্তে ঘাড়ের ওপর রাইফেলের জোরাল একটা গুঁতো খেয়ে জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলো ওর।

দূরে, অনেক দূরে একটা নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। আস্তে আস্তে কাছে চলে আসছে সেই নক্ষত্র, বড় হচ্ছে আকারে উজ্জ্বল হচ্ছে গুঙিয়ে উঠল সোহেল আস্তে আস্তে দৃষ্টি পরিষ্কার হচ্ছে ওর একটু পর বুঝতে পারল, মাথার ওপর ওটা নগ্ন একটা

বৈদ্যুতিক বালব। চোখের সামনে যেন বনবন করে ঘুরছে ওটা। মাথা, কাঁধ, কোমরের দু'পাশ, মেরুদণ্ড, পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। মুখটাকে ফোলা বেলুন বলে মনে হচ্ছে, ভাপ বেরোচ্ছে দুই কান দিয়ে পাঁজরের হাড়গুলো বোধহয় রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে ভেঙে দেয়া হয়েছে। নিজেকে শান্ত করতে চাইল সোহেল, মনটাকে সুস্থির করার চেষ্টা করল। আস্তে আস্তে ওর মাথা-ঘোরা কমে আসছে। কিন্তু ব্যথা! জ্ঞান হারাবে নাকি আবার?

কয়েক মিনিট পর আরেকটু সচেতন হলো। লোহার ফটক দেয়া ছোট একটা পাথুরে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে ও দরজাটার মাঝখানে গরাদ দেয়া চার কোনা একটা জানালা ওটার ওপাশে বোধহয় একটা করিডর আছে।

পাশ ফিরল সোহেল, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল। না, চার দেয়ালের কোনদিকে আর কোনও জানালা নেই। ঘরে আর কেউ নেই খাট বা অন্য কোনও আসবাবপত্র, কিছুই নেই ঘরে। টয়লেটও নেই। চোখ ধাঁধানো কয়েকটা বাতি আছে শুধু ছাদে ওগুলোকে লোহার খাঁচার ভিতরে বসানো ছোট ছোট সূর্য মনে হচ্ছে

চিন্তাগুলোকে যৌক্তিক করার চেষ্টা করল সোহেল মনে পড়ছে, বন্দি হবার পর মারতে মারতে ওকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল আমেরিকান সৈনিকরা একবার জ্ঞান ফিরেছিল, যখন ওকে তোলা হলো একটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারে। বারবার বমি করছিল ও, এছাড়া তেমন কিছু স্পষ্ট মনে পড়ে না তারপর একসময় থামল আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার, কতক্ষণ পর কে জানে। ওকে স্ট্রেচারে করে নামানো হলো। তখন কোথায় আনা হয়েছে সেটা ঝাপসা ভাবে দেখতে পেয়েছিল ও।

ভোর হচ্ছিল তখন, সূর্যের আভায় ধুলোময় প্রান্তরের মাঝখানে বিরাট একটা দুর্গ দেখেছিল অনেক উঁচু গ্র্যানিটের প্রাচীরটাকে ঘিরে ছিল কাঁটাতারের বেড়া সামনের দেয়ালে দু'-

কোনায় দুটো গার্ড টাওয়ার যেন আকাশ ছুঁয়েছে। দেয়ালের বাইরে এবং প্যারাপেটের ওপরে টহল দিচ্ছিল সশস্ত্র সৈনিক ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারগুলো ধুলো উড়িয়ে আসছিল-যাচ্ছিল। খুব ব্যস্ততা ছিল চারপাশে। একটু পর পর দুর্গের ভেতরের প্রাঙ্গণ থেকে উঠছিল-নামছিল হেলিকপ্টার গানশিপ।

সোহেলের চিন্তায় ছেদ পড়ল দরজার তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দে। খুলে গেল দরজা। চৌকো কাঁধের চিকন-চাকন এক মাঝারী উচ্চতার অফিসার ঢুকল ভেতরে। তার পরনে আমেরিকান সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। বুকে ও কাঁধে কর্নেলের ইনসিগনিয়া। সোহেল আন্দাজ করল, কর্নেলের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। ধূসর চুলগুলো খাটো করে ছাঁটা। নিষ্ঠুর চেহারায় প্রবল কর্তৃত্বের ছাপ

গলাটা কর্কশ তার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমি কর্নেল হেনরি মর্গান। তোমার নাম কি?'

'সোহেল আহমেদ,' জড়ানো গলায় বলল সোহেল।

'তালেবান?'

'না। আমি আফগান নই, বাংলাদেশি।'

'বাংলাদেশি?' ভ্রূ কুঁচকে গেল কর্নেলের। 'তার মানে জেএমবি? তালেবানদের হয়ে লড়তে এসেছ? সেজন্যেই সঙ্গে পাসপোর্ট নেই।'

'না আমি... থেমে গেল সোহেল। বলা যাবে না ও বাংলাদেশ দূতাবাসের কেউ। বললে বাংলাদেশ সরকারকে ভয়ানক বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে বিসিআই-এর কর্মকর্তা বলবার তো প্রশ্নই ওঠে না অবৈধ অস্ত্রের চালানের সঙ্গে ধরা পড়েছে ও। ওর পাশে পড়ে ছিল ব্যবহৃত কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল সোহেল স্থির করল মুখ বুজে থাকবে।

'আমি কী?' এক পা সামনে বাড়ল কর্নেল। 'কথা বলা হচ্ছে না যে? যা বলার বলে ফেলো, ইন্টারোগেশন সহজ হবে না কঠিন

হবে সেটা নির্ভর করছে কিন্তু তোমারই ওপর।' থামল সে। সোহেলের রক্তাক্ত, থেঁতলানো মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

চুপ করে থাকল সোহেল।

'আমি কাবুলে আমার সুপিরিয়রের কাছে তোমার কথা জানাতে পারি,' আবার শুরু করল কর্নেল। 'সেক্ষেত্রে কাবুলে পাঠাতে হবে তোমাকে। কিন্তু আপাতত তা করব না আমি। এদেশটাকে আমি ঘৃণা করি, কাজেই একটা সুযোগ পাচ্ছ তুমি। মুখ খোলো, তালেবানদের ঘাঁটি সম্বন্ধে যা জানো বলো, আমি যদি ওদের দমন করতে সফল হই তা হলে সুপিরিয়র অফিসাররা সন্তুষ্ট হবে, দেশে ফেরত যাবার একটা সুযোগ পাব। বদলে কথা দিচ্ছি, তোমাকে আর কোনও অত্যাচার করা হবে না। এবার শুরু করা যাক।' আরেক পা সামনে বাড়ল কর্নেল মর্গান 'কয়েকটা প্রশ্ন করব তোমাকে, ভেবেচিন্তে জবাব দেবে। আফগানিস্তানে কেন এসেছ? তোমাদের দলের আর কে কে বর্ডার ক্রস করেছে বা করবে? করলে কোথা দিয়ে? অস্ত্রের চালান কবে ও কোথা দিয়ে আসবে আবার? সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক, আলফাজ কুশে, আহম্মদ আলীদের দস্যুদলের ঘাঁটি কোথায় কোথায় আছে?' একটু থামল সে। 'আপাতত এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমার কাছ থেকে আশা করছি আমি

চুপ করে কর্নেলের চোখে তাকিয়ে থাকল সোহেল। সারা-শরীরের প্রচণ্ড ব্যথা ওকে ভোগাচ্ছে, কিন্তু চেহারায় তার কোনও ছাপ নেই। বমি পাচ্ছে ওর, মোচড় মারছে পেটের ভিতরটা।

'ও, তা হলে জবাব দেবে না ঠিক করেছ?' নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বাঁকা হাসল কর্নেল। 'তা হলে সার্জেন্ট ট্রিসট্রিমকে ডাকতে হয়। ও আমার ইন্টারোগেশনে সাহায্য করে।'

ভারী শরীরের এক ন্যাড়া-মাথা নন-কমিশন্ড অফিসার ঢুকল এবার ঘরে, ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে তার

'তুমি আর সার্জেন্ট দু'জন দু'জনকে ভালই বুঝতে পারবে, তবে একটা অনুরোধ, খুব জোরে চেঁচিয়ো না।' ঠোঁট বাঁকা করে হেসে ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কর্নেল হেনরি মর্গান চলে যেতেই সোহেলের দিকে এগোল সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম। প্রথমেই সোহেলের পাশে ঝুঁকে বসে ওর কাঁধের বুলেটের ফুটোয় তর্জনী ঢুকিয়ে জোরে জোরে ঘোরাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো কাঁচা ক্ষত থেকে। ব্যথায় মোচড় খেল সোহেল, দাঁতে দাঁত চেপে আর্তচিৎকার ঠেকাল অনেক কষ্টে।

এবার ঠোঁট থেকে নিয়ে ওর নাকের ফুটোয় সিগারেটটা ঢুকিয়ে দিল সার্জেন্ট সোহেলের মনে হলো মাথার ভিতর কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো।

পরবর্তী বিশ সেকেন্ড পেরোনোর আগেই বিধ্বস্ত সোহেল বুঝল, নিষ্ঠুরতার কোনও সীমা নেই লোকটার। সায়ানাইডের একটা ক্যাপসুল যদি থাকত এখন...

দু' গালে জোরাল ঘুসি খেয়ে হড়হড় করে বমি করতে শুরু করল ও নাক দিয়ে বেরিয়ে আসা বমি নিভিয়ে দিল নাকের ফুটোয় ঢুকিয়ে দেয়া জ্বলন্ত সিগারেট।

উঠে দাঁড়িয়ে চুলের মুঠি ধরে রক্তের পুকুরের ওপর থেকে ছেঁচড়ে টেনে মেঝের আরেকদিকে সরাল ওকে সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম। এবার শুরু হলো এক পায়ে বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আরেক পায়ে তলপেটে ধুপধাপ সবুট লাথি কখন কাতরাতে শুরু করেছে বলতে পারবে না সোহেল। এক সময় ওর কাতর আওয়াজ জোর গোঙানিতে রূপ নিল। তারও বেশ কিছুক্ষণ পর ভাগ্য সহায় হলো ওর, জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সোহেল।

দুই

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, মতিঝিল, ঢাকা।

সকাল সাতটা পঞ্চান্ন মিনিট কনফারেন্স রুমের চকচকে, লম্বা টেবিলের দু'পাশে বসে আছে বিসিআই-এর প্রথমসারির প্রায় সবক'জন এজেন্ট। বাদ নেই জাহেদ, সলীল, সোহানা, রূপাও। অন্যসময় সবাই ওরা একসঙ্গে জড় হলে হাসি-ঠাট্টায় মেতে ওঠে, কিন্তু আজ কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না, গম্ভীর প্রত্যেকের চেহারা। বিরাট ঘরটায় থমথমে নীরবতা।

আটটা বাজবার ঠিক দু'মিনিট আগে কনফারেন্স রুমের দরজা খুলে গেল, ঋজু ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান উঠে দাঁড়াল সবাই সবার নীরব সালামের জবাবে একবার মাথা দুলিয়ে টেবিলের মাথায় নির্ধারিত চেয়ারটায় বসে পড়লেন তিনি। একটা পাইপ ঝুলছে তাঁর ঠোঁটের কোণে, কিন্তু ধোঁয়া বের হচ্ছে না। হয়তো নিভে গেছে আগুন, বা তামাক ভরতেই ভুলে গেছেন। সবাই বসার পর চট্ করে একবার বাম পাশের খালি চেয়ারটা দেখে নিলেন। আরও গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর চেহারা।

কনফারেন্স টেবিলের আরেক মাথায় প্রধান-মন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার। রাহাত খানের ডান পাশের চেয়ারটায় বসে আছে মাসুদ রানা মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কড়া চোখে ওকে একবার দেখলেন রাহাত খান। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, 'সবাই তোমরা শুনেছ কী ঘটেছে।' তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী চোখ বুলালেন

প্রত্যেকের ওপর। 'ডিটেইলস জানানো হয়নি তোমাদের। ওটা এখন রানা জানাবে।' পাইপ নেড়ে রানাকে শুরু করতে ইশারা করলেন তিনি।

ফাইলে চোখ নামাল রানা। ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করল।

'আফগানিস্তানে বাংলাদেশ এম্ব্যাসির জরুরি একটা কাজে সোহেলকে পাঠানো হয়েছিল, সেটা আমরা জানি। সেখানে কাজ সেরে ফিরে আসার আগে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ও। সে-সময় বালাবাগের কাছে সীমান্তবর্তী এলাকায় ওর এক বন্ধুর সঙ্গেও দেখা করে সোহেল ওর সেই বন্ধু জাবের আল কুতুব তখন অস্ত্রের একটা চালান নিয়ে পাকিস্তান থেকে ফিরছিল। রাতে ওদের ওপর আফগান সরকারী বাহিনী ও ন্যাটো ফোর্সের আমেরিকানদের হামলা হয় ওই হামলায় জাবের আল কুতুবের দলের প্রায় সব ক'জন আফগান যোদ্ধা মারা যায়। মাত্র দু'জন পালাতে পেরেছিল। তাদের কাছে জানা গেছে, কপ্টারের সার্চলাইটের আলোয় তারা দেখেছে, আহত সোহেলকে মারতে মারতে একটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারে তুলছে আমেরিকান সৈন্যরা। খবরটা তারা সোহেলের আরেক বন্ধু আবদেল আবু খাদেমের কাছে পৌঁছে দেয়। ওই লড়াইয়ে খাদেমের ছোট ভাইও মারা গেছে তাড়াহুড়ো করে ভাইয়ের গায়েবানা জানাজা শেষ করেই আবদেল আবু খাদেম বাংলাদেশ এম্ব্যাসিকে জানায় কী ঘটেছে সেখান থেকে গতকাল রাত আটটায় খবরটা পাঠানো হয় ঢাকায়।' থামল রানা

জাহেদ জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি জানি সোহেলকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'নিশ্চিত ভাবে না,' বলল রানা। আবার ফাইলে চোখ নামাল 'সেই দুই আফগান যোদ্ধা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পেছন থেকে ন্যাটো ফোর্সকে বেশ কিছুদূর অনুসরণ করে। আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারগুলোকে নোশাকের কাছাকাছি, কোওতাল-ই দোরা'র

দিকে যেতে দেখেছে তারা। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বাগ্রিকোটের আশপাশে ন্যাটোর কোনও বেয নেই, তবে হিন্দুকুশ পর্বতমালার কাছে আমেরিকানদের সুরক্ষিত দুর্গ আছে। সম্ভবত ওদিকেই কোনওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সোহেলকে। কাবুলের ওরাও জানিয়েছে, ন্যাটো ফোর্স জালালাবাদের উত্তরে বেশ কয়েকটা ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছে সোহেলদের ওপর যে আক্রমণ হয় সেটাও হয়তো ওগুলোরই একটা। কাবুলে বিসিআই এজেন্টরা তাদের সোর্সের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছে আমেরিকান এম্ব্যাসি-তে আফগান ইনফর্মেন্ট যারা আছে তারা কিছু জানাতে পারেনি। জোর দিয়ে বলেছে, সিআইএ জানে না আমেরিকান আর্মির হাতে বন্দি হয়েছে কোনও বাংলাদেশি। তার মানে সোহেল সম্ভবত নিজের পরিচয় এখনও গোপন রাখতে পেরেছে।'

আরেকটা সম্ভাবনা আছে, সোহেল হয়তো মারা গেছে: কথাটা অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারল না বলেই ফাইলের লেখাটা না পড়ে মুখ তুলে রাহাত খানের দিকে তাকাল রানা।

'আমাদের পক্ষে সোহেলকে উদ্ধার করতে কাউকে পাঠানো সম্ভব নয়।' সবার ওপর চোখ বুলাচ্ছেন রাহাত খান। 'আমাদের পররাষ্ট্র নীতি বর্তমান বিশ্বের এই সংকটময় অবস্থায় একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে টুঁ-শব্দ করাও অ্যালাউ করে না।' প্রত্যেকের চেহারায় প্রতিবাদের ছাপ দেখলেন তিনি, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কিছু বলল না পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া টানলেন রাহাত খান, তারপর ছাদের দিকে উগরে দিলেন নীলচে সুগন্ধী ধোঁয়া 'অফিশিয়ালি আমাদের হাত-পা বাঁধা। এ-ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছি আমি। আমরা যদি কাউকে পাঠাতাম এবং সে ধরা পড়ত, তা হলে বাংলাদেশ ভীষণ বিপদে পড়ে যেত কাজেই আমাদের এটা ধরে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।'

রানা দাঁড়িয়ে পড়ল, রাগে থমথম করছে চেহারা। শান্ত গলায় অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলল, 'সার, আমার মেডিকেল লীভ দরকার। ডাক্তার কয়েকদিন আগেই আপনাকে রিপোর্ট করেছেন যে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে আমাকে।'

'কবে থেকে ছুটি দরকার তোমার?' একটু থমকে গিয়ে রানার চোখে কী যেন খুঁজলেন রাহাত খান।

'আজ থেকে, সার,' মুখ নিচু করে নিল রানা।

'রানার কথটা মানবিক দিক থেকে বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে,' মন্তব্য করলেন চিন্তিত রাহাত খান। খানিক কী যেন ভেবে নিয়ে খুকখুক করে কাশলেন তিনি।

'সার, আমারও ছুটি দরকার,' সবাই প্রায় একযোগে বলে উঠল। বাদ গেল না সোহানা, রূপা, নতুন জয়েন করা তেইশ বছরের মিমিও। মেয়েদের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে উঠল পুরুষ এজেন্টদের গলার আওয়াজ।

ক্ষণিকের জন্য কি সন্তুষ্টির ছাপ দেখা গেল রাহাত খানের তীক্ষ্ণ দু' চোখে?

গলা খাঁকারি দিলেন তিনি। 'সবাইকে একসঙ্গে ছুটি দেয়া সম্ভব নয়। অফিসে অনেক কাজ জমে আছে। কার কী জন্য ছুটি দরকার বলতে পারো, রানা ফিরবার পর সবার আবেদন আমি একে একে বিবেচনা করে দেখব।'

সলীল হাত উঁচু করল। তার দিকে তাকালেন রাহাত খান।

'সার, সবচেয়ে বেশি ছুটি পাওনা আছি আমি। দেশের বাইরেও অনেকদিন যাইনি। আমার মনে হয় ছুটি পেলে বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারতাম।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে আরেকবার সবাইকে দেখলেন রাহাত খান। 'আর কারও কোনও বক্তব্য আছে?'

'সার, সোহেল না থাকায় ওর কাজগুলো আপাতত আমি করছি,' বলল জাহেদ। 'কাবুলে বাংলাদেশ এম্বেসি থেকে কিছু টপ

সিক্রেট ডকুমেন্ট আনা দরকার, যেগুলো ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে আনানো নিরাপদ নয়। আমার মনে হয় ছুটিতে কাজটা আমি চট্ করে সেরে আসতে পারতাম, আবার আফগানিস্তান দেখাটাও হয়ে যেত। ...অবশ্য রানার মেডিকেল লীভটাই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য, সার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জাহেদ। পরক্ষণেই যোগ করল, 'কিন্তু, সার, এখানে আমার হাতের কাজ শেষ হলে কাবুলে বাংলাদেশ এম্বেসিতে যাওয়াটা আমাদের দেশের স্বার্থে খুবই জরুরি।'

'বেশ, ফাইলওয়ার্ক শেষ করো, তোমার ছুটির ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব,' বললেন রাহাত খান।

'প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড রেজিমেন্ট ঢেলে সাজাবার কাজটা প্রায় শেষ আমার, সার,' বলল সলীল। 'কাজটা শেষ হলে আমি কি কয়েকদিনের ছুটি পেতে পারি?'

'আগে কাজ শেষ করো, তারপর দেখা যাবে,' গম্ভীর স্বরে বললেন বিসিআই চিফ। 'ছুটি কাউকে দেবই এমনটা না-ও হতে পারে, দেশের স্বার্থ রক্ষায় যখন-তখন দরকার পড়তে পারে তোমাদের।'

চেয়ার ছাড়লেন রাহাত খান। 'তা হলে রানাই ছুটি পাচ্ছে,' বলে মাসুদ রানার দিকে তাকালেন। 'অ্যাপলিকেশন নিয়ে দেখা করো। আমি আশা করব মেডিকেল লীভের মধ্যে অযথা কোনও ঝুঁকিতে নিজেকে জড়াবে না তুমি।'

সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে। রানা বিনীত গলায় বলল, 'জী, সার। জী না, সার।'

তড়িঘড়ি করে রাহাত খানের পিছু নিল রানা, নিজের ছোট্ট অফিস-ঘরে গিয়ে প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ওর জন্য ছুটির দরখাস্ত তৈরি করতে বলতে হবে, অফিশিয়াল নিয়ম। ছুটি পাবার পর বেশ কিছু জরুরি কাজও সারতে হবে ওকে, প্লেনের টিকেট ও ভিসার ব্যবস্থা করতে হবে, অফিস আওয়ারের পর চিঠি দিয়ে

শামসের আলীর বাসায় পাঠাতে হবে গিল্টি মিয়াকে। শামসের আলীর ব্যক্তিগত ল্যাবোরেটরি থেকে কিছু জিনিস ধার নিতে হবে ওকে, নইলে বিপদে পড়ে যাবে ও। আশা করা যায় শামসের আলী ওগুলো দিতে আপত্তি করবেন না।

আজ রাতের ফ্লাইটেই গিল্টি মিয়াকে একদিনের জন্য পাকিস্তানে যেতে হবে। ইন্টারনাল ফ্লাইটে লাহোর হয়ে পেশোয়ারের আদমিনে যাবে ও, রানা এজেন্সির চিফ আসাদ রেযার কাছে দরকারী জিনিসগুলো পৌঁছে দেবে, সেই সঙ্গে তার হাতে দেবে রানার নির্দেশ সম্বলিত চিঠি, তারপর ফিরে এসে রানা এজেন্সির ঢাকা শাখায় যেসব জরুরি কেস পড়ে আছে সেগুলো দেখবে ওর অবর্তমানে।

অন্যরা রানার পিছু নিয়ে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই হঠাৎ সবাইকে একটু অপেক্ষা করতে বলল সলীল। সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য জানাল ও। 'অফিশিয়ালি যাচ্ছে না ও, কাজেই অফিশিয়ালি ওকে সাহায্য করার কোনও উপায় নেই বিসিআই-এর,' বলে নিজের কথা শেষ করল সলীল।

ওর প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, ফলে আপত্তি করল না কেউ। জাহেদ, সোহানা, রূপার মতো অভিজ্ঞ এজেন্টরা জোর সমর্থনই দিল বরং। সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে যেতেই যে-যার অফিসের দিকে রওনা হলো সবাই। শুধু সোহানা চলল বিসিআই-এর টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের দিকে। ডক্টর শামশের আলীর সঙ্গে জরুরি কথা আছে ওর।

*

পরদিন সকাল। আটটা বাজে। নাস্তার টেবিল ছেড়ে উঠতে গিয়েও অবাক হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হলো রানা। সবসময় ওর খাওয়ার সময়টা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে রাঙার মা, তার ধারণা অনুযায়ী ও কম খাচ্ছে মনে হলে তবেই বেরিয়ে এসে অনুযোগ করে, ও জানে। কিন্তু আজকে কী হলো? আজকে তো

রীতিমতো ঠেসে খেয়েছে ও, তারপরও রাঙার মা লাজুক হাসি নিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল কেন? অনুযোগই বা করছে না কেন? আর ঘোমটা টানা, এটা তো সাজ্ঘাতিক ব্যাপার! মতলব আছে কোনও। ব্যাপারটা কী বুঝতে হয়! গম্ভীর চেহারায় রাঙার মা'র আঁচল-আবৃত মাথাটার দিকে তাকাল রানা।

'কিছু বলবে?'

ঘোমটা আরও খানিকটা টানল রাঙার মা, সামান্য ফাঁকটা দিয়ে রানাকে দেখছে। 'জী, আব্বা। একটা কথা।'

রাঙার মা'র ফোকলা সরল হাসিটা দেখলে কেমন যেন আপনাআপনি হাসি চলে আসে নিজেরও, আর এখনও বোধহয় বিনা কারণেই হাসছে রাঙার মা। কিন্তু চেহারাটা গম্ভীরই থাকল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রানার। 'বলো।'

শাড়ির আঁচলের শেষ প্রান্তের গিঁঠ খুঁটতে শুরু করল রাঙার মা। 'আব্বা, নাগ করবেন না তো?'

'করতেও পারি,' বলল রানা। 'কী বলবে বলে ফেলো। এখনই রওনা হয়ে যাব আমি, রেডি হতে হবে।'

'নেডি হবার আগে একটা জিনিস দিতাম...'

'কী সেটা?' কথা আর বাড়াল না রানা। অধৈর্য কণ্ঠে বলল, 'কী দেবে দাও, জলদি!'

দস্তার গোল একটা কাঁঠালের বিচি আকৃতির বড়সড় তাবিজ বের হলো রাঙার মা'র আঁচলের গিঁঠ থেকে। আস্তে করে ওটা টেবিলের ওপর রাখল সে। রীতিমতো কাতর স্বরে বলল, 'আব্বা, খুব ভয় নাগতিছে। এটা পরলি আর কোনও ভয় নাই। একজন অনেক কষ্টে জোগাড় কইরে দেছে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানার চেহারা। ও দেশের বাইরে গেলেই পীরের কাছে ওর জন্য দোয়া চাইতে ছোটে রাঙার মা, বিভিন্ন দরগায় মানত করে; সেটা না হয় মেনে নেয়া গেল, কিন্তু তাই বলে ওকে রাঙার মা'র দেয়া তাবিজও পরতে হবে?

ব্যাপারটা বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না? মানা করে দিতে গিয়েও একটু থমকে গেল রানা, এককথায় মানা করে দিলে মনে খুব কষ্ট পাবে মমতাময়ী বুড়ি, ওর জন্য দুশ্চিন্তা করে কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলবে। ছেলের বউয়ের ওপরে রাগ করে চলে আসা এই বিধবা মানুষটা ওর মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে কবে যেন। ছেলে নিজেদের ভুল বুঝে ফিরিয়ে নিতে এসেও রাজি করাতে পারেনি মাকে, রানাকে ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি কিছুতেই রাঙার মা। সেই থেকে ওর বাড়ি আগলে রেখেছে বুড়ি, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। রাঙার মা'র নিঃস্বার্থ ভালবাসা ওকে ছেলেবেলায় হারানো মায়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'কোন্ পীরের তাবিজ, রাঙার মা?'

'আমি তো তাকে চিনি না,' কুণ্ঠিত গলায় জানাল রাঙার মা। গলা থেকে অগাধ বিশ্বাস ঝরে পড়ল, 'যে এনেছে সে বলেছে বড় কামেল দরবেশের দেওয়া তাবিজ। যে পরবে তার ক্ষতি কেউ করতি পারবে না। আব্বা, নেবেন না তাবিজটা?'

'এনেছে কে এটা?' জবাব না দিয়ে জানতে চাইল রানা। মনে মনে বলল, যে-ই এনে থাকুক, সে-ও বিশ্বাসের দিক থেকে রাঙার মা'র চেয়ে কম যায় না বোধহয়, কারণ সুতোর বদলে রুপোর চেইন লাগানো হয়েছে তাবিজের আঙটায়। কামেল দরবেশের তাবিজ বলে কথা! নিশ্চয়ই ভাল টাকাই খসিয়েছে রাঙার মা'র।

'বললি পরে তাবিজের গুণ নাকি নষ্ট হয়ে যাবে,' মিনমিন করে বলল রাঙার মা। ঘোমটা আরও খানিকটা টেনে নিল।

'যদি নিই তা হলে তুমি খুশি তো?' রানা আশা করল ওর কৌশল রাঙার মা'র মাথায় ঢুকবে না।

'কিন্তু, আব্বা, আপনি সামনের এক মাস এটা না পরলে...

এই আশঙ্কাই করছিল রানা। অর্থাৎ এখন রাঙার মা'র মানসিক প্রশান্তির জন্য তাবিজটা পরতে হবে ওকে, নইলে দুঃখ

দিতে হবে সরল মানুষটার মনে। কী করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে চট্ করে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল ও। সুটকেস গোছানোই আছে, গাড়িটা গ্যারাজ থেকে বের করে এয়ারপোর্ট, বনানী থেকে বড়জোর বিশ মিনিট। তবে উঠতে হবে ওকে এখনই।

টেবিলের ওপর টপ করে ঝরে পড়া এক ফোঁটা অশ্রু ওর মন গলিয়ে দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাবিজটা দু'আঙুলে ধরে তুলল ও, গলায় চেইনটা পরে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, বেডরুমের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'এবার খুশি তো?'

পিছন থেকে রাঙার মা'র অস্ফুট, বাষ্পরুদ্ধ গলা শুনতে পেল রানা। ফিরে তাকালে দেখতে পেত, পশ্চিম দিকে ফিরে দু'হাত তুলে ওর জন্য একমনে দোয়া করছে সে এখন, চোখ থেকে টপটপ করে লোনা জল ঝরছে।

সুটকেসটা তুলে নিয়ে সোহেলের হাসিমুখটা আবারও, হয়তো শতবারের মতো, মনে পড়ল রানার। গত পরশু রাতে সোহেলের বন্দি হবার খবরটা এসেছে, তার পর থেকেই তাড়া করে ফিরছে ওকে মধুর সব স্মৃতির ঝড়, অথচ ওগুলো এখন শুধু কষ্টই বাড়াচ্ছে ওর। সোহেল যেন বারবার ওর কানের কাছে কপট রাগে বলছে, 'কীরে, শালা, আছিস কেমন?' তারপর ওর করুণ কণ্ঠ ভেসে আসছে কানে, 'আমি ভাল নেই, দোস্ত!'

পাকিস্তানের পেশোওয়ার-আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে ধুলোময় বিস্তৃত সমতল জুড়ে যেদিকে তাকানো যাক না কেন, দেখা যাবে বস্তি। ঘিঞ্জি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢাকার বস্তিগুলোর কথা মনে পড়ল রানার। ওরকম হাজার হাজার বস্তির সমষ্টি এই জায়গা। তবে এখানে বেশিরভাগ মানুষই বাস করে কম্বলের তৈরি ছাপরায়। পরস্পরের গায়ে লেগে রয়েছে ওগুলো, মাঝখান দিয়ে পথ করে এগোনো কঠিন।

জাতিসংঘের বেশ কিছু নামকাওয়াস্তে হাসপাতাল আছে এখানে, উদ্বাস্তুদের চিকিৎসা সেবা দেবার জন্য। তবে ওষুধ-পত্র নেই বললেই চলে। ছাদ নেই একটা হাসপাতালেরও। খাটিয়ায় পড়ে থাকা রোগীদের গরমের দিনে কড়া সূর্যের নীচে পুড়তে হয়, হাড়-কাঁপানো শীতে মেলে না উপযুক্ত শীতবস্ত্র, বর্ষায় ভেজে তারা বৃষ্টিতে।

চারপাশে লোক গিজগিজ করছে। হইচই, ব্যস্ততার যেন বিরাম নেই কোনও। পঙ্গু শিশু, ঝলসে যাওয়া মহিলা, অন্ধ বৃদ্ধরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিড়ের মধ্যে। তাদের সংখ্যা এতো বেশি যে বিস্মিত হতে হয়। সেই উনিশশো উনআশি সালে রাশিয়ানরা এক লক্ষ পনেরো হাজার সৈন্য সহ ঢুকে পড়েছিল আফগানিস্তানে। তাদের তাড়া খেয়ে ইরান ও পাকিস্তানে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় অনেক লোক। সেই সব উদ্বাস্তুদের বড় একটা অংশ নিয়েই গড়ে উঠেছে পেশোয়ারের বিশাল এই বস্তি।

অত্যন্ত গর্বিত একটা জাতি আফগানরা, স্বনির্ভর ছিল প্রায় সবসময়, কিন্তু বিগত শতকে বারবার ভাগ্যের পরিহাস বরণ করে নিতে হয়েছে তাদের, হাত পাততে বাধ্য হয়েছে তারা পেটের জ্বালায়।

শুধু শারীরিক ভাবেই নয়, মানসিক ভাবেও চারপাশের এই মানুষগুলো আহত, অন্তর দিয়ে অনুভব করল রানা। কৃষকরা হারিয়েছে তাদের চাষের জমি, গ্রামবাসীরা ভিটে, সর্দাররা তাদের পশুর পাল।

দূরে তাকাল রানা। একবার গলার কাছে রূপার চেইনে ঝুলে থাকা দস্তার গোল তাবিজটা স্পর্শ করল আনমনে। জিনিসটা খুলে রেখে দিতে চেয়েছিল ও, কিন্তু যেহেতু কথা দিয়েছে রাঙার মাকে, কাজেই আগামী একমাস এই অস্বস্তিকর জিনিসটা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে ওকে।

বিখ্যাত খাইবার গিরিপথ এখান থেকে মাত্র দশ মাইল।

এঁকেবেঁকে সরু ফাটল ধরে হাজার হাজার ফুট উঁচু লাইমস্টোনের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বিশাল হিন্দুকুশ পর্বতমালার তুষারধবল চূড়াগুলোর দিকে গেছে খাইবার গিরিপথ।

ওটা আফগানিস্তান। ওখানেই যেতে হবে ওকে। তবে কোন্ দিক দিয়ে সীমান্ত পেরোবে সেটা এখনও জানে না রানা। গাইডের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হচ্ছে ওকে, যদিও ব্যাপারটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। সময় স্বল্পতার কারণে নিজে ও যাত্রার প্রস্তুতি নিতে পারেনি, ওর নির্দেশে সমস্ত আয়োজন করেছে রানা এজেন্সির পেশোয়ার শাখার প্রধান আসাদ রেযা। সে অবশ্য বারবার করে বলেছে, গাইড লোকটা পুরোপুরি বিশ্বস্ত, দরকারে জীবন দিতেও রাজি। ওর ওপর ভরসা করা যায় নির্দ্বিধায়। আসাদ রেযার সোর্স জানিয়েছে, সোহেল যেখানে বন্দি হয়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, তার কাছাকাছি এলাকার একজন সর্দারের সঙ্গে পরিচয় আছে গাইডের।

রানা এজেন্সি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ওর অভিযানের সমস্ত প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে, একটা দোকানে।

বিকেলের লালচে রোদে ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নির্দিষ্ট দোকানটার দিকে এগিয়ে চলল রানা। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে পনেরো মিনিট পর ওখানে পৌঁছে গেল ও।

পড়ো চেহারার একটা দোকান। নগ্ন একটা বালব জ্বললেও ভিতরে কেমন যেন ছায়া ছায়া ভাব, তবে বাইরের তুলনায় বেশ ঠাণ্ডা। বাতাসে ভাসছে কারির সুবাস। কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো কঙ্কালসার পাকিস্তানি লোকটা রানাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। প্রচুর গাঁজা টানার কারণে তার লালচে চোখের আইরিস দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে। খানিকটা লোভও যেন প্রকাশ পাচ্ছে তার দৃষ্টিতে।

দোকানের ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। সারি সারি সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্লাস্টিক ও কাঠের নকল হাত-পা।

মাইন বিস্ফোরণে আহতদের কাছে ওগুলো বিক্রি করা হয়।

'কী দরকার আপনার?' খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল পাকিস্তানি।

'ঈসার কাছে এসেছি, ও কি আছে?' কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল রানা।

প্রশ্নটা শুনে সন্দেহের ছায়া খেলে গেল কঙ্কালের গর্তে ঢোকা চোখে। 'এখানে এসেছেন কেন? কেন আপনার মনে হলো এখানে ঈসাকে পাওয়া যাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঈসা একজন পয়গম্বর।'

'এই ঈসাও কি তাই?' কঙ্কালের চেহারা দেখে মনে হলো রানা হ্যাঁ বললে ওর কথা বিশ্বাস করা যায় কি না তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবে সে।

'না।'

আস্তে করে মাথা দোলাল পাকিস্তানি কঙ্কাল। কোড বলার পরও সন্দেহ যাচ্ছে না তার। আমেরিকার পা-চাটা পাকিস্তানি সরকার যদি জানে এখানে সে কীসের ব্যবসা খুলে বসেছে তা হলে কপালে খারাবী আছে তার। কঙ্কাল জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম?'

'মাসুদ রানা।'

এবার বুক পকেট থেকে সাদা-কালো একটা ছবি বের করে রানার চেহারা ভাল মতো মিলিয়ে দেখল সে, তারপর কাউন্টারের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে ভিতর থেকে তালা মেরে দিল। অপেক্ষাকৃত দামি নকল হাত-পা রাখা হয়েছে একটা আলমারিতে, ওটা এক পাশে টান দিল। হড়হড় করে সরে গেল চাকা লাগানো আলমারি। ওটা যেখানে ছিল সেখানে একটা দরজা দেখা গেল এবার। হাতের ইশারায় রানাকে আসতে বলে ভিতরে ঢুকল লোকটা।

বাতি জ্বলছে ভিতরের ঘরে। চার দেয়ালে টাঙানো আছে

হরেক রকম অস্ত্র। অ্যাসল্ট রাইফেল, বাযুকা, মর্টার, মেশিনগান, পিস্তল – তলোয়ার ও ছোরাও বাদ পড়েনি।

রানা লক্ষ করল, সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্রই ব্যবহৃত, প্রাচীন, প্রায় অকেজো।

ঘরে আরেকজন আছে। মাঝারী উচ্চতা, চিতানো বুকের এক আফগান যুবক। লম্বাটে মুখ তার, গোল চোখ দুটোর বিষণ্ন, ছলছলে দৃষ্টি দেখলে মনে হয় কেঁদে ফেলবে এখনই। কালো দাড়ি বুক ছুঁয়েছে তার।

'আসাদ রেযা পাঠিয়েছেন আপনাকে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে। কণ্ঠস্বর দরাজ।

'হ্যাঁ।'

'আমিই ঈসা। ঈসা আজনবী।'

'আমি মাসুদ রানা,' মৃদু স্বরে বলল রানা। লোকটাকে ভাল করে দেখল। এই লোকই ওর গাইড, এ-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ওকে কোওতাল-ই দোরা'র কাছাকাছি কোনও জায়গায়। ওখানে গোত্রপ্রধান ইউনূস মোসাদ্দেকের কাছে পৌঁছে দেবে ওকে। যদি ও ইউনূস মোসাদ্দেকের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে, তা হলে হয়তো সাহায্য পাবে, জানতে পারবে ওখানে কোথায়, কোন্ দুর্গে বন্দি হয়ে আছে সোহেল। গোটা ব্যাপারটা অনিশ্চিত, পরিস্থিতিটা রানার পছন্দ হয়নি, তবে এই লোকেরই পরামর্শে ইউনূস মোসাদ্দেকের জন্য উপঢৌকন হিসাবে বেশ কিছু অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরক নিতে হচ্ছে ওকে। ঈসা আজনবী পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছে, সে কাবুলের লোক, ইউনূস মোসাদ্দেক তাকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। উপঢৌকনগুলো কাজে আসতে পারে।

'আপনার জিনিস বুঝে নিন,' একটু সরে বসে পড়ল ঈসা আজনবী, একটা কাঠের ক্রেট খুলতে শুরু করল।

ডালাটা তোলার পর ভিতরে তাকাল রানা। ফোমের ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, ডেটোনেটর,

ইলেকট্রনিক ডেটোনেটর, ফিউয, ব্যাটারি, রিমোট কন্ট্রোল, কমান্ডো ফেটিগ। এক পাশে শুয়ে আছে ডক্টর শামশের আলীর মডিফাই করা এম-২০৩ অটোমেটিক রাইফেল। ওটার ব্যারেলের নীচে জোড়া দেয়া হয়েছে একটা ৪০ এমএম গ্রেনেড লঞ্চার। লঞ্চারটা থেকে বিশেষ ফোল্ডিং হুক আটকানো দড়ির কয়েলও ছোঁড়া যাবে। দড়ির কয়েলটা ক্রেটের মাথার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। একটা কমান্ডো নাইফ, তিন বাক্স গুলি, রাইফেলের একটা স্পেয়ার ম্যাগাযিনও দেখল রানা। আরও আছে চৌকো একটা বাক্স বোঝাই গোটা তিরিশেক ৪০ এমএম গ্রেনেড। দেখলে শটগানের গুলির সামান্য বড় সংস্করণ বলে মনে হয় ওগুলোকে।

গুলির একটা বাক্স তুলে নিয়ে পরখ করল রানা। সন্তুষ্ট হলো। খুঁটিনাটি ব্যাপারে ভুল হয় না শামশের আলীর। বেঁচে ফিরতে পারলে একটা ধন্যবাদ দিতে হবে ভদ্রলোককে। ও যেমন চেয়েছিল, এম-২০৩ রাইফেলটার ক্যালিবার ৭.৬২ এমএম নয়, ওগুলো ব্যবহৃত হয় রাশিয়ান একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেলে; ওর রাইফেলের ক্যালিবার ৫.৫৬, যে-ক্যালিবার ব্যবহার করে ন্যাটোর সৈনিকরা। রানা আন্দাজ করছে, ওকে যেখানে যেতে হবে সেখানে এই ক্যালিবারের গুলি পাওয়া কঠিন হবে না। তা ছাড়া, ন্যাটোর সৈনিকদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই হলে দ্বিধায় পড়ে যাবে তারা অস্ত্রটার আওয়াজ শুনে। এটা ভাববারও সম্ভাবনা আছে যে, ভুল করে নিজেদের পক্ষের কারও সঙ্গেই গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়েছে তারা।

‘এবার খেয়ে নিন, অনেক দূরে যেতে হবে আপনাদের,’ বলল কঙ্কালসার পাকিস্তানি। একটা টেবিলের ওপর রাখা দুটো ধোয়া বাসন দেখাল সে। টেবিলে রাখা আছে কারি, রুটি, পানি। ‘সামনের মোড়ে আপনাদের জন্য একটা জিপ রাখা আছে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামার পরে ওটা আমি এখানে নিয়ে আসব। আদমিনের কাছে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকবেন আপনারা আফগানিস্তানে।’

তিন

রানার পাহাড়ি ঘোড়াটা দ্রুত চলার উপযোগী নয়, তবে খাড়াই বেয়ে বিরামহীন ভাবে উঠতে অভ্যস্ত। ওটার রোমশ পাগুলো টেলিফোনের থামের মতো মোটা দেখলে মনে হয় চারটে থামের ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে জন্তুটা।

এক হাতে ঘোড়ার রাশ ধরে আছে রানা, ওর আরেক হাতে পিছনের মালবাহী ঘোড়াটার দড়ি। সামনে চলেছে ঈসা আজনবী, সে-ও একটা মালবাহী ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পিছনের ঘোড়া দুটো উপহার হিসাবে নেয়া অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক বহন করছে।

রানা ও ঈসা, দু'জনের পরনে আফগানদের জাতীয় পোশাক – উরু ছাড়িয়ে যাওয়া ঢলঢলে শার্ট, ঢোলা পায়জামা। ঈসা আজনবীর পায়ে কাবলি চপ্পল, তবে রানা ওর কমব্যাট বুট খোলেনি। ঢোলা শার্টের নীচে কোমরে কমান্ডো নাইফটা ঝুলছে ওর, খাপে পোরা এম-২০৩ রাইফেলটা জিনের পাশে বাঁধা।

একটু আগে সকাল হয়েছে। মৃদু মৃদু বইছে শীতল, তরতাজা, পাহাড়ি বাতাস। পাথর এড়িয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া সরু পথটা ক্রমেই ওপরে উঠেছে ঢাল বেয়ে। মাঝেই মাঝেই পথের দু'পাশে জন্মেছে ফার গাছ।

'এটাই সেরা পথ,' পিছন ফিরে বলল ঈসা আজনবী। 'বিদেশিরা চেনে না এটা।'

'আমি ভেবেছিলাম রাতের অন্ধকারে খাইবার পাস দিয়ে যাব

আমরা,’ বলল রানা।

‘ওটার ওপর আমেরিকানরা চোখ রাখে সারাক্ষণ, রাতেও,’ জানাল ঈসা। পথটা আরও খাড়া হয়ে গেছে সামনে। খানিকটা এগোবার পর বলল সে, ‘খাইবারের ইতিহাস জানেন?’

‘বিস্তারিত না।’

‘খাইবারে সামনাসামনি যত লড়াই হয়েছে, তত লড়াই পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি,’ বকবক করার সুযোগ পেয়ে খুশি হলো ঈসা আজনবী। ‘সবচেয়ে রক্তাক্ত লড়াইগুলো হয়েছে এই খাইবারেই। গত শতাব্দীতে ব্রিটিশরা দু’বার চেষ্টা করেছে আফগানিস্তান দখল করতে। প্রথমবারের যুদ্ধে হারে তারা, ফলে দ্বিতীয়বার ফিরে আসে। দ্বিতীয়বারেও মারাত্মক বিপর্যয়ের শিকার হতে হয় তাদের। ব্রিটিশরা যখন দিশে হারিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে শুরু করল, তখন আফগান যোদ্ধারা খাইবারের দু’পাশের টিলায় অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে। সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না আফগানরা, তবে অল্প সময়ে ষোলো হাজার ব্রিটিশ সৈন্য খতম করে দিতে অসুবিধে হয়নি তাদের।’

পথের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় পৌঁছে গেছে ওরা। এখান থেকে পাথুরে উপত্যকার দিকে নেমে চলে গেছে ঢাল। এখানে ওখানে জন্মেছে ফার গাছ। উপত্যকার ওপাশে অনেক দূরে দেখা যায় বিশাল হিন্দুকুশ পর্বতমালা; রুক্ষ পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো সারি উঠে গেছে পঁচিশ হাজার ফুটেরও বেশি ওপরে। চুড়োগুলোতে জমেছে সফেদ বরফ, সকালের নতুন সূর্যের আলোয় লালচে ঝিলিক দিচ্ছে।

‘গত দু’হাজার বছরে লড়াইয়ে কখনও হারেনি আফগানরা,’ আবার শুরু করল ঈসা আজনবী। ‘এখানে বেঁচে থাকা কঠিন, তাই আমরা মানুষগুলোও একটু কঠোর।’ দুটো বড় পাথর-খণ্ডের মধ্য দিয়ে এগোল সে। ‘আলেকযান্ডার দ্য গ্রেট, চেঙ্গিস খান আফগানিস্তান দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পার্শিয়ান, মঙ্গোল,

ব্রিটিশ, রাশিয়ান – আরও অনেক দেশের সামরিক জান্তারা আফগানিস্তান দখলের চেষ্টা করে অসফল হয়েছে। এখন আমেরিকানরা চেষ্টা করছে। ব্যর্থ হতে হবে তাদেরও।'

একটা সবুজ মাঠের কিনারায় পৌঁছে গেছে ওরা। রানার তরফ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে ঈসা আজনবী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কথা খুব কম বলেন, না?'

'যারা গুছিয়ে সুন্দর করে বলতে পারে তাদের ওপরেই কথা বলার কাজটা চাপিয়ে দিই,' বলল রানা।

ঘনঘন মাথা দোলাল ঈসা আজনবী। 'ঠিক আমার মতো।'

মৃদু হাসল রানা, জবাব দিল না

ফার গাছের মধ্য দিয়ে নামছে ওরা। ঈসা আজনবী বলল, 'বিখ্যাত একটা প্রার্থনা আছে, শুনবেন?'

'বলুন।'

'আল্লাহ, গোক্ষুরের কাছ থেকে বিষ দাও আমাদের, বাঘের থাবা থেকে শক্তি দাও; আর, প্রতিহিংসা দাও আফগানদের কাছ থেকে।' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল ঈসা। 'সোভিয়েতরা আমাদের বাড়িতে বোমা ফেলেছে, ফসলে ছড়িয়ে দিয়েছে বিষ, ধর্ষণ করেছে আমাদের মেয়েদের, পুড়িয়ে মেরেছে বাচ্চাদের, গুলি করে মেরেছে আমাদের পশুগুলোকে। আমেরিকানরাও এখন সেই একই কাজ করছে। কারঘাই-এ তালেবানদের হদিশ জানার জন্যে মেয়েদের পা বেঁধে উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়েছে ন্যাটোর সৈনিকরা। খবরটা কোনও নিউজ মিডিয়াতে পেয়েছেন?' তিক্ত হাসল ঈসা। 'পাবেন না। কুকুরের বাচ্চাগুলোকে ন্যাটো হাই-কমান্ডের ওরা কি কঠোর শাস্তি দিয়েছে, জানেন? কিচ্ছু না, স্রেফ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। ...হেলমান্দ প্রভিন্সে একটা গ্রাম আক্রমণ করেছিল ওরা তালেবানদের ঘাঁটি সন্দেহ করে, সশস্ত্র কাউকে না পেয়ে গ্রামের বুড়োদের বেঁধে মাটিতে ফেলে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছে তাদের ওপর দিয়ে।'

ঈসা আজনবী থেমে যাওয়ায় নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে। নীরবে এগিয়ে চলল ওরা।

দুপুরে আরেকটা টিলার ওপর উঠল দু'জন। ওখানে ভীত ঘোড়াগুলো থেকে নামতে হলো ওদের। ঘোড়ার দড়ি ধরে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। টিলা থেকে সরু পায়ে চলা পথটা নেমে গেছে অনেক নীচে। পথের এক পাশে টিলার খাড়া দেয়াল, অন্য পাশে অন্তহীন খাদ। খাদটা অন্তত পাঁচ হাজার ফুট গভীর, আন্দাজ করল রানা। নীচে বয়ে চলেছে পাহাড়ি একটা উচ্ছল ঝর্না। ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে ছোট ছোট পাথর কিনারা পেরিয়ে খাদের মধ্যে পড়ছে।

বারবার ওর ভীত ঘোড়াটার নাকে হাত বুলাচ্ছে রানা, ওটাকে শান্ত করতে নিচু স্বরে কথা বলছে।

একটু পর ঈসা আজনবী বলল, 'আপনি ঘোড়ার মন বোঝেন।'

'আগেও কখনও কখনও ঘোড়া চালাতে হয়েছে আমাকে,' বলল রানা। 'শিখেছিলাম ব্রিটেনের বিখ্যাত এক ওস্তাদের কাছে।'

'ভাল শিখিয়েছে সে,' স্বীকৃতির সুরে বলল ঈসা। 'আমি শিখেছিলাম আমার ছোট চাচার কাছে। দু'পায়ে প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছিল, দু'বছর পড়ে ছিলেন। গত মাসে আমেরিকানদের মিসাইলের আঘাতে বিছানায় ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন তিনি।'

'আমি দুঃখিত,' এছাড়া বলার আর কিছু পেল না রানা।

সামনে পথটা হঠাৎ করেই চওড়া হয়ে গেছে। খাদের কিনারা থেকে সরে ফার গাছের পাশ দিয়ে সবুজ ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। একটু পর ঢাল আরও কমে আসায় ঈসা বলল, 'এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারব আমরা।'

এবার বেশ দ্রুত এগোতে পারল দু'জন। সূর্যটা যখন পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকাল, ততক্ষণে ঢাল পেরিয়ে হিন্দুকুশ পাহাড়ের পায়ের কাছে চলে এসেছে ওরা। সামনে তেকোনা

একটা উপত্যকা। উপত্যকায় ঘন হয়ে জন্মেছে গাছ, জঙ্গল তৈরি করেছে। রানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে ঈসা আজনবী। একটু পর অগভীর একটা চঞ্চল ঝর্না পার হলো ওরা। সামনে কাঠের গুঁড়ির তৈরি নিচু ছাদওয়ালা একটা কুটির দেখা গেল। ওটার সরু চিমনি থেকে এঁকেবেঁকে নীলচে ধোঁয়া উঠছে। কুটিরের পিছনে একটা ছাউনি। তলায় ক্লান্ত কয়েকটা ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে।

'এখানে চা খাব আমরা,' রানাকে বলল ঈসা। 'তারপর বিশ্রাম নেব।'

'সময় নষ্ট হবে তাতে,' বলল রানা। 'রাতে এগোলে ইউনূস মোসাদ্দেকের ওখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে।'

মাথা নাড়ল ঈসা। 'আমরা যে-পথে যাচ্ছি ওটা দিয়ে রাতে যাওয়া যাবে না, পাহাড় থেকে খাদে পড়ে মরতে হবে। চিন্তা করবেন না, ঠিকই সর্দার মোসাদ্দেকের কাছে পৌঁছে দেব আমি আপনাকে। ইনশাল্লাহ্।'

ছাউনির নীচে ঘোড়া থেকে নামল দু'জন, জিন খুলে ঘোড়াগুলোকে আচ্ছামতো দলাইমলাই করল, তারপর পানি খাওয়া হলে যব দিল গামলায়। সঙ্গে সঙ্গে ওতে মুখ ডোবাল ক্ষুধার্ত জন্তুগুলো।

'এখানেই অপেক্ষা করুন,' কুটিরের দরজার সামনে পৌঁছে রানাকে বলল ঈসা।

রানা দাঁড়ানোয় কুটিরের ভিতরে ঢুকল সে। তার গলার আওয়াজ শুনতে পেল রানা বাইরে থেকে। সম্ভাষণের পর নিজের পরিচয় দিল ঈসা, কেন এসেছে ব্যাখ্যা করল।

আলাপ সারল কয়েকজন নিচু গলায়, তারপর রানাকে ভিতরে আসতে ইশারা করল ঈসা আজনবী।

বাইরে থেকে দেখে যতটা নিচু মনে হয়, কুটিরের ছাদ তার চেয়েও নিচু। লম্বা-চওড়ায় ষোলো বাই বারো ফুটের বেশি হবে না কুটিরটা। মেঝেতে পুরোনো একটা কম্বল পাতা রয়েছে। ওটার

ছেঁড়া-ফাটা জায়গা দিয়ে নীচে পাথুরে জমিন দেখা যাচ্ছে। চুলোয় পাইনের শুকনো ডাল পুড়ছে, কুটিরের বাতাসে তার ঝাঁঝাল গন্ধ।

আগুনের সামনে বসে আছে ছয়জন আফগান, সন্দেহ নিয়ে তাকাল তারা রানার দিকে। আফগানদের পাঁচজন যুবক, বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। তবে শেষজন বয়স্ক, তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হলো সে-ই দলের নেতা। সব ক'জনের মাথায় আফগান পাগড়ি, পরনে রানা ও ঈসার মতোই ঢোলা শার্ট-পায়জামা। শুধু বয়স্ক আফগানের শার্টের ওপর উলের তৈরি একটা খাটো কোট।

চায়ের কাপ হাতে রানার দিকে বিচারকের দৃষ্টিতে তাকাল সে। অন্যরা যেন তার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। সবার হাত পাশে পড়ে থাকা প্রাচীন এনফিল্ড রাইফেলের স্টকে।

রানা লক্ষ করল, যুবক আফগানদের একজনের মুখের একপাশ পোড়া। বয়স্ক আফগানের ডান হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলটা ছাড়া আর কোনও আঙুল নেই।

'বিদেশিদের পছন্দ করে না আফগানরা,' পশতুতে বলল ঈসা। 'তবে আমি বলেছি আপনাকে বিশ্বাস করা যায়। আমেরিকানদের হাত থেকে বন্ধুকে উদ্ধার করতে এসেছেন আপনি।' একটু থামল সে। 'খাপ থেকে রাইফেল বের করবেন না।'

বসে পড়ল রানা, দরজার পাশে খাপ সহ রাইফেলটা নামিয়ে রাখল।

আফগানদের মুখোমুখি বসল ঈসা আজনবী, রানাকে বলল, 'এরা কান্দাহারের পুব সীমান্ত থেকে এসেছে, আমেরিকানদের সঙ্গে লড়াই করছে।' থলে খুলে চায়ের সরঞ্জাম বের করল সে, কেতলিতে পানি ভরে চাপিয়ে দিল ওটা আগুনের ওপর। 'তালেবানদের সঙ্গেও বিরোধ আছে এদের। জিহাদ করছে এরাও, তবে ধর্মান্ধ নয়। পাকিস্তানে গিয়েছিল দলের জন্যে রসদ কিনতে। এখন ফিরে চলেছে আবার নিজেদের আস্তানায়।'

'ইউনূস মোসাদ্দেকের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনাদের?' পশতুতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চিনি তাকে, দু'একবার দেখা হয়েছে,' জবাব দিল বয়স্ক আফগান। 'তবে একসঙ্গে লড়ছি না আমরা। ওর গোত্র আর আমার গোত্র আলাদা।'

ঈসার দিকে তাকাল রানা। 'এদিকে আসে না ন্যাটো ফোর্স বা আফগান সরকারী বাহিনী?'

'আসে,' জানাল ঈসা। 'মাঝে মাঝে।'

'তা হলে বাইরে কোনও পাহারাদার নেই কেন?'

জবাবটা বয়স্ক আফগান দিল, আড়ষ্ট গলায় বলল, 'হয়তো আছে, আপনি দেখেননি।'

অস্বস্তিকর নীরবতা নামল ঘরে। ঈসা কেতলিতে চায়ের পাতা দিল। সবার জন্যই চা করছে সে।

চায়ের পালা চুকবার পর এক আফগান যুবক নিচু গলায় গান ধরল। তার সঙ্গে গলা মেলাল বাকি চারজন। আস্তে আস্তে গলা চড়ছে তাদের। গানটা দেশাত্মবোধক নয়। প্রার্থনা-সঙ্গীত। কথাগুলো এরকম: 'হে আল্লাহ, আমাকে শহীদ হবার সাহস দাও। আমাকে সম্মানিত করো, যেন বেহেস্তে স্থান পেতে পারি। হে আল্লাহ, শত্রুর শেষ যেন করে যেতে পারি।'

অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল রানা, আফগান যোদ্ধাদের গলার আওয়াজ কুটিরের বাইরে যাচ্ছে। উপত্যকার নীরবতায় অনেকটা দূর থেকে শোনা যাবে এই গান। যদি বিপক্ষের কেউ আশপাশে থাকে তা হলে গানের কথাগুলো শুনে বুঝতে তার দেরি হবে না কোন্ পক্ষের লোক এরা।

'আমরা ছাউনিতে ঘুমাব,' ঈসাকে বলল ও। 'দু'জন অর্ধেক রাত করে পাহারায় থাকব।'

রানার চোখের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা ঝাঁকাল ঈসা আজনবী।

রাতটা নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। ভোরের সূর্য উঠবার আগেই বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল আফগান যোদ্ধা-দলটা। কান্দাহারের দিকে চলেছে তারা।

হালকা নাস্তা সেরে নিল রানা ও ঈসা, তারপর রওনা হলো ওরাও। একটানা এগিয়ে চলা, মাঝে মাঝে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে সামান্য সময়ের বিরতি। এক সময় সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। রোদের তেজ বাড়ছে ক্রমেই। মুখ তুলে তাকালে মনে হয় সরাসরি মাথার ওপর থেকে রোদ ঝরাচ্ছে চোখ ধাঁধানো সোনালী সূর্য। পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলময় একটা সমতলে পৌঁছে সামনে ঢেউ খেলানো নির্জন বিস্তৃতি দেখতে পেল রানা। ফার গাছ ওখানে জমি ছেড়ে দিয়েছে কাঁটাঝোপগুলোকে। ঘাসের চাপড়াগুলো কেমন পোড়া পোড়া, কোনওমতে টিকে আছে ধুলোময় শক্ত মাটিতে।

'একসময় পুরো জায়গাটা চাষের উর্বর জমি ছিল,' রানাকে বলল ঈসা। 'তারপর রাশিয়ানরা কেমিকেল ছড়িয়ে দিল, মারা গেল সব। আর কিছু জন্মাল না এখানে।'

পাহাড় থেকে নেমে বিরান এলাকাটার দিকে এগিয়ে চলল ওরা। অনেক দূরে কী যেন দেখিয়ে আঙুল তুলল ঈসা। চোখ কুঁচকে তাকাল রানা, তবে বুঝতে পারল না ঈসা ওকে কী দেখাতে চাইছে। তারপর ওর চোখে পড়ল জিনিসটা। দূরে আকাশের নীলচে রং ধূসর হয়ে যাচ্ছে। সাদা মেঘগুলোতে যেন দ্রুত হাতে কালি মাখিয়ে দিচ্ছে কেউ। মেঘের রাজ্য থেকে ঘন কালো কয়েকটা মোটা মোটা কলাম মোচড় খেয়ে নেমে এসে বারবার ছুঁয়ে দিচ্ছে জমি। বারবার জায়গা বদল করছে কলামগুলো, রাশি রাশি ধূলিকণা তুলে নিচ্ছে মেঘের দিকে।

'কালো বাতাস আসছে, জনাব,' রানাকে বলল ঈসা। 'আপনি তো আগেও আফগানিস্তানে এসেছেন, কখনও কালো বাতাস বইতে দেখেছেন?'

'না।'

রানাকে ইশারা করে ঘোড়া থেকে নামল ঈসা। 'থামতে হবে আমাদের। কালো বাতাস আসার আগেই তৈরি হতে হবে, নইলে শ্বাস আটকে মারা যাব দু'জনই।'

কী করতে হবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল ঈসা, রানার সঙ্গে হাত লাগাল কাজে। ঘোড়াগুলোর পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে ফেলল ওরা, জিন ও অস্ত্রের বাক্সগুলো নামিয়ে চারপাশে চৌকো একটা নিচু দেয়াল তৈরি করল দু'জন। এবার দেয়ালের ভিতর ঘোড়াগুলোকে বসাল ওরা। ওগুলোর ওপর দিয়ে কম্বল বিছিয়ে কম্বলের কোনাগুলো শক্ত করে বাঁধল জিন ও বাক্সগুলোর সঙ্গে। মাটি ছুঁই-ছুঁই একটা ছাউনি তৈরি হলো।

বাতাস শুরু হয়েছে এরইমধ্যে। ধূলিকণা উড়তে শুরু করেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে গম্ভীর একটা নিচু গর্জন। আওয়াজটা দ্রুত কাছে চলে আসছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে বাতাসের বেগ।

'আসুন!' তাগাদা দিল ঈসা।

তার দেখাদেখি কম্বলের তলায় ঢুকে ঘোড়াগুলোর মাঝখানে উপুড় হয়ে শুলো রানা, দু'হাত দু'পাশের ঘোড়া দুটোর ঘাড়ে চাপ দিয়ে রাখল। হাতের তালু চিৎ করে গায়ের জোরে কম্বল ধরে আছে দু'জন। টান দিয়ে কম্বল ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে দমকা বাতাস।

উড়ন্ত বালির কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রানার। খেয়াল করল, কম্বলের ভিতর দিয়ে আসা আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ঈসা গলা চড়িয়ে বলল, 'একসময় আফগানিস্তানকে ইয়াগিস্তান বলা হতো। মানে জানেন? বাঁধনহীন দেশ।'

'মানে?' বুঝতে পারল না রানা। জোরাল বাতাসের কারণে ঈসার কথা ঠিক মতো শুনতেও পাচ্ছে না।

'মানে মুক্ত দেশ,' চেঁচাল ঈসা আজনবী। 'এমন এক দেশ, যে-দেশে কোনও কিছুর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।' আরও কিছু বলল সে, কিন্তু তার গলা হারিয়ে গেল বাতাসের প্রচণ্ড গর্জনে।

হুঙ্কার ছেড়ে হিংস্র আক্রোশে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আফগানিস্তানের কুখ্যাত ঝড় – কালো বাতাস।

উন্মত্ত হাওয়ার একটানা গর্জনটা বোধহয় মানুষকে পাগল করে দিতে যথেষ্ট, তার ওপর বাতাসের তীব্র বেগ রাশি রাশি ধুলো ওড়াচ্ছে – ঠিক মতো শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। ঝড়টার মতিগতির কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, রানার দেহের ঊর্ধ্বাংশ মাটির সঙ্গে চেপে ধরছে বাতাস, একই সঙ্গে কোমরের নীচের অংশ হ্যাঁচকা টানে তুলে নিতে চাইছে ওপরে। প্রাণপণ শক্তিতে কম্বল ধরে আছে রানা, শ্বাস নেবার ফাঁকে ঘোড়াগুলোকে শান্ত রাখার জন্য কানে কানে কথা বলছে। উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাতে চাইলে জন্তুগুলোকে ঠেকানোর কোনও উপায় নেই ওদের। কম্বলের ওপর বালির পুরু আস্তরণ জমছে। বালির একটা ঢিবি তৈরি হচ্ছে ওদের ওপর। কম্বলের নীচে তাজা বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে রানা ও ঈসা আজনবী। মনে হচ্ছে শ্বাস আটকে মারা যাবে যে-কোনও সময়। রানার হাতের তলায় একটা ঘোড়া কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। জ্ঞান হারিয়েছে? ওটার দেহ ভয়ে কাঁপছে না আর।

ঝড় যেন চিরকাল চলবে। রানার কান বাতাসের একটানা প্রচণ্ড গর্জনে অভ্যস্ত হয়ে গেল। আওয়াজটা যখন থাকল না, তখনও রানা সচেতন ভাবে বুঝতে পারল না প্রথমে। কিছুক্ষণ পর খেয়াল করল ঘোড়াগুলোর শ্বাস নেবার ফোঁসফোঁস শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, শুনতে পাচ্ছে ওর ফুঁপিয়ে শ্বাস নেবার শব্দও। কানের ভিতর ভোঁ-ভোঁ একটা একটানা গুঞ্জন চলছে তো চলছেই।

আর শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। অক্সিজেনের অভাবে ফুসফুস জ্বলতে শুরু করল। কম্বল ছেড়ে দিল রানা। ওপরে জমে থাকা বালির কারণে সরানো যাচ্ছে না কম্বল। পিছু হটে কম্বলের তলা থেকে বের হতে চেষ্টা করল। পিঠের ওপর এত ওজন যে পিছাতে পারল না। আতঙ্কিত বোধ করল ও, উঠে বসতে চাইল। সম্ভব হলো না। অক্সিজেনের অভাবে মাথা বনবন করে ঘুরছে ওর,

সচেতনতা হারিয়ে যাচ্ছে। শরীরে যেন কোনও শক্তি নেই। মাটিতে দুই হাঁটু গেড়ে দু'হাত মাটিতে রাখল রানা, কোমরের জোরে কম্বল উঁচু করতে চাইল। একটুও নড়ল না কম্বল। ওটার ওপর বালির ঢিবিটার ওজন অনেক বেশি। আরও কয়েকবার চেষ্টা করল রানা। ব্যর্থ হতে হলো ওকে। ফুসফুসে আগুন জ্বলছে। মাথাটা বোধহয় ছিঁড়ে পড়বে ব্যথায়। টের পেল, চেতনা হারাচ্ছে ও। ঘোড়াগুলোর শ্বাসের শব্দ কমে আসছে, থরথর করে কাঁপছে ওগুলো।

ঘুমিয়ে পড়লে খুব ভাল হতো না? ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারল রানা। কোমরের কাছে হাত ড়াচ্ছে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে শার্টটা ওপরে তুলছে। এক মিনিট হলো শ্বাস আটকে রেখেছে ও। শ্বাস নিলে কার্বন-ডাই অক্সাইড ওকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেবে। সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে কমান্ডো নাইফটা খাপ থেকে বের করতে চেষ্টা করছে ও। কম্বলটা কেটে ফেলতে হবে। দ্রুত। নইলে শ্বাস আটকে মারা যাবে ও।

এই তো খাপ থেকে খানিকটা বেরিয়েছে ওটার ফলা!

আরেকটু!

টান দাও, রানা!

হ্যাঁ, এবার ওটার ফলা কম্বলের ভেতরে ঢুকিয়ে চিরে দাও কম্বলটা।

ঝরঝর করে বালি পড়তে শুরু করল ওর পিঠে। কানে, নাকে, চোখে ঢুকে যাচ্ছে বালি। পড়ছে তো পড়ছেই। দু'হাতে মুঠো মুঠো বালি বুকের তলায় জমাতে শুরু করল ও, একই সঙ্গে হাঁটুর জোরে উঠে বসতে চেষ্টা করছে। পিঠ দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে কম্বলের গায়ে। আর পারছে না ফুসফুস। সমস্ত ইচ্ছেশক্তি এক করেও নিজেকে সামলাতে পারল না রানা, বালির মধ্যে নাক গুঁজে আছে ওর, শ্বাস টানল। প্রচণ্ড কাশির দমকে ঝটকা খেল ওর দেহ, ফড়াৎ করে আরও খানিকটা ছিঁড়ে গেল চেরা কম্বল। বালির

ঝর্না নামল ওর শরীরে। সূর্যের প্রখর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিল ও, কাশতে কাশতে ফুসফুস থেকে বালি বের করতে চেষ্টা করল। অদম্য খিঁচুনিতে উবু হয়ে গেল ওর শরীর, বমি করতে শুরু করল ও। তারই ফাঁকে বুঝতে পারল, তিন ফুট উঁচু বালির একটা ঢিবির নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে ও। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ঈসা আজনবী ও ঘোড়াগুলোর কথা। ওরা এখনও বালির ঢিবির তলায় চাপা পড়ে আছে।

বসে পড়ে ঢিবি থেকে পাগলের মতো বালি সরাতে শুরু করল রানা। ওর হাত দুটো যন্ত্রের মতো নিয়মিত ছন্দে চলছে। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে আছে ও, বালি তুলে নিয়ে পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ওর মনে হলো অনন্তকাল পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে আধ মিনিটের মাথায় কম্বলটা দেখতে পেল ও। এক টানে কম্বল আরও ছিঁড়ে ফেলল রানা, টান দিয়ে তুলতে চেষ্টা করল ওটা বালির তলা থেকে। কম্বলের ফাটলটা বাড়ল আরও, একটা ঘোড়ার মুখ দেখতে পেল ও। বাম পাশে সরে আবার টান দিল কম্বলে, ছিঁড়ে তুলে আনল ওটা। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ঈসা আজনবী। নড়ছে না এক তিল। তার নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল রানা। শ্বাস নিচ্ছে না আফগান গাইড।

ঈসা আজনবীর বগলের তলায় দু'হাত ভরে টেনে সরাল রানা। আরেকটা ঘোড়ার পিছনের অংশ বেরিয়ে এলো বালি সরে যাওয়ায়। সেদিকে খেয়াল না দিয়ে ঈসা আজনবীকে ঢিবির কাছ থেকে সরিয়ে এনে উপুড় করে শোয়াল ও, পিঠে দু'হাত রেখে গায়ের জোরে পাম্প করতে শুরু করল। ফুসফুসটা চালু না হলে মারা যাবে লোকটা। নাকি মারাই গেছে? নিজেকে পাগল মনে হচ্ছে রানার। চট্ করে একবার ঈসা আজনবীর মুখ খুলে দেখে নিল ভিতরে বালি ঢুকে গেছে কি না। ঢোকেনি। কৃত্রিম শ্বাস দিতে শুরু করল ও ঈসা আজনবীকে। জোরে ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে দিচ্ছে লোকটার গলায়।

বেশ কয়েকবার ওরকম করার পর খকখক করে কেশে উঠল আফগান, চোখ মেলল, কিন্তু দৃষ্টি দেখে মনে হলো না কিছু দেখছে সে। বুকটা আবার নিয়মিত ওঠানামা শুরু করেছে তার। কাশছে, কিন্তু শ্বাসও নিচ্ছে।

ঢিবির কাছে ফিরে এলো রানা, বালি সরাতে শুরু করল আবার। একটা ঘোড়ার মুখ বের হয়েছিল দেখেছে ও, এখন বাকিগুলোকে বালির তলা থেকে বের করতে হবে। একটা একটা করে চারটা ঘোড়াই বালির তলা থেকে বের করল ও, সময় লাগল প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো।

কম্বলটার কারণে নাকে বালি ঢুকে মরেনি ঘোড়াগুলো। দুটো ঘোড়ার নাক অল্প অল্প কাঁপছে। বাকি দুটো পড়ে আছে নিথর। শ্বাস নিতে না পেরে মরেছে ওগুলো। ঢিবিটা ঘোড়াগুলোর ওপর থেকে সরিয়ে ধপ করে এক পাশে আধশোয়া হলো রানা। প্রচণ্ড উত্তেজনা ও পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। কাঁকর মেশানো কর্কশ বালি সরানোয় হাতের তালু কেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে ওর। তবে কাটা জায়গার জ্বলুনিও এখন স্রষ্টার আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছে।

পাশেই ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে ঈসা আজনবী, তবে কাশি বন্ধ হয়েছে তার।

ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাল রানা। দুটো ঘোড়া মারা গেছে। অন্য দুটো উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেও পড়ে যাচ্ছে বারবার। কাত হয়ে গর্তের ভিতর থেকে পানির একটা মশক তুলে নিল রানা, ওটা উপুড় করে অসুস্থ ঘোড়া দুটোকে ধীরে ধীরে পানি খাওয়াল। লোভীর মতো জিভ দিয়ে ভেজা ঠোঁট চাটছে জন্তুগুলো। রাশ ধরে ওগুলোকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করল। উঠতে চাইল না একটাও। কপাল থেকে ঘাম মুছে আবারও চেষ্টা করল রানা। মনে মনে ভাবছে, যদি উঠতে না চায় সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু যদি সত্যিই ওঠার ক্ষমতা না থাকে? ঘোড়া না থাকলে ওদের পক্ষে

সামনের দুস্তর পথ পাড়ি দেয়া কি সম্ভব হবে?

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ঈসার ঘোড়াটা। বসে থেকে সঙ্গীকে উঠতে দেখল অন্যটা, তারপর হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল ওটাও। থলে থেকে স্টিলের একটা বাসন বের করে বাসনে খানিকটা পানি ঢালল রানা, একটা একটা করে ঘোড়া দুটোকে আবার পানি দিল। ও জানে, বেশি পানি দেয়া যাবে না এখন, তা হলে তৃষ্ণার্ত জন্তুগুলো অসুস্থ হয়ে পড়বে।

পানি খাওয়ানো শেষে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিল ও, তারপর উঠে পড়ল। আরেকটা কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন চাপাতে হবে। তার আগে ঈসাকে পানি খাওয়ানো দরকার। মশকটা নিয়ে ঈসা আজনবীর পাশে বসে পড়ল ও।

ওর হাত থেকে মশক নিয়ে গলায় পানি ঢালল ঈসা। ঢকঢক করে বেশ খানিকটা পানি গিলে বলল, 'আল্লাহ্ দয়াময়।' কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল রানার দিকে। 'আপনি আল্লার উসিলা, তাই আপনাকেও ধন্যবাদ, আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে।'

'আমরা কি রওনা হবো?' ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল ঈসা আজনবী। 'এখন না। কাল ভোরে আবার এগোব। ঘোড়াগুলোকে ধকলটা সামলে নিতে সময় দিতে হবে।'

চার

দিকচক্রবালে ভোরের প্রথম আলোর রেখা দেখা দিতেই আবার রওনা হলো ওরা। শেষ রাতে নাস্তা সেরে নিয়েছে দু'জন, তারপর অস্ত্র ও গোলাবারুদের বাক্সগুলো বালি চাপা দিয়েছে। বড় একটা

পাথর গড়িয়ে এনে চিহ্ন রেখেছে ঈসা আজনবী, তারপর চিন্তিত চেহারায় বলেছে, 'আমরা ফেরার আগেই যদি আবার একটা কালো বাতাস আসে, তা হলে পাথরটা বালির নীচে তলিয়ে যাবে, জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যাবে না আর।'

গত রাতটার কথা ভেবে অসহিষ্ণু বোধ করছে রানা। মন থেকে শঙ্কা তাড়াতে অটোসাজেশনের আশ্রয় নিতে হলো ওকে।

মাঝরাতে স্বপ্ন দেখেছে ও, খুব অত্যাচার করে ধীরে ধীরে খুন করা হচ্ছে মারাত্মক আহত সোহেলকে। মরে যাবার আগে অনেক চেষ্টা করে ঘোলা চোখ দুটো মেলল সোহেল, ওর চোখে তাকাল শেষবারের মতো, তারপর সমস্ত কষ্ট সয়ে ম্লান হেসে অতি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'তুইও পারলি না, দোস্ত!' তারপরই মাথাটা কাত হয়ে একপাশে হেলে পড়ল সোহেলের।

ঘুম থেকে চিৎকার করে উঠে বসেছিল রানা, খানিকক্ষণ বুঝতে পারেনি ওটা স্বপ্ন ছিল। তারপর ঈসা আজনবীর উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে ঢোক গিলে শুকনো স্বরে জানিয়েছে, আসলে কিছু হয়নি, দুঃস্বপ্ন দেখেছে। ঈসা ঘুমাবার পর একটানা ঘুমাতে পারেনি ও মেডিটেশন করেও, বাকি রাত ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠতে হয়েছে।

লাল চোখে সামনের জমিন দেখল রানা। এলাকাটা দেখলে বোঝা যায়, এখানে যুদ্ধ হয়েছে। এখানে ওখানে বোমা বিস্ফোরণের বড় বড় গর্ত, পাথরগুলোর কিনারা পুড়ে কুঁচকে কালচে হয়ে আছে। গরু-বাছুরের কঙ্কাল পড়ে আছে জায়গায় জায়গায়। সোভিয়েতদের বেশ কিছু পোড়া ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারের খোলস দেখল রানা। আমেরিকানদের গোটা কয়েক বিধ্বস্ত ট্রাক ও হাফ-ট্রাকও দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে।

এক সময় শেষ হলো এবড়োখেবড়ো বিস্তৃতি, রুক্ষ প্রান্তরের শেষ সীমানায় চলে এলো ওরা। সামনে আবার পাথুরে টিলার

সারি। একটা জিনিস নজর কাড়ল রানার। আগে কখনও জিনিসটা দেখেনি ও। কাছ থেকে দেখতে ঘোড়া থামিয়ে নামল, ঘোড়ার রশি ধরে পায়ে হেঁটে এগোল গজ দশেক। পাথুরে ঢালে ছড়িয়ে পড়ে আছে শত শত ছোট সবুজ খেলনা, দেখতে ঠিক বাচ্চাদের লাটিমের মতো। একটা তুলে নিতে উবু হলো রানা, ঠিক তখনই ঈসা আজনবী চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরবেন না, জনাব!'

ঈসার গলায় স্পষ্ট নিষেধ, সতর্ক করার সুর, ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে সে-ও।

খেলনাটার কাছাকাছি স্থির হয়ে গেল রানার হাত।

এগিয়ে এসে সাবধানে জিনিসটা তুলে নিল ঈসা, ভাব দেখে মনে হলো ফণাতোলা বিষাক্ত সাপের মাথা ধরেছে, তারপর ছুঁড়ে দিল ওটা পিছনে, বিশ ফুট দূরে। মাটিতে পড়েই বিস্ফোরিত হলো লাটিম, আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল, যেখানে পড়েছে তার চারপাশে পাঁচ ফুট জায়গায় যত পাথর ছিল সব ছিটকে গেল।

ভীত ঘোড়াটার রাশ ধরে রাখল বিস্মিত রানা।

ঈসা বলল, 'বাচ্চাদের জন্যে এগুলো ফেলে রেখেছিল সোভিয়েতরা, যাতে বড় হয়ে মুজাহেদিন হতে পারার আগেই পঙ্গু হয়ে যায় ওরা। রংটা খেয়াল করেছেন? সবুজ। ইসলামের রং। বাচ্চারা সরল বিশ্বাসে লাটিম মনে করে খেলতে চাইত ওগুলো নিয়ে। অমনি ধিড়িম। হাত-পা ছিঁড়ে খসে যেত বিস্ফোরণে। আর আফগানিস্তানে গুরুতর আহত হওয়া মানেই চিকিৎসার অভাবে ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরা। আমেরিকানরা কারযাই সরকারকে কথা দিয়েছিল এগুলো সরানোর ব্যবস্থা নেবে, কিন্তু এদিকের গোত্রগুলো কারযাই সরকারকে মেনে নিয়ে আমেরিকানদের সহায়তা করছে না বলে বোমাগুলো সরায়নি তারা।'

ক্ষণিকের জন্য শীতল রাগ ও বিতৃষ্ণা অনুভব করল রানা। বিরূপ অনুভূতিটা শুধু সোভিয়েতদের প্রতি নয়, গোটা শ্বেতাঙ্গ জাতটার প্রতি। যদিও জানে, মানুষ অন্তরের দিক থেকে সবাই

এক, রং তাদের যেমনই হোক।

'আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন,' বলল ঈসা, 'এখন আমি আপনাকে বাঁচালাম।'

'আরেকটা উপকার করতে পারেন আপনি আমার,' বলল রানা। 'ইউনূস মোসাদ্দেকের গোত্র যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে সেটা শেখাতে পারেন আমাকে। জানি অল্প সময়ে বেশি কিছু শিখতে পারব না, তবে সামান্য বলতে পারলেও বোধহয় সুবিধে পাব।'

'আমি নিজেই তো তাদের ভাষা খুব অল্প জানি,' বিনয় করে বলল ঈসা আজনবী। 'আফগানিস্তানে দশটা প্রধান উপজাতি, আটটা প্রধান ভাষা, বত্রিশটা আঞ্চলিক ভাষা, এছাড়া ছোট ছোট গোত্র যে কতগুলো তা আমিও জানি না। একটার সঙ্গে আরেকটা ভাষায় মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। পশতু আর দারিই এখানে বেশি ব্যবহার হয়।'

ঝড়ের সময় বলা ঈসার কথাটা মনে পড়ল রানার। আফগানিস্তান এমন এক দেশ, যে-দেশে কোনও কিছুর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

'পশতু আপনি জানেন,' বলল ঈসা। 'দারি জানেন?'

জবাব দেয়া হলো না রানার। ধিক্‌ধিক্‌ধিক্‌ধিক্‌ গম্ভীর আওয়াজটা দূর থেকে কাছে চলে আসছে। আরেকটা ঝড়? না। ঝড়ের চেয়ে অনেক খারাপ – আমেরিকান হেলিকপ্টার গানশিপ। বাঁ পাশের একটা টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এমআই-৩৫ গানশিপ দুটো, নিষ্প্রাণ বিস্তৃতির ওপর দিয়ে দ্রুত ধেয়ে আসছে, আকারে বড় হচ্ছে ক্রমেই।

ঈসার দেখাদেখি ঘোড়ার দড়ি ধরে বিরাট কয়েকটা পাথরখণ্ডের মাঝখানে চলে এলো রানা, আড়াল থেকে তাকাল যন্ত্রদানবগুলোর দিকে।

'ওরা বোধহয় আমাদের দেখে ফেলেছে,' বেসুরো শোনাল

চিন্তিত ঈসা আজনবীর গলা।

গ্রেনেড লঞ্চার লাগানো রাইফেলটার খাপে চেপে বসল রানার হাত।

চারশো গজ সামনের একটা উঁচু টিলার দিকে ছুটে যাচ্ছে হেলিকপ্টার গানশিপ দুটো। না, বোল্ডারের দিকে এলো না, টিলা পেরিয়ে চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইঞ্জিনের আওয়াজে মনে হলো শূন্যে স্থির হচ্ছে। পাঁচ সেকেন্ড পর কয়েকটা মেশিনগানের সম্মিলিত কর্কশ আওযাজ শুনতে পেল ওরা। হাজার হাজার বুলেট ছুটে যাচ্ছে টার্গেট লক্ষ্য করে।

কাদের ওপর হামলা হচ্ছে দেখতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে সামনের ওই টিলার দিকে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল রানা। পেছন থেকে ঈসা আজনবীর উদ্বিগ্ন গলা শুনতে পেল: 'যাবেন না, জনাব!'

না থেমে ঘোড়া নিয়ে টিলার কাঁধে চড়ল রানা, উঠে এলো টিলার মাথায়। খানিকটা এগোলেই প্রায় খাড়া নেমে গেছে ঢাল, তার আগে ঘোড়া থামিয়ে কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ও। নীচের উপত্যকায় আগে কখনও হামলা হয়েছে বলে মনে হলো না ওর। সবুজ ফসল দুলছে মৃদু বাতাসে, মনে হয় যেন গভীর সাগরের মৃদুমন্দ ঢেউ। উর্বরা চাষের জমির মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে সরু একটা খাল। খালের ওপারে টিলার গোড়ায় শুকনো কাদা দিয়ে তৈরি বেশ কিছু কুটির দেখতে পেল, সংখ্যায় পঞ্চাশটার কম হবে না। ওগুলোর পর শুরু হয়েছে টিলা, উঠে গেছে চূড়ায় সাদা বরফ নিয়ে আকাশে মাথা তোলা গম্ভীর, স্তব্ধ পাহাড়ের দিকে। কুটিরগুলোই হেলিকপ্টার গানশিপ দুটোর লক্ষ্য। দূর থেকে মেশিনগানের বুলেট, কামানের গোলা, রকেট ও মিসাইল ছুঁড়ছে গানশিপগুলো ছোট্ট গ্রামটার দিকে।

রানা টিলার ওপর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে গ্রামের বাড়ি-ঘর শ' খানেক গজ নীচে। ভীত আফগানদের

ছুটোছুটি স্পষ্ট দেখতে পেল রানা। বোরকা পরা মহিলারা বাচ্চাদের কোলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসছে কুটিরগুলো থেকে। পুরুষরা তাদের প্রাচীন বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল দিয়ে গুলি ছুঁড়ছে গানশিপগুলোকে লক্ষ্য করে। কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারছে না তারা। রানা স্পষ্ট বুঝল, এরা তালেবান নয়, তালেবান হলে এদের কাছে আধুনিক অস্ত্র থাকত।

এমআই-৩৫ গানশিপগুলো যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে, রাইফেলের বুলেট যদি ওগুলোর আর্মারের দুর্বল কোনও জায়গায় আঘাতও হানে, রং চটে যাওয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হবে না।

কুটিরগুলোর শুকনো কাদার তৈরি দেয়াল মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। রকেট ও মিসাইলগুলোর বিস্ফোরণ আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে দেয়ালে। তিনজন মহিলা তাদের শিশু সহ একটা কুটিরে পড়িমরি করে আশ্রয় নিল, পরমুহূর্তে গোটা কুটির রকেট বিস্ফোরণে ধুলোয় মিশে গেল। বড় একটা পাথরের তৈরি চৌবাচ্চার আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়ছিল কয়েকজন পুরুষ, মিসাইলের আঘাতে রক্ত-মাংসের লালচে কুয়াশায় পরিণত হলো তারা।

এমআই-৩৫-এর উইং থেকে আরও রকেট ছুটে যাচ্ছে নীচের গ্রামের দিকে। মেশিনগানের নলগুলো কমলা-লাল আগুন ওগরাচ্ছে। ঝাঁঝরা কুটিরগুলো ধসে পড়ছে অজস্র বুলেটের আঘাতে। চোখের সামনে আট-দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলের মাথা রকেট বিস্ফোরণে উড়ে যেতে দেখল রানা। মাথাহীন ছোট্ট রক্তাক্ত দেহটা ভাঙাচোরা পুতুলের মতো পড়ে থাকল একটা ধসে পড়া বাড়ির উঠানে।

বুকের ভিতর কী যেন দলা পাকিয়ে উঠছে বলে মনে হলো রানার। যন্ত্রের মতো ঘুরে দাঁড়াল ও, ঘোড়ার কাছে ফিরে রাইফেলটার খাপ নামাল জিন থেকে, দ্রুত হাতে বের করল রাইফেল।

ঘোড়া ছুটিয়ে টিলার ওপর উঠে এলো ঈসা আজনবী। চিৎকার করছে সে: 'সরে আসুন, জনাব! খুন হয়ে যাবেন! সরে আসুন!'

তার সতর্কবাণীতে কোনও ভাবান্তর হলো না রানার, ও যেন একটা নেশার ঘোরে আছে। শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটছে যেন রক্ত। বাক্স খুলে কয়েকটা ৪০ এমএম গ্রেনেড বের করল ও, একটা গ্রেনেড ভরল গ্রেনেড লঞ্চারে, বাকিগুলো বুক পকেটে রেখে আবার এসে দাঁড়াল টিলার কিনারায়। ওর চোখের সামনে এনফিল্ড রাইফেলধারী পাঁচ আফগান দু'টুকরো হয়ে গেল মেশিনগানের বুলেটে। মৃতা এক মহিলার কোল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল হতচকিত একটা বাচ্চা মেয়ে। ওর পিছনে বালিতে গর্ত তৈরি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে মেশিনগানের গুলি। গ্রামের ধ্বংসস্তূপ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে ফসলের মাঠের মাঝ দিয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে ছুটল মেয়েটা। তাকে অনুসরণ করল একটা গানশিপ, নাক তাক করছে মেয়েটার দিকে, মনে হলো ডাইভ দেবে।

রানা যেখানে আছে সেখান থেকে গ্রাম অন্তত একশো গজ নীচে হলেও হেলিকপ্টার গানশিপগুলো বড় জোর দেড়শো ফুট দূরে, সামান্য নীচে। বাম পা একটা দু' ফুট উঁচু পাথরের ওপর তুলে দিল রানা, ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর বাম কনুই রাখল, যাতে হাতটা স্থির থাকে, এবার রাইফেলের সাইটে চোখ রাখল। লক্ষ্যস্থির হয়ে যেতেই শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ওর, সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল টার্গেটের ওপর।

বাচ্চা মেয়েটা টিলার গোড়ায় গাছের সারির কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার পেছনে। তার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে দানবীয় কপ্টার, সেই সঙ্গে পথ থেকে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে এগিয়ে যাচ্ছে মেশিনগানের গুলির তৈরি সরু একটা রেখা। গানশিপের দূরত্ব রানার কাছ থেকে এখন অন্তত পৌনে

দুশো ফুট। তবে নীচে আছে ওটা। তার মানে এখনও রেঞ্জের বাইরে চলে যায়নি।

আস্তে করে ট্রিগার স্পর্শ করল রানা। ভোঁতা একটা গর্জন ছাড়ল গ্রেনেড লঞ্চার। কাঁধের পেশীতে জোর রিকয়েল সহ্য করল রানা নীরবে, ওর চোখ টার্গেটের ওপর থেকে সরল না।

চার ইঞ্চি লম্বা প্রোজেক্টাইলটা পাশ থেকে গানশিপের নাকের ভিতর ঢুকে পড়ল। চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল প্লেক্সিগ্লাসের উইন্ডশিল্ড। গোটা কপ্টারটা আগুনের একটা গোলকে পরিণত হবার আধ সেকেন্ড আগে বিস্ফোরিত হলো ককপিট। দু'তিনটা রকেট ও মিসাইল বিস্ফোরিত হওয়ায় প্রচণ্ড কয়েকটা আওয়াজ হলো। তিন সেকেন্ড বাতাসে ঝুলে থাকল বিধ্বস্ত কপ্টার, তারপর লেজ, উইং ও রোটর হাজারো টুকরো হয়ে নীচে খসে পড়তে শুরু করল। ফসলের খেতের ভিতর পড়ছে ভাঙাচোরা ধাতব অংশ। কপ্টারের পোড়া শরীরটা এখনও আস্ত আছে, কর্কশ আওয়াজ করে শক্ত জমিতে পড়ল ওটা আশি গজ ওপর থেকে, পরমুহূর্তে আবারও বিস্ফোরিত হলো।

বাচ্চা মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। মেয়েটা বুঝেছে গানশিপটাকে কোত্থেকে আঘাত করা হয়েছে। রানা যে-টিলার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে একবার তাকিয়ে এক ছুটে জঙ্গলের ভিতর হারিয়ে গেল সে।

রানার ফুট বিশেক নীচে টিলার গায়ে জোরাল একটা বিস্ফোরণ ঘটল। শকওয়েভের আঘাতে ভারসাম্য হারিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে পাথরের ওপর দড়াম করে পড়ে গেল রানা। ওর চারপাশে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখল। আরেকটা বিস্ফোরণ গোটা টিলা থরথর করে কাঁপিয়ে দিল। দ্বিতীয় গানশিপটা সঙ্গীর পরিণতি দেখেছে, নাক ঘুরিয়ে নিয়ে রকেট ও মিসাইল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এদিকের টিলার দিকে তেড়ে আসছে ওটা এখন। রানাকে গ্রেনেড লঞ্চার তাক করতে দেখে ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছিল ঈসা

আজনবী, আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটতেই জন্তুটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটল সে। টিলার ঢালে নাক গুঁজল পঞ্চম মিসাইল, বিরাট একটা গর্ত তৈরি করল পাথরে।

চারপাশ এতো জোরে কেঁপে উঠল যে ঈসা আজনবীর ঘোড়াটা ভয়ে উন্মত্ত হয়ে গেল। রাশ টেনে ওটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল আফগান। কোনও কাজ হলো না, টিলায় উঠবার আগে রানা ও ঈসা যে-বোল্ডারগুলোর আড়ালে থেমেছিল, সেদিকে ছুটল ঘোড়াটা, তারপর হোঁচট খেয়ে দিক বদলাল, সামনের দু'পা তুলে দিল শূন্যে। জিনে টিকে থাকতে পারল না ঈসা আজনবী, ধুপ করে পড়ে গেল পাথুরে টিলার ওপর।

টিলার ওপরের অংশ থেকে ধুলোর মেঘ ওড়াচ্ছে মেশিনগানের বুলেট, শক্ত পাথরে লেগে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছে নানাদিকে। শরীরটাকে গড়িয়ে দিল রানা, ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল ওর দেহের নীচে মাটি না পেয়ে। নিজেকে ওজনশূন্য মনে হলো ওর, মনে হলো কিনারা পেরিয়ে টিলা থেকে পড়ে যাচ্ছে, তারপর পিঠ দিয়ে একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর পড়ল ও। পিঠের আঘাতটা ওর শ্বাস আটকে দিল। তারই মাঝে আবছা ভাবে বুঝতে পারল, একটা শুকনো, অগভীর নালায় পড়েছে ও। নালার কিনারা থেকে পাথরের চল্টা ওঠাচ্ছে অসংখ্য বুলেট। আরেকটা বিস্ফোরণে গোটা টিলা যেন লাফ দিল। রাইফেলটা এখনও হাত থেকে ছাড়েনি, রানা দেখল, ধুলোর মেঘ আর কালো ধোঁয়া ঘিরে ফেলছে ওকে।

গুলি, রকেট ও মিসাইল বিস্ফোরণের আওয়াজ থেমে গেল। হেলিকপ্টার গানশিপের ইঞ্জিনের একটানা, ভারী আওয়াজটা ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে। অপেক্ষা করছে ওটা, ধোঁয়া-ধুলো সরে গেলেই ক্রুরা দেখতে পাবে শত্রুর অবস্থান। এখনও যদি বেঁচে থাকে তা হলে খতম করে দেবে।

রানার কান ভোঁ-ভোঁ করছে, জ্বলছে কপাল, বোধহয় কেটে

গেছে। ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিল ও, যন্ত্রের মতো চলছে ওর হাত, আবার গ্রেনেড লঞ্চারে আরেকটা ৪০ এমএম গ্রেনেড লোড করল, ক্রল করে এগোল নালার কিনারার দিকে। চারপাশ ধুলো ও ধোঁয়ায় ঢেকে আছে। পোড়া করডাইটের জোরাল কটু গন্ধে নাক কুঁচকে উঠল ওর। আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে গানশিপটা, ফুট পঞ্চাশেক দূরে টিলার সমান্তরাল উচ্চতায় ভাসছে। এতো কাছ থেকে বিশাল আর আতঙ্কজনক লাগছে দানবীয় ফড়িংটাকে দেখতে। বাতাসে ভেসে গেল ধোঁয়ার স্তর, এবার ওটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, উঠে দাঁড়াল। ওটার পাইলটও একই মুহূর্তে দেখল ওকে। সোজা হয়ে বসল সে ঠিক তখনই ট্রিগার স্পর্শ করল রানার তর্জনী। এবার আর কী ঘটে দেখার জন্য অপেক্ষা করল না ও, দ্রুত পিছু হটে নেমে শুয়ে পড়ল নালার খাদে, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে।

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল গানশিপ, বিস্ফোরণটা দেখল না রানা, তবে আওয়াজটা পেল, সেই সঙ্গে শকওয়েভের ধাক্কা ও গরম বাতাস অনুভব করল। নালার ওপর ঝরে পড়তে শুরু করল ধাতব টুকরো-টাকরা। একটা বিচ্ছিন্ন মোচড়ানো রোটর ব্লেড নালার ওপর এসে পড়ল, তারপর তীব্র গতিতে পাক খেয়ে চলে গেল আরেকদিকে। খাদের মধ্যে না থাকলে দু'টুকরো হয়ে যেত রানা। প্রচণ্ড কয়েকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো এবার। চারপাশ আবারও কেঁপে উঠল শকওয়েভের ধাক্কায়, তারপর টিলার পায়ের কাছে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল বিধ্বস্ত কপ্টার। টিলার ওপরের কিনারা চেটে দিয়ে গেল হলদে আগুনের হলকা।

কয়েক সেকেন্ড পর ক্লান্ত শরীরটা টেনে নালার ভিতর থেকে উঠল রানা, টিলার কিনারায় থামল, নীচে নামার একটা পথ খুঁজছে। টিলার গোড়ায় বিধ্বস্ত, ছিন্নভিন্ন কপ্টারের টুকরোগুলো আগুনে পুড়ছে এখনও। খানিকটা দূরে সরু একটা কার্নিশ দেখে সেদিকে পা বাড়াল রানা, ওদিক দিয়ে নীচে নামবে। কিন্তু

উত্তেজনা কেটে যাওয়ায় হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে ওর এই মুহূর্তে বিশ্রাম না নিলেই নয়।

গ্রামটা একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় না খানিক আগেও শান্ত একটা বসতি ছিল ওটা। গাছের সারির দিকে তাকাল রানা, ওখানেই জঙ্গলে ঢুকেছে বাচ্চা মেয়েটা। ঘাড় ফেরাল ঈসা আজনবীর খোঁজে। কোথাও নেই আফগান। দূরে দেখতে পেল তার ঘোড়াটাকে, আরোহী ছাড়াই ছুটে চলেছে টিলার ওপর দিয়ে। তারপর কয়েকটা বড় পাথরখণ্ডের মধ্য থেকে ঈসাকে উঠে দাঁড়াতে দেখল ও। দু'হাতে মাথার পিছনটা চেপে ধরে রেখেছে লোকটা। সিদ্ধান্ত বদলে সেদিকে এগোল রানা। খানিকটা দূরে নিজের ঘোড়াটাকে কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল। মারা গেছে ওটা। পেটে বিরাট একটা গর্ত, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে।

ঈসা আজনবীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, বেসুরো শোনাল ওর কণ্ঠ: 'আহত হয়েছেন?'

'ঘোড়া থেকে পড়ে মাথায় লেগেছে,' মুখ বিকৃত করল ঈসা আজনবী। মাথা ঘুরে ওঠায় আস্তে করে বসে পড়ল আবার।

তার মাথা থেকে পাগড়ীটা খুলে করোটি পরীক্ষা করল রানা, কোনও রক্ত দেখতে পেল না, তবে মাথার পিছনে বড়সড় একটা আলু গজিয়েছে। আফগানের চোখের সামনে দুটো আঙুল তুলল রানা। 'কয়টা আঙুল দেখতে পাচ্ছেন?'

'দুটো।'

'তা হলে শক পাননি,' বলল রানা। 'আপনার পাগড়ীটা বাঁচিয়ে দিয়েছে জোর আঘাত পাওয়া থেকে।'

আপত্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল ঈসা আজনবী। 'আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন। তিনিই পাগড়ীটা খুলে যেতে দেননি।'

কথা বাড়াল না রানা, রাইফেলটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করতে পারবেন এখানে? গ্রামে হয়তো

এখনও কেউ বেঁচে আছে, আহতদের ফার্স্ট এইড দিতে পারব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল ঈসা। 'যান, আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে থাকুন।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে টিলার কিনারায় চলে এলো রানা, সেই কার্নিশটা বেয়ে নামতে শুরু করল।

বাড়ি-ঘর বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখানে ওখানে শুধু এখনও দাঁড়িয়ে আছে দু'একটা ভাঙাচোরা দেয়াল। ছড়িয়ে পড়ে আছে অসহায় আফগান নারী-পুরুষের লাশ। কারও মাথা উড়ে গেছে, কারও বা হাত-পা। পুড়ে মরেছে কেউ কেউ। বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে অনেকে, মারা গেছে দেয়াল চাপা পড়ে। চারপাশে রক্তের ছোট ছোট পুকুর। এরইমধ্যে মাছির দল এসে হাজির হয়েছে তাজা রক্তের গন্ধে, আকাশে দেখা দিয়েছে শকুনের পাল, ঘুরে ঘুরে নামতে শুরু করেছে কুৎসিত পাখিগুলো।

একটা গোঙানি শুনে ধসে পড়া একটা দেয়ালের কাছে ছুটে গেল রানা। দেয়ালের নীচে অর্ধেক চাপা পড়ে আছে এক অশীতিপর বৃদ্ধ, কপালের অর্ধেকটা অংশ উড়ে গেছে তার বুলেটের আঘাতে, মগজ দেখা যাচ্ছে। রানা তার হাতটা ধরতেই কাত হয়ে এক পাশে ঢলে পড়ল বৃদ্ধের মাথা। মারা গেছে।

খানিকটা পিছন থেকে পাথর গড়ানোর আওয়াজ পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল রানা। ফুট তিরিশেক দূরে কাদামাটির একটা স্তূপের পিছনে লুকাল ছোট্ট একটা মুখ। ওদিকে পা বাড়াল রানা, কাদামাটির স্তূপটার কাছাকাছি গিয়ে মেয়েটাকে দেখতে পেল, ছুটছে মেয়েটা, উড়ে চলেছে বিধ্বস্ত গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে গাছের সারির দিকে। এই মেয়েটাকেই টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছিল, আন্দাজ করল রানা। বাচ্চাটাকে ধরার জন্য ছুটতে শুরু করল ও, পশতু ভাষায় চিৎকার করে ডাকল, 'দাঁড়াও! এই মেয়ে!'

শুনেছে মেয়েটা, কিন্তু দৌড়ের গতি কমল না, যেন খোদ

শয়তানের হাত থেকে পালাচ্ছে।

'থামো! আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না!'

দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, শুনতে পেল রানা। আওয়াজটা কালো বাতাসের নয়, আমেরিকান হেলিকপ্টার গানশিপেরও নয়, অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসবার শব্দ। মেয়েটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা, দু'জনের মাঝখানে আর বড়জোর পঁচিশ ফুট দূরত্ব। পাহাড়ের পায়ের কাছে টিলাগুলোর বাঁকে ধুলোর মেঘ উঠতে দেখে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল ও, গতি কমে গেল দৌড়ানোর। ধুলোর মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে অশ্বারোহীদের একটা সশস্ত্র দল, সংখ্যায় পনেরো-বিশজনের কম হবে না। পরনে তাদের আফগান পোশাক।

মেয়েটা ও রানার মাঝখানে দূরত্ব কমে পনেরো ফুটে দাঁড়িয়েছে, তবে থামতে হলো রানাকে। মেয়েটাকে আড়াল করে ওর সামনে ঘোড়া থামাল সশস্ত্র আফগানরা। রাগে থমথম করছে তাদের চেহারা। পাক খেতে শুরু করল তারা রানাকে ঘিরে, মাঝে মধ্যে ঘোড়া দিয়ে ধাক্কা মারছে ওর গায়ে। দু'জন আফগান চাবুক ও দড়ি দিয়ে আঘাত করল রানার গায়ে।

একটা নির্দেশ শুনে থামল তারা। সবচেয়ে বড় ঘোড়াটার পিঠে বসে আছে দীর্ঘ এক আফগান, অচেনা ভাষায় নির্দেশটা সে-ই দিয়েছে। রানা আন্দাজ করল, এই লোকই আফগান দলটার নেতা। চোখ সরু করে রানাকে দেখল সে, দাড়িওয়ালা রুক্ষ চেহারাটা দেখলে মনে হয় ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা প্রাচীন কোনও অভিযাত্রী। 'আমেরিকান চর!' নিচু স্বরে পশতুতে বলল সে।

মাথা নাড়ল রানা, শান্ত গলায় পশতুতে বলল, 'আমি বাংলাদেশি।'

'আমেরিকান চর!' এবার আঞ্চলিক ভাষায় সঙ্গীদের দ্রুত কী যেন বলল লোকটা।

রানার ঘাড়ের পিছনে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আঘাত করল এক আফগান যুবক। ব্যথায় বিকৃত মুখে হোঁচট খেয়ে দু'পা সামনে বাড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকে রাইফেলের নলের জোর খোঁচা দিল আরেকজন। ওর চারপাশ থেকে কাছিয়ে আসছে অশ্বারোহীরা। একজন দড়ির একটা ফাঁস পরিয়ে দিল রানার গলায়। আরেক আফগান ওর বাম হাতটা শক্ত করে ধরে কব্জিতে দড়ি বাঁধল। রানার ডান হাতও বাঁধা হলো একই ভাবে। দড়িগুলো জিনের সঙ্গে বাঁধল আফগানরা, তারপর ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতে শুরু করল। রানার দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো, দড়ির টানে পেশীতে ব্যথা আরম্ভ হলো। আরও জোরে টান দিচ্ছে শক্ত, কর্কশ দড়ি।

'আমি বাংলাদেশি,' আবারও বলল মরিয়া রানা, ব্যথায় মুখ কুঁচকে উঠেছে। ঈসা আজনবীর কথা মনে পড়ল ওর। লোকটা কোথায়? সে থাকলে হয়তো এদের বোঝাতে পারত।

ঘোড়াগুলোকে এখনও পিছিয়ে নিচ্ছে আফগানরা। জয়েন্টের প্রচণ্ড ব্যথাটা থেকে রানা টের পাচ্ছে, আরেকটু টান বাড়ালেই কাঁধের সকেট থেকে খুলে আসবে ওর হাত দুটো। কব্জির মোচড়ে শক্ত করে হাত বাঁধা দড়ি দুটো ধরে ফেলল বেপরোয়া রানা, তারপর নিজের দিকে টানল। পিছাতে বাধা পেয়ে থেমে গেল দু'পাশের ঘোড়া দুটো, তারপর আরোহীরা তাদের পাঁজরে জুতো দিয়ে খোঁচা দিতেই আবার পিছাতে শুরু করল। 'আমি বাংলাদেশি!' চেঁচাল রানা, অসহায় বোধ করছে। ঈসা আজনবীর কোনও দেখা নেই।

জবাবে ঘৃণা ভরে মাটিতে থুতু ফেলল আফগানদের নেতা, হাতের ইশারায় নির্দেশ দিল, যেন ঘোড়া পিছিয়ে নিয়ে যায় ওগুলোর আরোহীরা।

নির্দেশটা পালিত হবার আগেই ঈসা আজনবীর গলা শুনতে পেল রানা। আরোহীরা তাদের নেতার দিকে তাকাল, ঘোড়া

পিছিয়ে নিতে দ্বিধা করছে। দ্রুত পশতু বলছে ঈসা, তার কথা থেকে রানা বুঝতে পারল, আফগানদের এই দলনেতাই ইউনূস মোসাদ্দেক। তাকে ঈসা আজনবী বর্ণনা করছে কীভাবে রানা একাই দুটো আমেরিকান হেলিকপ্টার গানশিপ রকেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, সেই সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে রানার রাইফেলটা দেখাচ্ছে সে। আফগান নেতার চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস দেখল রানা। ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে, কিছু একটা বলতে যাবে, এমন সময় কচি একটা গলার আওয়াজ শুনতে পেল। ঝট্ করে ঘুরে তাকাল ইউনূস মোসাদ্দেক। তার দেখাদেখি তার দলের অন্যরাও ঘাড় ফেরাল।

গাছের সারির কাছে জংলা পথটায় দাঁড়িয়ে আছে কচি সেই বাচ্চা মেয়েটা, সে-ই কথা বলছে। চিকন গলা কাঁপছে তার, আঙুল তুলে গানশিপগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখাল, তারপর দেখাল রানাকে। ভাষাটা আঞ্চলিক বলে মেয়েটা কী বলছে বুঝতে পারল না রানা, তবে ওর বক্তব্য আন্দাজ করতে পারল।

পাথরের মতো কঠোর চেহারার আফগানদের মাঝে থমথমে নীরবতা নামল। পরস্পরের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তারা। তাদের বিস্ময় আরও বাড়ছে মেয়েটার কথা শুনতে শুনতে। তার কথা শেষ হবার পর মাথা কাত করে অনুচরদের নির্দেশ দিল ইউনূস মোসাদ্দেক। এবার রানার দড়ি খুলে দেবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো নির্দেশ।

হাতের ব্যথায় দু' সেকেন্ড ওরকম ভাবে শূন্যেই হাত তুলে রাখল রানা, তারপর আস্তে করে নামাল, ছিলে যাওয়া কব্জি ডলতে শুরু করল ধীরেসুস্থে।

ঘোড়া থেকে নেমে রানার মুখোমুখি দাঁড়াল ইউনূস মোসাদ্দেক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানাকে দেখল। রানার মনে হলো লোকটা ওর অন্তর পড়তে পারছে। আঞ্চলিক ভাষায় মাত্র তিনটা শব্দ উচ্চারণ করল ইউনূস মোসাদ্দেক। বলার সুরে মনে হলো প্রশংসা করল। রানার দু' কাঁধে শক্তিশালী হাত দুটো রাখল সে,

সামনে বেড়ে রানার দু' গালে চুমু খেল। এবার একটা কথাও না বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটার কাছে চলে গেল, বসে পড়ে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এতক্ষণে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল মেয়েটা, ইউনূস মোসাদ্দেকের বুকে মাথা গুঁজে দিল।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল ঈসা আজনবী, নিচু গলায় বলল, 'ইনিই বিখ্যাত যাদ্ধা, সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক। এটা তাঁরই গ্রাম ছিল।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'উনি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। মেয়েটার নাম হানিফা, সর্দারের একমাত্র মেয়ে।'

ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আফগানরা, গ্রামে ঢুকে আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজছে।

'নিহতদের কবর দেবে ওরা, তারপর প্রস্তুতি নেবে, যেন প্রতিশোধ নিতে পারে,' বলল ঈসা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রামের দিকে পা বাড়াল রানা। পিছন থেকে ঈসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যান?'

'কবর খুঁড়তে সাহায্য করতে,' থামল না রানা, টের পেল, ওর পাশে হাঁটছে ঈসা আজনবী।

পাঁচ

দ্রুত হাত চালাচ্ছে সবাই। শাবল-কোদাল না থাকায় মাটি খোঁড়া হলো গানশিপগুলোর চোখা কিছু ধাতব টুকরো দিয়ে। লম্বা করে তৈরি করা হলো ছ'ফুট গভীর একটা ট্রেঞ্চ। সবাই বুঝতে পারছে, গানশিপ দুটো যোগাযোগ না করায় আমেরিকান বেয থেকে আরও কপ্টার পাঠানো হবে।

লাশগুলোকে নিয়ম মাফিক কবর দেবার সময় নেই হাতে, কাজেই টিলার গোড়ায় কবরস্তানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো না মৃতদেহ, জানাজা পড়ে গণ-কবর দেয়া হলো। কাজটা শেষ করে ট্রেঞ্চে মাটি ফেলল সবাই। ইসলামের প্রতীক সবুজ রং, সবুজ রঙের কয়েকটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল কবরের জায়গাটা। এবার ইউনূস মোসাদ্দেকের ডাকে জড় হলো তার দলের উপস্থিত সব ক'জন আফগান যুবক।

'প্রতিশোধ নিতে হবে এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের,' ঘোষণা করল সে। একবার দেখে নিল স্ত্রীকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে সে-জায়গাটা। চোখ ছলছল করে উঠল তার। বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে তুলে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে, রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা আমাদের সঙ্গে আসবেন।' কোনও নির্দেশ নয়, স্রেফ মন্তব্য।

দু'জন অশ্বারোহীর পিছনে উঠল রানা ও ঈসা আজনবী। রাইফেলটা ঈসার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে রানা। দলটা রওনা হয়ে গেল পাহাড়ের দিকে। বেশিক্ষণ লাগল না, পাইনের বনে ঢুকে পড়ল ওরা। দূর থেকে হেলিকপ্টার গানশিপের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল রানা, এগিয়ে আসছে গ্রামের দিকে।

'আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন,' ওর পাশ থেকে নিচু গলায় বলল ঈসা আজনবী।

লোহার দরজাটা ঝটাং করে খুলে যেতেই শিউরে উঠল সোহেল। ওর কাঁধ, বুক, পাঁজর, শরীরের দু'পাশ ও তলপেটে অসহ্য ব্যথা। অনেকগুলো ঘুসি খেয়ে থেঁতলে ফেটে গেছে ঠোঁট দুটো। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা চোখের। চোখের পাতা বন্ধ করলেও নগ্ন বাতিগুলোর তীব্র আলো থেকে রক্ষা পাচ্ছে না ও। মনে হচ্ছে তপ্ত বালির অসংখ্য কণা ঢুকে পড়েছে চোখের ভিতর। ঘুম... এখন শুধু যদি একটু ঘুমাতে পারত ও!

কর্নেল হেনরি মর্গানের কর্কশ গলা শুনতে পেল: 'সার্জেন্ট, মুখ খুলতে রাজি হয়েছে শুয়োরের বাচ্চা?'

ট্রিসট্রিমের গলাটা অনিশ্চিত শোনাল। 'পুরো ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমাতে দিইনি, সার। ঝিমালেই বাজনা শুনিয়েছি। খাবার বা পানিও দেয়া হয়নি।'

প্রচণ্ড জোরে একটা ক্ল্যাক্সোন বেজে উঠল। তীক্ষ্ণ আওয়াজে যেন বিস্ফোরিত হবে ঘরটা। দু'হাতে কান চেপে ধরল সোহেল। ওর নিয়ন্ত্রণহীন গলা চিরে বেরিয়ে এলো আর্তচিৎকার। কানের পর্দা ফেটে যাবে যে-কোনও সময়।

থেমে গেল ক্ল্যাক্সোন। আহ্, কী আরাম! ঘরের মধ্যে বুটের আওয়াজ। এগিয়ে আসছে। এক কোণে পড়ে আছে সোহেল, তীব্র আলোয় চোখ কুঁচকে তাকাল। হেনরি মর্গানের নিষ্ঠুর চেহারায় বাঁকা হাসির ছাপ দেখল ও।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল কর্নেল। 'এবার মুখ খুলবে আশা করি?'

উজ্জ্বল আলো থেকে বাঁচতে হাতটা অনেক কষ্টে চোখের ওপর রাখল সোহেল, জবাব দিল না।

'খামোকা কষ্ট করছ,' মেকি সহানুভূতির সঙ্গে বলল কর্নেল মর্গান। 'এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাবে? আমার প্রশ্নের জবাব দিলেই পানি পাবে। বলো ইউনূস মোসাদ্দেক, আলফাজ কুশে ও আহম্মদ আলীর দলবল কোথায় আছে। ওদের গোত্রগুলোর মিটিং কোথায় হবে? তুমি আফগানিস্তানে এসেছ কেন?'

মুখ খুলল সোহেল। ফাটা ঠোঁটের কারণে উচ্চারণ অস্পষ্ট, প্রথমে ওর কথা বুঝতে পারল না কর্নেল। ঝুঁকে এলো সে। এবার শুনতে পেল, সোহেল বলছে, 'তোমরা কেন আফগানিস্তানে এসেছ? এখানে কেউ তোমাদের চায় না।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল কর্নেল। চেহারা থমথম করছে তার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কষ্ট পাবার শখ থাকলে পাও কষ্ট, আমার

সময়ের অভাব নেই।' করিডরে কাকে যেন ডাকল সে।

ঠোঁটের কোণে সিগারেট নিয়ে ন্যাড়া-মাথা মোষের মতো শক্তপোক্ত সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম ঢুকল ঘরে। এবার কর্নেল বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল না সে, সোহেলের চুলের মুঠি ধরে জোরে জোরে মাথাটা পাথরের দেয়ালে ঠুকতে শুরু করল। এতো জোরে ঠুকছে না যে জ্ঞান হারাবে সোহেল। ওর পোড়া নাকের মধ্যে ঢুকল আরেকটা জ্বলন্ত সিগারেট। চিৎকার করে উঠল সোহেল। পেটে কিছু নেই যে বমি করবে ও। এখন শুধু রক্তই পারে ওর নাকের মধ্যে ঢোকানো সিগারেটের আগুনটা নেভাতে। তীব্র জ্বলুনির মাঝেও টের পেল, আগুনের তাপে মাংস পুড়তে শুরু করায় রক্ত ঝরছে নাকের ভিতর।

পাঁজরে লাথি খেল এবার, দুর্বল গোঙানি বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে। চেতন-অবচেতনের দোলায় আচ্ছন্ন মনে বুঝতে পারল, আবার অত্যাচার শুরু হয়েছে। এবার আর থামবে না নির্যাতন।

কাঁটাঝোপ ভরা রুক্ষ সমতল বিস্তৃতি পিছনে পড়ে যাবার পর পাহাড়ি শীতল বাতাস রানার শরীর জুড়িয়ে দিল। মাটি এখানে নরম, উর্বর, ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর ক্ষুর জোরাল আওয়াজ করছে না। সামনে বসা আফগানের পাশ থেকে তাকাল রানা। পথটা বড় কয়েকটা বোল্ডারের মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে পাইন গাছের জঙ্গলের আরও ভিতরে চলে গেছে। দলের সামনে সামনে যাচ্ছে সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক।

জঙ্গলের ভিতর নড়াচড়া দেখে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা, তারপর বুঝতে পারল, বাচ্চারা ছুটোছুটি করে খেলা করছে। অগ্রসরমান দলটাকে দেখে তাদের খেলা থেমে গেল, খুশিতে লাফাতে শুরু করল বাচ্চারা, স্বাগত জানাচ্ছে কচি গলায়।

শোক চেপে রেখে ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে তাদের

দেখল ইউনূস মোসাদ্দেক। তার ঘোড়ার দু' পাশে ছুটতে শুরু করল কয়েকটা বাচ্চা।

পথটা গাছের ভিতর থেকে বেরিয়ে উঁচু একটা টিলার সামনে খোলা জায়গায় শেষ হয়েছে। জায়গাটা তিনদিক দিয়ে টিলা দিয়ে ঘেরা। বামদিকে টিলা থেকে নেমে ছোট একটা পুকুর তৈরি করেছে উচ্ছল পাহাড়ি ঝর্না। ওখানে বেশ কিছু তাঁবু দেখল রানা। কয়েকটা তাঁবুর ওপর বিছিয়ে রাখা হয়েছে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট ক্যামোফ্লেজ নেটিং। বোরকা পরা কয়েকজন মহিলা গর্তওয়ালা পাথরের ভিতর কয়লার ধোঁয়াহীন আগুন জ্বেলে রাতের খাবার তৈরি করছে। এছাড়াও কেউ কেউ তৈরি করছে আটার রুটি, কেউ বা সেলাই করছে কাপড়, কেউ দেখ-ভাল করছে জন্তু-জানোয়ারগুলোর। পুরুষরা গোল হয়ে বসে চা খাবার ফাঁকে তাদের প্রাচীন এনফিল্ড থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলগুলো পরিষ্কার করছে। কয়েকজন আগ্রহ নিয়ে দেখছে দু'জন কিশোর বয়সী ছেলের কুস্তি, নানারকম পরামর্শ ও উৎসাহ দিচ্ছে তাদের।

ইউনূস মোসাদ্দেক ঘোড়া থামিয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে নামবার পর সমস্ত কর্মতৎপরতা থেমে গেল। ছোট্ট গ্রামের অধিবাসীরা ঘিরে ধরল তাকে। আত্মীয়-স্বজনদের ফিরতে দেখে খুশি হয়েছিল তারা, কিন্তু আফগান যুবকদের গম্ভীর, বিষাদগ্রস্ত চেহারা দেখে অমঙ্গল আশঙ্কায় মিইয়ে গেল সবাই। অপরিচিত রানার দিকে বারবার সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করল পুরুষরা।

নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় আমেরিকান হেলিকপ্টার গানশিপের আক্রমণের খবরটা সংক্ষেপে জানাল ইউনূস মোসাদ্দেক। তার কথা শেষ হবার পর বিলাপ করে উঠল কয়েকজন মহিলা। চারপাশে নেমে এলো শোকের ছায়া।

রানার পাশে চলে এলো ঈসা আজনবী।

'এখানেই ইউনূস মোসাদ্দেকের ঘাঁটি?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপাতত,' বলল ঈসা। 'যতক্ষণ না আমেরিকানরা জায়গাটা চিনে ফেলে। সর্দারকে আমেরিকানরা তালেবান বলে সন্দেহ করে, তারা গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে এদিকের কয়েকটা গোত্র এক হয়ে বিদেশি শক্তি উৎখাতের চেষ্টা করবে, কাজেই সর্দার বুঝতে পারছিলেন গ্রামে থাকা আর নিরাপদ নয়, তখন এদের এখানে চলে আসতে নির্দেশ দেন। তবে অনেক মালামাল বয়ে আনতে হওয়ায় সবাই তখনই আসতে পারেনি। বউ-মেয়েকে সর্দার গ্রামেই রেখেছিলেন, যাতে কেউ বলতে না পারে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট। আজ ফিরে গিয়েছিলেন তাদের আনতে।'

ইউনূস মোসাদ্দেকের মনের অবস্থা এখন কেমন হতে পারে আন্দাজ করতে পারল রানা। তার নিরপেক্ষতার বিনিময়ে অকালে স্ত্রীকে হারিয়েছে সে। আবারও সোহেলের কথা মনে এলো রানার। সোহেল এখন কোথায়? কী অবস্থা ওর?

ওর চটকা ভেঙে দিল ঈসা আজনবী। 'এই জায়গাটাও খুঁজে বের করে ফেলতে দেরি হবে না আমেরিকানদের। তখন অন্য কোথাও সরে যেতে হবে সবাইকে।'

'সেখান থেকে সরতে হবে আবারও,' তিক্ত শোনাল রানার গলা। 'কবে এর শেষ হবে কে জানে!'

'হবে,' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ঈসা। 'ইনশাল্লাহ্!'

তাঁবুগুলোর ওপাশে টিলার গায়ে বেশ কয়েকটা গুহা আছে, সেখানে রানা ও ঈসাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক, বড় একটা গুহায় ঢুকল। সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে বলে গুহার ভিতরে গাঢ় ছায়া ঘনাচ্ছে।

ভিতরে অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হয়েছে। অসুস্থ, আহতরা শুয়ে আছে কম্বল, ছড়ানো খড় কিংবা রক্তের রঙে কালচে হয়ে আসা হলদে লিনেনের ওপর। পেশোয়ারের সেই দোকানটাতে যেমন দেখেছিল, সেরকম এখানেও বেশ অনেকগুলো ক্রাচ ও নকল হাত-পা দেখতে পেল রানা। ওগুলোর কিছু তৈরি হয়েছে

কাঠ খোদাই করে, বাকিগুলো ধাতুর তৈরি। এক পাশে পাথরের একটা কার্নিশে পাশাপাশি রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটা কাঠের পা। গুহার দু'পাশের দেয়ালে পেরেক ঠুকে একটা দড়ি টাঙিয়ে সেটা থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে একটা হারিকেন। সামান্য আলো ছড়াতে পারছে ওটা, ছায়াই তৈরি হচ্ছে বেশি।

অচেতন এক আহত লোকের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে এক ছায়ামূর্তি। তার পিছনে মেয়েকে নিয়ে দাঁড়াল সর্দার। আহত লোকটার ব্যান্ডেজ বদলে দিল ছায়ামূর্তি, তারপর উঠে দাঁড়াল। অবাক হতে হলো রানাকে। ধুলোমাখা খাকি শার্ট-প্যান্ট পরা মেয়েটার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না। এলোমেলো কালো চুলগুলো কাঁধের কাছে লুটাচ্ছে। কঠোরতা, সেই সঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ তার ডিম্বাকৃতির সুন্দর মুখে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ইউনূস মোসাদ্দেকের দিকে ধনুক ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সে।

গ্রামবাসীদের যা বলেছে সেটাই পশতু ভাষায় আড়ষ্ট গলায় তাকে জানাল সর্দার।

শুনতে শুনতে চোখ দুটো সরু হয়ে গেল মেয়েটার, হানিফাকে পরীক্ষা করতে ঝুঁকল। কচি মেয়েটার চোখে এখনও তাড়া খাওয়া ভীতচকিত দৃষ্টি, ভয়ঙ্কর স্মৃতি এখনও তাড়া করে ফিরছে তাকে। ভুলতে পারছে না কীভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

সোনালী চুলের যুবতীকে সাহায্য করতে পাশে এসে দাঁড়াল বোরকা পরা এক মহিলা। হানিফার কেটে-ছড়ে যাওয়া হাত-পা পরিষ্কার করতে শুরু করল দু'জন, তারপর ক্ষতগুলোয় অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম মাখিয়ে ব্যান্ডএইড লাগাল। পুরোটা সময় গভীর উদ্বেগ নিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল ইউনূস মোসাদ্দেক। কাজটা শেষ হবার পর মেয়েকে গুহার এক ধারে নিয়ে গেল সে, কোলে উঠিয়ে গায়ে-মাথায় সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিল।

'ইনি মাসুদ রানা,' রানাকে দেখিয়ে যুবতীকে বলল ঈসা আজনবী। 'বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, বন্ধুকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে।'

'ফারা রাইনার,' হাত বাড়িয়ে দিল যুবতী। কথার সুর শুনে মনে হলো হল্যান্ডের মানুষ। 'ডাক্তার।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বন্ধুকে কোত্থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন ভাবছেন?'

'আমেরিকান আর্মির হাতে বন্দি হয়েছে ও,' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল রানা।

'তা হলে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন,' বিড়বিড় করল মেয়েটি। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানেন সে কোথায় আছে?'

'আন্দাজ করছি কোওতাল-ই দোরা'র কাছাকাছি কোনও দুর্গে,' বলল রানা। 'আশা করছি ইউনূস মোসাদ্দেক আমাকে জানাতে পারবেন ঠিক কোথায় থাকতে পারে ও।'

আঞ্চলিক ভাষায় কী যেন বলে উঠল ইউনূস মোসাদ্দেক। গলার সুরে মনে হলো সে বিরক্ত বোধ করছে।

'উনি বলছেন পরেও কথা বলতে পারবেন আপনারা দু'জন,' জানাল ঈসা।

'কোনও অসুবিধে নেই,' পশতুতে বলল ফারা রাইনার।

ঘুরে দাঁড়াল ঈসা। 'আপনাকে এখন ওঁর সঙ্গে আসতে হবে, জনাব।'

গুহা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ইউনূস মোসাদ্দেক। তাকে অনুসরণ করল ঈসা ও রানা। ঈসা বলল, 'এখন সবাই জড় হবে। আপনাকে গ্রামের বিচারসভায় অংশ নিতে হবে। আরও দু'জন সর্দার আসবেন শুনলাম।'

রাতটা যেন দেখতে দেখতে নেমে এসে গোটা দুনিয়াকে কালো পর্দার চাদরে ঢেকে দিল। আকাশের নক্ষত্রগুলোকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও বড় দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বসল বিচারসভা। তিরিশজন গেরিলা অর্ধবৃত্তাকারে বসল আগুনের ধারে। আগুনের আভায় তাদের কালো চোখ চকচক করছে, সে-চোখে প্রতিহিংসার ছায়া। তাদের উল্টোপাশে বসা রানা ও ঈসাকে বারবার দেখছে তারা। সবচেয়ে বামদিকে বসেছে ইউনূস মোসাদ্দেক।

বিচার শুরু হবার অল্পক্ষণের মধ্যে সত্যিই আরও দুটো গোত্রের সর্দার বেশ কয়েকজন অনুচর সহ এসে যোগ দিল। সর্দারদের একজনের বয়স পঁচিশের বেশি হবে না; চিকন, দড়ির মতো পাকানো শরীরের যুবক সে। নাম আলফাজ কুশে। অন্যজনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, থমথমে চেহারায় রাগের সুস্পষ্ট ছাপ। অন্তত সাড়ে ছ'ফুট সে দৈর্ঘ্যে, দাড়ির দু'পাশে পাক ধরেছে, জুলফি থেকে পাকা দাড়ির দুটো মোটা রেখা নেমে এসেছে চিবুক পর্যন্ত। পরিচয় করিয়ে দেয়ায় তার নাম জানতে পারল রানা, সর্দার আহম্মদ আলী। অত্যন্ত সম্মান করা হচ্ছে তাকে। ঈসার কাছে শুনল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সর্দার আহম্মদ আলীকে জীবন্ত কিংবদন্তী বলে মনে করা হয়। ভিন্ন দেশের মানুষ দেখতে পারে না সে, অপরিচিত হলে তো কথাই নেই।

ইউনূস মোসাদ্দেক ও আহম্মদ আলীর মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা চলছে। রানার পাশে বসে ঈসা অনুবাদ করে দিচ্ছে পশতুতে।

'আহম্মদ আলী বলছেন আপনি আমেরিকান গুপ্তচর।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'আমেরিকান গুপ্তচর হলে আমি ওদের দুটো হেলিকপ্টার গানশিপ ফেলে দিতাম?'

'সেটাই তো ইউনূস মোসাদ্দেক বোঝাচ্ছেন ওঁকে। আহম্মদ আলী জবাবে বললেন, আমেরিকানদের কাছে মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই। বলছেন, তাঁদের উত্থান রুখতে যা খুশি করতে পারে সাদা চামড়ার পশুগুলো।'

রানা আলাপ চালিয়ে যাবার জন্য বলল, 'ইউনূস মোসাদ্দেকের মেয়েকে বাঁচিয়েছি আমি, সে কী বলছে?'

'বলার তেমন একটা সুযোগ পাচ্ছে কোথায়!' আফসোস করে মাথা নাড়ল ঈসা আজনবী। 'আহম্মদ আলী বলছেন আমেরিকান গুপ্তচর না হলে পুরো গ্রামের সবাইকে আপনি রক্ষা করলেন না কেন। সর্দার মোসাদ্দেক বলছেন তিনি আপনাকে বিশ্বাস করেন, আপনার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। আহম্মদ আলী বলছেন, আপনি সিআইএর লোক। আলফাজ কুশে কোনও পক্ষ নিচ্ছে না, তর্কটা খারাপ দিকে মোড় নিলে ঠেকাবে দু'জনকে।'

গভীর মনোযোগে দুই সর্দারের তর্ক শুনছে গেরিলারা, মাঝে মাঝে চোখে সন্দেহ নিয়ে রানা ও ঈসাকে দেখছে।

ঈসা আবার শুরু করল, 'সর্দার মোসাদ্দেক বলছেন আপনি দেখতে আমেরিকানদের মতো নন, আপনি আমেরিকানদের মতো করে কথা বলেন না। আপনি বাংলাদেশি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে বলে তো মনে হচ্ছে না!' এবার কথা বলে উঠেছে আলফাজ কুশে, তাকিয়ে আছে রানারই দিকে। অনুবাদ করতে শুরু করল ঈসা: 'বিদেশি, আপনি বলছেন আপনি আমেরিকান নন, বাংলাদেশি। তাতে কী? বাংলাদেশ তো এই অন্যায় যুদ্ধের কারণে আমার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করছে না, আমাদের সাহায্য করছে না। অনেক দেশের কাছে সাহায্য চেয়েছি আমরা, কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। যারা আমাদের সাহায্য করেনি তাদের কোনভাবেই সাহায্য করব না আমরা।'

'আমরা একা লড়ছি,' আলফাজ কুশের বক্তব্যের সমর্থনে পশতুতে বলল আহম্মদ আলী।

'আমি এখানে কোনও দেশের পক্ষ থেকে আসিনি,' বলল রানা। 'নিজের গরজে একা এসেছি, এসেছি কারণ আমার বন্ধু আমেরিকানদের হাতে বন্দি, আমি চাই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে।'

'আমাদের প্রতি সৌজন্যের প্রতীক হিসেবে কিছু এনেছেন?' টিটকারির সুরে জিজ্ঞেস করল আহম্মদ আলী। 'আপনার কথা

বিশ্বাস করব কেন আমরা?'

'কিছু অস্ত্র এনেছি আপনাদের জন্যে,' শান্ত স্বরে বলল রানা। মনে মনে ঈসা আজনবীকে ধন্যবাদ দিল।

'অস্ত্র?' পিঠ সোজা করে বসল আহম্মদ আলী। 'কী অস্ত্র?'

'অটোমেটিক রাইফেল, গুলি, বিস্ফোরক। দুটো মালবাহী ঘোড়া যতটা ওজন বয়ে আনতে পারে।'

ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল আলফাজ কুশে। 'সেই মালবাহী ঘোড়া দুটো কোথায়? আমি তো কোনও মালবাহী ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।'

'এখানে আসার পথে ঘোড়া দুটো মারা গেছে।' রানার নিজের কানেই কথাটা অবিশ্বাস্য শোনাল।

'মিথ্যে বলছেন,' কড়া গলায় বলল আহম্মদ আলী। 'রাইফেল আসলে আনেননি, আপনি আমেরিকানদের গুপ্তচর।'

'অস্ত্রগুলো আমরা বালিচাপা দিয়ে এসেছি। জায়গাটায় চিহ্নও রেখে এসেছি। তাজা ঘোড়া হলে এখান থেকে ওই জায়গায় যেতে বড়জোর চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগবে।' রানার মনে চিন্তাটা এলো: যদি জায়গাটা খুঁজে পাওয়া না যায়, তা হলে?

'তো, আপনার ধারণা, সেই কাল্পনিক জায়গাটা আপনি খুঁজে পাবেন?' টিটকারির সুরে জিজ্ঞেস করল আহম্মদ আলী।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'না।'

বাঁকা হাসল আহম্মদ আলী। 'পাবেন কী করে! আসলে তো ওরকম কোনও জায়গাই নেই।'

পাশে বসা ঈসা আজনবীকে দেখাল রানা। 'জায়গাটা ও চিনতে পারবে।'

চিন্তিত চেহারায় দাড়িহীন মসৃণ চিবুক হাতাল আলফাজ কুশে। ঈসা আজনবীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পারবে তুমি?'

'যদি চিহ্ন দেয়া পাথরটা ঝড়ো বাতাসে বালির নীচে তলিয়ে

গিয়ে না থাকে,' শুকনো গলায় জানাল ঈসা।

'ঠিক আছে, খুঁজে দেখতে পারো তুমি,' সিদ্ধান্তের সুরে বলল আহম্মদ আলী, 'যদি না পাও তা হলে তুমি এবং এই বিদেশি আমার হাতে মরবে।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল ইউনূস মোসাদ্দেক, এবার মুখ খুলল, 'এই বাংলাদেশিকে আমি বিশ্বাস করি। এটাও বিশ্বাস করি, উনি আমাদের জন্যে অস্ত্র নিয়ে এসেছেন। এখন ওগুলো যদি খুঁজে বের করা না যায় তা হলে সেটা তাঁর দোষ হতে পারে না। উনি আমার মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছেন। মেয়ের কসম খেয়ে বলছি, আহম্মদ আলী, আপনি ওঁকে খুন করবেন সেটা আমি হতে দেব না।'

'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা, তারপর দেখা যাবে কী হয়,' কড়া শোনাল আহম্মদ আলীর গলা।

কিন্তু অস্ত্র যদি পাওয়া যায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমার বন্ধুকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে তা জানতে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন?'

তিক্ত হাসল আহম্মদ আলী। 'যদি সত্যি আপনার বন্ধু আমেরিকানদের হাতে বন্দি হয়ে থাকে, তা হলে তাকে এখন আর বাঁচানো যাবে না। এতক্ষণে পরপারে চলে গেছে সে।'

রেগে যাচ্ছে, টের পাচ্ছে রানা। নিজের অজান্তেই মনে মনে বলল, 'সোহেল তুই বেঁচে আছিস। বাঁচতে হবে তোকে! বাঁচতেই হবে! খবরদার, মরবি না তুই!'

সর্দার আহম্মদ আলীর কথায় সায় দিয়ে আস্তে করে মাথা দোলাল আলফাজ কুশে। 'অনেকেই ধরা পড়েছে ওদের হাতে। অত্যাচার করে করে মেরে ফেলেছে তাদের ওরা। লাশগুলো পুঁতে ফেলেছে বালির তলায়।'

'তবুও আমি জানতে চাই আমার বন্ধু কোথায় আছে,' জেদ চেপে যাচ্ছে রানার মাথায়, কিন্তু গলা একদম শান্ত। 'যদি বেঁচে

থাকি তা হলে ওকে উদ্ধার করতে চেষ্টা আমি করবই।'

'তার মানে আমার হাতে যদি মারা না পড়েন তো আমেরিকানদের হাতে মরবেন আপনি,' মন্তব্যের সুরে বলল আহম্মদ আলী।

'হয়তো।' দাঁতে দাঁত চেপে বসায় চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল রানার।

ছয়

ভোরে একটু দেরিতেই ঘুম ভাঙল ওর। বাইরে গলার আওয়াজ শুনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো রানা, দেখল তিনজন আফগান যুবক ঈসার সঙ্গে রওনা হবার জন্য তৈরি হয়েছে। তিন সর্দারের তরফ থেকে তারা তিনজন যাচ্ছে। আলফাজ কুশে ও আহম্মদ আলীর লোকরা দেখতে যাচ্ছে সত্যিই অস্ত্র খোঁজার কোনও চেষ্টা করা হয় কি না। তাদের সঙ্গে দুটো মালটানা ঘোড়াও আছে। ওগুলোর ওপর কিছু চাপানো হয়নি। অস্ত্র পাওয়া গেলে সেসব বয়ে আনতে কাজে দেবে ওগুলো।

বিড়বিড় করে রানা বলল, 'ঈসা, জিনিসগুলো নিয়ে ফেরত এসো। তুমি সফল হবে কি না তার ওপর হয়তো নির্ভর করছে আমার বন্ধুর জীবন।'

দলটাকে অনুসরণ করল ও পায়ে হেঁটে, পাইন বনের ভিতর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে উন্মুক্ত একটা ঢালে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল, দেখল টিলার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল চারজনের দলটা। অনেক দূরে চোখ গেল ওর। ওদিকে বালির বিরান প্রান্তরে উড়ছে

ধুলোর মেঘ। বামদিকে তাকাতেই মাঠ মতো ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পেল। ওখানে দশজন আফগান যোদ্ধা খেলছে। মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে তিন ইঞ্চি উঁচু একটা তাঁবুর খুঁটি, ঘোড়া নিয়ে ছুটে গিয়ে বর্শা দিয়ে ওটাকে গেঁথে ওপরে তোলাই তাদের লক্ষ্য।

রানা ওদিকে এগোতেই ওকে লক্ষ করল গেরিলারা। আগের চেয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে নিজেদের দক্ষতা দেখানোর চেষ্টা শুরু হলো তাদের মধ্যে। সবাই উত্তেজিত, একে একে চেষ্টা করছে খুঁটিটা গেঁথে ফেলতে।

'ওরা যদি অস্ত্রপাতি পায় তা হলে কখন ফিরবে বলে মনে করেন?'

পিছন থেকে আচমকা রিনরিনে গলার আওয়াজ পেয়ে একটু চমকে গেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ডাচ ডাক্তার ফারা রাইনার হালকা পায়ে নিঃশব্দে ওর দিকে হেঁটে আসছে। কালকে সন্ধ্যায় গুহার ছায়ান্ধকারে ভাল মতো মেয়েটাকে দেখতে পায়নি রানা, এখন দিনের আলোয় দেখে ওকে স্বীকার করতে হলো, সত্যি, ডাক্তার না হয়ে মেয়েটা নামকরা সুপার-মডেলও হতে পারত।

'দুপুরের দিকে,' জবাব দিল ও।

রানার চোখে বেগুনী চোখ রাখল ফারা রাইনার। 'এরা আপনাকে সন্দেহ করছে বলে দোষ ধরবেন না, যে-অবস্থার ভেতর দিয়ে এদের সবাইকে যেতে হয়েছে তাতে বাইরের কাউকে বিশ্বাস না করারই কথা।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'আফগানিস্তানে এসেছেন ক'বছর হলো?'

'দেড় বছর।'

'শ্বেতাঙ্গ হয়েও...'

'আমি মানুষ,' রানার মুখের কথা কেড়ে নিল ফারা। 'বিপর্যস্ত মানুষের জন্যে কাজ করছি। গায়ের চামড়ার রং মানুষে মানুষে বিভেদের কারণ হতে পারে না। অত্যাচারীদের বিপক্ষে আছি, সেটাই আমাকে চলার শক্তি দেয়।'

হঠাৎ করেই যেন ফুরিয়ে গেল দু'জনের কথা। আফগানদের খেলার দিকে মন দিল রানা।

এক গেরিলা ছুটন্ত ঘোড়া থেকে বর্শার খোঁচায় গেঁথে ফেলেছে তাঁবুর খুঁটি। সে ওটা মাটি থেকে তুলে আনতেই অন্যরা হই-হই করে তাকে বাহবা দিল।

কয়েকজন অশ্বারোহী তাদের ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে রানার দিকে তাকাল।

পরের গেরিলা বর্শায় খুঁটি গাঁথতে পারল না। ঠাট্টা-মশকরা শুরু হলো তাকে নিয়ে।

আরও দু'তিনজন আফগান যুবক রানার দিকে ফিরে তাকাল।

'ওদের হাসি-খুশি ভাব দেখে ভুল বুঝবেন না,' পাশ থেকে সতর্ক করার সুরে বলল ফারা রাইনার। 'সবসময় যুদ্ধের চিন্তা করছে ওরা। যখন খেলছে তখনও ভুলছে না নিজেদের দেশের গৌরবময় ইতিহাস, খুঁজছে বর্তমান দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়।'

খেলা ছেড়ে বেরিয়ে আসা এক আফগান যুবক রানার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কী যেন বলল।

'কি বলছে বুঝতে পারছেন?' ফারাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলছে আপনিও ওদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিন।'

হাতের ইশারায় একটা সওয়ারীহীন ঘোড়া দেখাল এক গেরিলা। বড়সড় শরীরের আরেক আফগান যুবক হাত দিয়ে ছোট্ট খুঁটিটা দেখাল।

'ওদের দিকে তাকাবেন না,' সতর্ক করল ফারা। 'ওরা আপনাকে নিজেদের বিপজ্জনক খেলায় জড়িয়ে নিতে চাইছে।'

আরও দু'জন খেলোয়াড় রানার দিকে তাকিয়ে ডাকল।

মাথা নাড়ল রানা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল খেলাটা ও জানে না।

বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের একটা গুঞ্জন উঠল আফগান

খেলোয়াড়দের মাঝে। নিজেদের ভিতর কী যেন সব বলছে তারা টিটকারির হাসি হেসে।

'কী বলছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হালকা অপমান করছে আপনাকে,' সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল ফারা রাইনার। 'ওদের দিকে মনোযোগ দেবেন না।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানার চেহারা। 'আমাকে বলুন প্লিজ কী বলছে ওরা।'

'ওরা ধারণা করছে...' থেমে গেল ফারা।

'কী?'

অন্যদিকে তাকাল ফারা রাইনার। 'কিছু না।'

'বলুন।' খানিকটা জেদ প্রকাশ পেল এবার রানার গলায়।

'ওরা ধারণা করছে আপনি আসলে একটা কাপুরুষ।'

'ওদের মনোভাব এরকম হলে যে-কাজে এসেছি সেটা কঠিন হয়ে যাবে,' বলেই ফাঁকা জায়গাটার দিকে পা বাড়াল রানা।

'ভুল করছেন কিন্তু,' পিছন থেকে উদ্বিগ্ন গলায় বলল ফারা। 'ওরা ছোটবেলা থেকে এই খেলা খেলছে। দেখলে মনে হয় কাজটা খুব সোজা, কিন্তু আসলে...'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'আপনি বুঝছেন না, যেভাবে হোক-আমাকে ওদের শ্রদ্ধা আদায় করতে হবে।' খেলোয়াড়দের কাছে চলে গেল ও। যে আফগান যুবক ওকে ঘোড়ার রাশ এগিয়ে দিল, দাঁত কেলিয়ে হাসছে সে।

রেকাবে পা রেখে জিনে উঠে বসল রানা, একজনের বাড়িয়ে দেয়া একটা দীর্ঘ বর্শা হাতে নিল।

একে অন্যের পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে হাসাহাসি করছে যুবক গেরিলারা।

পঞ্চাশ গজ দূরের খুঁটিটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না এখান থেকে। ওটার দিকে মনোযোগ দিল রানা। ওর জগৎ থেকে অন্য সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেল। এখন সোহেলের কথা ভাবছে না

ও, ভাবছে না কীভাবে ওকে উদ্ধার করবে। ঘোড়ার পাঁজরে গোড়ালির চাপ বাড়াল রানা, ছুটতে শুরু করল জন্তুটা। জোর আওয়াজ হচ্ছে ক্ষুরের। রানার শরীরের নীচে কিলবিল করছে ওটার শক্তিশালী পেশী। অস্বাভাবিক দ্রুততায় যেন কাছে চলে আসছে খুদে খুঁটি।

শক্ত করে ডান হাতে বর্শাটার হাতল ধরল রানা, প্রশিক্ষিত ঘোড়ার গতি বাড়ছে আরও।

ওই যে, সামনে খুঁটি।

বর্শা দিয়ে ঘাই দিল রানা ওটা লক্ষ্য করে। খুঁটিতে লাগল না বর্শা, গেঁথে গেল মাটির গভীরে। এতো জোরে ঝাঁকি খেল যে ঘোড়া থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল রানা। উপুড় হয়ে পড়েছে ও। পতনের আঘাতটা ওর শ্বাস আটকে দিল।

আবছা ভাবে ও শুনতে পাচ্ছে গেরিলাদের অট্টহাসির আওয়াজ।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রানা, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এখনও।

এখানে বিদেশি আগন্তুক অপদস্থ হচ্ছে সে-খবর অস্থায়ী তাঁবুগুলোয় পৌঁছে গেছে। ওখান থেকে বেশ কয়েকজন চলে এসেছে ঘটনা দেখতে। জঙ্গলের কিনারায় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কী ঘটে দেখবার অপেক্ষায় আছে তারা।

দাঁড়িয়ে পড়া ঘোড়াটার পাশে চলে গেল রানা, আবার জিনে উঠল।

'ফিরে আসুন!' চিৎকার করায় তীক্ষ্ণ শোনাল ফারা রাইনারের গলা: 'মারা যাবেন তো!'

কথাটা শুনেও শুনল না রানা। আরেকটা বর্শা তার দিকে বাড়িয়ে দিল সেই আফগান যুবক, দাঁত বের করে হাসছে এখনও। তার হাসিটা আগের চেয়ে চওড়া হয়েছে।

বর্শাটা নিল না রানা। হাসি মুছে গেল যুবকের মুখ থেকে। খেলোয়াড় ও গ্রামবাসীরা বিস্ময় নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে,

বুঝতে পারছে না বিদেশি লোকটার মতলব কী।

যেখান থেকে ছুটতে শুরু করেছিল, সেখানে ঘোড়াটা নিয়ে এলো রানা, আবার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল খুঁটির ওপর। বুকের ভিতর অপ্রতিরোধ্য জেদের ঢেউ যুক্তির পাড় ভাঙছে, টের পাচ্ছে ও স্পষ্ট।

পাঁজরে গোড়ালির গুঁতো খেয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া। আগের চেয়ে জোরে। কাছে চলে আসছে খুঁটি, আকারে বড় দেখাচ্ছে।

হাত থেকে রাশ ছেড়ে ডান হাতে জিন আঁকড়ে ধরল রানা, বাম হাতের এক টানে কোমরের খাপ থেকে কমান্ডো নাইফটা বের করে আনল। এবার জিন থেকে শরীরটা কাত করে দিল ও। এখন ওর মাথা রেকাবের পাশে ঝুলছে। ছোরা ধরা বাম হাতটা মাটি ছুঁইছুঁই। খুঁটির এক ফুট ওপর দিয়ে পার হবে ওর মাথা।

এইবার!

সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল উদ্যত, ক্ষুরধার ছোরার ফলা। খুঁটিটা গেঁথে ফেলল রানা ছোরার ডগায়, তারপর এক টানে তুলে আনল মাটি থেকে। জিনে সোজা হয়ে বসে ছোরাটা ওপরে তুলে ধরল, যাতে সবাই দেখতে পায় ওটার ডগায় খুঁটি গাঁথা আছে।

উচ্ছ্বাস চাপতে পারল না গেরিলারা, হই-হই করে উঠল। চোখে প্রশংসা নিয়ে রানাকে দেখছে তারা এখন।

ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল রানা, কমান্ডো নাইফ খাপে পুরে ছুটন্ত ঘোড়া থেকে আবারও ঝুঁকে আঙুলের জোরে খুঁটিটা নরম মাটিতে গেঁথে দিল। এবার ফিরে এলো যার কাছ থেকে ঘোড়া ধার পেয়েছিল, তার কাছে। জিন থেকে নেমে রাশটা ধরিয়ে দিল বিস্মিত যুবকের হাতে।

গাছের নীচ থেকে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করেছে সর্দার আহম্মদ আলী, কঠোর চেহারায় সামনে বাড়ল সে এবার। তার

চিবুক পর্যন্ত নেমে আসা দু'পাশের পাকা দাড়ি সূর্যের আলোয় রূপালী দেখাচ্ছে, বাতাসে বুকের কাছে উড়ছে দীর্ঘ কালো দাড়ি। গম্ভীর গলায় কী যেন বলতে শুরু করল লোকটা।

বলছে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায়, দু'একটা শব্দ শুধু বুঝতে পারল রানা। ফারা রাইনারের দিকে ফিরে তাকাল ও। 'একটু বলবেন, কী বলছে?'

অনুবাদ করতে শুরু করল ফারা, গলা থেকে গভীর উদ্বেগ লুকাতে পারল না।

'বলছে আপনার পারদর্শিতা প্রশংসার দাবী রাখে। জানতে চাইছে আপনি অন্য একটা মজার খেলা খেলতে রাজি আছেন কি না। যদি অবশ্য আপনার সাহসে কুলায়।'

'চেষ্টা আমাকে করতেই হবে,' বলল গম্ভীর রানা। 'আফগানদের যতটুকু চিনি তাতে এরা আমাকে কাপুরুষ মনে করলে কোনও ভাবেই সাহায্য করবে না।'

'ভুল করবেন সর্দারের কথায় রাজি হলে,' নিচু গলায় বলল ফারা। 'সম্মানসহ প্রত্যাখ্যান করা যায় তেমন কিছু বলা যায় কি না ভাবুন। লোকটা আপনাকে ফাঁদে ফেলে অসহায় অবস্থায় চাইছে, যাতে সবাই আপনাকে অযোগ্য মনে করে।'

'না খেললেই বরং অযোগ্য মনে করবে।'

'কিন্তু খেলাটা কী সেটা বোধহয় আমি জানি। বোধহয় বুযকাশির কথা ভাবছে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফারা রাইনারের দিকে তাকাল রানা। 'বুযকাশি কী?'

'বাছুরের খেলা।'

'বাছুরের...' বুঝতে পারল না রানা। আগে আফগানিস্তানে যতবার এসেছে, কাজে এসেছে ও, আফগানদের খেলাধুলো সম্বন্ধে জানবার সুযোগ হয়নি।

'বুযকাশি আফগানিস্তানের জাতীয় খেলা,' বলল ফারা।

'আহম্মদ আলী ওই খেলায় খুবই দক্ষ, নামকরা খেলোয়াড়। সারা দেশের সবাই অন্যতম সেরা বুযকাশি খেলোয়াড় হিসেবে চেনে তাকে। তার বিরুদ্ধে খেলতে নামা আর চ্যাম্পিয়ন হেভিওয়েট বক্সারের বিরুদ্ধে অনভিজ্ঞ কারও মুষ্টিযুদ্ধে নামা একই ব্যাপার।'

'আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

চোখে চ্যালেঞ্জ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় আছে আহম্মদ আলী। রানা মাথা দুলিয়ে পশতুতে 'খেলব' বলতেই তার খয়েরী চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'বুযকাশি!' গলা চড়িয়ে বলল সে, ফিরে তাকাল অনুচরদের দিকে।

পাশে দাঁড়ানো ফারা রাইনারকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কীভাবে বুযকাশি খেলতে হয় আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

ব্যাখ্যা করতে শুরু করল ফারা রাইনার।

খেলার পদ্ধতিটা সোজা। ঘোড়ার পিঠে চেপে খেলতে হয় বুযকাশি। মাথা-কাটা সদ্য-প্রসূত একটা বাছুর ফেলে রাখা হবে অগভীর একটা খাদের ভিতর, অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ওটা তুলে আনতে হবে ওখান থেকে, ওটা নিয়ে ঘোড়ায় উঠে পড়তে হবে, তারপর ছুটতে হবে মাঠ ধরে। মাঠের শেষ প্রান্তে একটা মার্কার থাকবে, সেটা ঘুরে আবার ফিরে এসে খাদের মধ্যে নামিয়ে দিতে হবে বাছুরটাকে। এই গোটা প্রক্রিয়ায় সর্বক্ষণ অন্য খেলোয়াড়রা চাইবে বাছুর যার কাছে আছে, তার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নিতে। কেড়ে নিয়ে কেউ যদি খাদের মধ্যে বাছুর রাখতে পারে, তা হলে সে-ই জিতবে।

প্রাচীন খেলা। আর প্রায় কোনও নিয়মেরই বালাই নেই। নিষ্ঠুরতায় ভরা কাড়াকাড়ির খেলাও বলা যেতে পারে একে। প্রতিপক্ষ যাতে বাছুর তার ঘোড়ায় তুলতে না পারে সেজন্য প্রতিযোগীরা প্রয়োজনে মারামারি, হাতাহাতি করতে পারবে, শুধু কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। বাছুর যে পাবে তাকে ঘোড়া

থেকে ফেলে দিতে যা খুশি করবার সুযোগ আছে। ধরে নেয়া হয় পুরুষের নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা থাকবে। তা যদি না থাকে, ধিক্ সেই পুরুষকে।

বুযকাশি খেলা হবে খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের সব ক'জন নারী-পুরুষ হাজির হয়ে গেল খোলা জায়গাটায়। বাচ্চারাও বাদ গেল না। গবাদি পশু মূল্যবান বলে সদ্য-প্রসূত মরা একটা বাছুরের ব্যবস্থা করা হলো খেলার জন্য। নিয়ম মাফিক মাথা কেটে ফেলা হলো ওটার। এবার বাছুরটাকে নিয়ে গিয়ে রাখা হলো ফাঁকা জমির এক মাথায়, একটা অগভীর খাদের ভিতর।

খানিকটা দূরে অপেক্ষা করছে রানা, আহম্মদ আলী ও দশজন অতি উৎসাহী যুবক খেলোয়াড়। সর্দার আহম্মদ আলীর সঙ্গে খেলায় অংশ নিতে পারবে ভেবে গর্বিত তারা।

একটু পরেই খেলা শুরু হবে। দু'পা ফাঁক করে বুক চিতিয়ে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে আহম্মদ আলী, চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। জানে, আজও সে-ই জিতবে এই প্রতিযোগিতায়।

ইউনূস মোসাদ্দেকের গোত্রের কসাই হারিস বিন বিল্লাল রেফারির দায়িত্ব পালন করবে। রেফারি সে এমন এক খেলার, যে-খেলায় আইন-কানুনের কোনও বালাই নেই।

গা থেকে শার্ট খুলে ফেলল রানা। হাত-পা নেড়ে একটু আগে ঘোড়া থেকে পড়ে ব্যথা পাওয়া পেশীগুলোর আড়ষ্টতা কাটিয়ে নিতে চেষ্টা করল।

ঠিক তখনই কসাই তার তলোয়ার তুলে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছাড়ল। শুরু হয়ে গেল খেলা।

দড়ির ছিলার মতো টান টান হয়ে ছিল অভিজ্ঞ আফগানদের স্নায়ু, চিৎকারটা শুনেই ছুটল তারা খাদের দিকে। সবার এক ফুট সামনে ঈগলের তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো ছুটছে সর্দার আহম্মদ আলী, তবে ক্ষিপ্র খরগোশের ছোটার সঙ্গে ব্যতিক্রম হলো, বাতাসে দীর্ঘ কালো দাড়ি উড়ছে তার। এক সেকেন্ড পর

দৌড়াতে শুরু করল রানা, দ্রুত গতি বাড়ছে ওর।

খাদের ভিতরটা মল্ল ও মুষ্টিযুদ্ধের একটা রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। সবাই চাইছে বাছুরটাকে তুলে নিতে। ঘুসোঘুসি চলছে হরদম, লাথি মারছে প্রতিপক্ষরা পরস্পরকে। এ ও পিছলে পড়ে ক্ষিপ্ত মানুষগুলোর পায়ের নীচে পিষ্ট হচ্ছে। সর্দার বলে আহম্মদ আলীও রক্ষা পাবে না, এ এমন এক খেলা। এক আফগান যুবক পেটে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে গুটিয়ে উঠে পড়ে গেল। আরেকজন বাছুরের পিছনের একটা পা ধরে ফেলেছে, প্রাণপণে টানতে শুরু করল সে। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল অন্য একজন, বাছুরটা তুলে নিল দু'হাতে, তারপর ল্যাং খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে-ও।

মাথাহীন বাছুরের ঘাড়ের শিরা থেকে ঝরঝর করে কালচে রক্ত পড়ছে।

কাঁধের ধাক্কায় দু'জনকে ঠেলে সরিয়ে বাছুরটা ধরতে গেল রানা, হুমড়ি খাওয়ায় রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল ওর বুক ও মুখ। সোজা হয়ে দাঁড়াল, এবার তুলে নেবে বাছুর, পর মুহূর্তে হাঁটুর পিছনে লাথি খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে আছাড় খেল ও।

লাথিটা ওকে মেরেছে আহম্মদ আলী। প্রচণ্ড ধাক্কায় সামনের লোকটাকে সরিয়ে, আরেকজনের ঘাড়ে গুঁতো দিয়ে বাছুরের কাছে পৌঁছে গেল সে, এক ঝটকায় বাছুরটা তুলে নিয়েই কাছে এক প্রতিপক্ষকে দেখে তার পেটে হাঁটুর খোঁচা বসিয়ে দিল। দু'হাতে শক্ত করে বাছুরটাকে ধরে খামচা-খামচির মধ্য দিয়ে খানিকটা টলতে টলতে নিজের ঘোড়াটার দিকে এগোল সে।

রানা এখনও পড়ে আছে মাটিতে, তবে আহম্মদ আলীর একটা গোড়ালি ধরে ফেলতে পারল ও। জোর টান দিল রানা গোড়ালি ধরে। বাছুর সহ ধড়াস করে পটকান খেল আহম্মদ আলী। দেরি না করে বাছুরের দখল পেতে হাঁচড়েপাঁচড়ে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে এগোল রানা। কে যেন ওর পিঠ মাড়িয়ে দিল।

আরেকজন ওর মাথায় পা বেধে হোঁচট খেল।

বাছুরের কাছে পৌঁছে গেছে রানা, তবে এক আফগান যুবক ওর আগেই বাছুর তুলে ছুটল ঘোড়ার দিকে। মুখ থেকে থুঃথুঃ করে বালি ফেলেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাছুর তুলে নিয়ে রওনা হয়ে যাওয়া আফগানের পিছনে ছুটতে শুরু করল রানা। ওর পাশে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজে শ্বাস ফেলে ছুটছে সর্দার আহম্মদ আলীও।

জিনের ওপর বাছুরটাকে তুলে ফেলেছে যুবক গেরিলা, এবার নিজে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। হুড়োহুড়ি করছে সে, জানে, দেরি করলে মহার্ঘ্য বস্তুটি হাতছাড়া হবার সমূহ সম্ভাবনা।

রানা যাতে ঘোড়াটার কাছে পৌঁছতে না পারে সেজন্য ওর কাঁধে জোরে ধাক্কা দিতে চেষ্টা করল আহম্মদ আলী। আশা করেছিল ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবে রানা, কিন্তু তার হাতটা এক হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে পাল্টা ধাক্কা মারল রানা আহম্মদ আলীর ঘাড়ে। ঘামে পিছলে গেল ওর হাত।

পাশ থেকে ছুটে ওদের আগেই বাছুরের আপাত-মালিক গেরিলার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আরেক আফগান যুবক, দু'হাতে তার কোমর ধরে তাকে ঠেলে ফেলে দিল রানা। দু'পাশ থেকে চেপে আসছে আরও দুই আফগান। মেরুদণ্ডের ওপর তাদের একজনের কিল খেয়ে ব্যথাটা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল রানা, ছোটার গতি কমাল না।

ওর সামান্য আগে পৌঁছল আহম্মদ আলী, যুবক গেরিলার কাঁধে দুই হাত রেখে চাপ দিয়ে তাকে বসে পড়তে বাধ্য করল, তারপর যুবকের দু'কাঁধে পা রেখে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ঘোড়াটায়। বসেই ঘোড়ার পাঁজরে গুঁতো দিল সে। আগে বাড়তে শুরু করল ঘোড়া।

বড়জোর আর মাত্র দু' ফুট দূরে আছে লোকটা, ভাবল ছুটন্ত রানা, কিন্তু ঘোড়া নিয়ে সরে পড়লে কিছুতেই ধরা যাবে না।

চিন্তাটা মাথায় আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল ও আহম্মদ আলীর কোমর লক্ষ্য করে।

পাশ থেকে রানা উড়ে এসে কাঁধ দিয়ে গুঁতো মারায় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল আহম্মদ আলী। পড়ল রানাও। ঘোড়াটা ছুট দিল সামনে।

রানার পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো বসিয়ে দিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে সওয়ারীবিহীন ঘোড়ার পিছনে ছুটল আফগান সর্দার। তার পিছনে ধাওয়া করে যাচ্ছে প্রতিযোগী অন্যান্য গেরিলারা। সামনেও একজন আছে।

জিনের ওপর থেকে পিছলে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল বাছুর, আগে যে ঘোড়ার কাছে পৌঁছল সে এক হাতের ধাক্কায় ওটাকে আবার জিনের ওপর তুলে দিল। কাজটা সেরেই দ্রুত জিনে উঠতে চেষ্টা করল সে। চোয়ালে ঘুসি খেয়ে ঘোড়ার ওপর থেকে মাটিতে পড়তে হলো তাকে। ঘুসিটা যে মেরেছে সে-ও কোমরে লাথি খেয়ে দু'ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল। শক্তিশালী হাতের ধাক্কায় দু'পাশের প্রতিযোগীদের দূরে ঠেলে বাছুরের কাছে চলে গেল আহম্মদ আলী, এক ঝটকায় চড়ে বসল জিনে, ছুটিয়ে দিল ঘোড়া।

অন্য সবার আগে দৌড়ে নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল রানা, জিনে উঠেই ধাওয়া করল আহম্মদ আলীর ঘোড়াটাকে। শুনতে পেল, গ্রামবাসীরা সর্দার আহম্মদ আলীর নামে প্রবল উৎসাহে চিৎকার দিচ্ছে।

পিছন থেকে ঘোড়সওয়ার আসছে টের পেয়ে বাছুরটাকে নিজের সামনে টেনে আনল আহম্মদ আলী। তার ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর রয়েছে এখন মৃত বাছুরের পেট, সামনে-পিছনের পাগুলো দু'পাশে ঝুলছে।

বাছুরের বাড়তি ওজনের কারণে আহম্মদ আলীর ঘোড়ার গতি অন্যগুলোর চেয়ে খানিকটা হলেও কমে গেছে। রানাই আগে পৌঁছতে পারল ওটার পাশে। কাত হয়ে বাছুরের সামনের দু'পা

ধরতে চেষ্টা করল ও। থাবড়া মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল আহম্মদ আলী।

আবার চেষ্টা করল রানা। এবার রাশ দিয়ে ওর হাতে বাড়ি মারল আফগান সর্দার, পরক্ষণেই মুখে চামড়ার তৈরি রাশের ঝাপটা খেল রানা।

গালের জ্বলুনি পাত্তা দিল না ও, তৃতীয়বার হাত বাড়াল আবার। এবার বাছুরের বদলে আহম্মদ আলীকে ধরাই ওর উদ্দেশ্য। লোকটার হাত ধরে এতো জোরে টান দিল ও, যে আরেকটু হলে ভারসাম্য হারিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছিল আহম্মদ আলী। পড়ি পড়ি করেও কোনওমতে সামলে নিল সে।

কিন্তু ততক্ষণে প্রচণ্ড এক টানে বাছুরের দখল চলে গেছে রানার কাছে। ওটা ওর ঘোড়ার পেটের একপাশে ঝুলছে। জিনের ওপর লাশটাকে ওঠাতে চেষ্টা করল ও। ওজনের কারণে একটু বেকায়দায় পড়ে যাওয়ায় সেকেন্ড তিনেকের জন্য অসতর্ক হয়ে পড়তে হলো ওকে। এরইমধ্যে রানার বাহুতে একটা ঘুসি মেরে বাছুরের অন্য পা দুটো ধরে ফেলল আহম্মদ আলী। পাশাপাশি ছুটছে এখন দুটো ঘোড়া, রানা ও আহম্মদ আলী, দু'জনই চেষ্টা করছে টান দিয়ে বাছুরটাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে তুলতে। প্রচণ্ড টান খেয়ে পেটের চামড়া-মাংস ছিঁড়তে শুরু করল মৃত জানোয়ারটার। পেট ফেঁসে গেল, বেরিয়ে পড়ছে তেলতেলে নাড়িভুঁড়ি।

মাঝখান থেকে না দু'টুকরো হয়ে যায়, টান না কমিয়ে ভাবল রানা।

দু'জনের লড়াইয়ের সুযোগে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছে পিছনে পড়ে যাওয়া অশ্বারোহী প্রতিযোগীরা। চারপাশ থেকে দু'জনকে প্রায় ঘিরে ফেলল তারা। এবার শুরু হলো ঘুসি, চড়, কিল ও ধাক্কার জোয়ার। রানা ও আহম্মদ আলী, দু'জনের কেউই রেহাই পাচ্ছে না। উত্তেজিত আফগান যুবকরা বাছুরটা কেড়ে

নিতে চেষ্টা করছে।

একটা ঘোড়া রানার বাম পায়ের পাশে জোর চাপ দিয়ে গেল। ব্যথায় রানার মনে হলো আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে, তবে বাছুর ছাড়ল না ও। কিন্তু আঙুলগুলো রক্তে পিছলা হয়ে গেছে, ওর হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে বাছুর। আরেকটা ঘোড়া রানার পায়ের ঠিক আগের জায়গাতেই ধাক্কা মারল। এবার বাছুর ধরে রাখতে পারল না রানা, হাত ছুটে গেল ওর। ওটা কেড়ে নিয়েছে আহম্মদ আলী।

উচ্ছৃঙ্খল আরোহীরা মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। বাছুর সহ মার্কার ঘুরল আহম্মদ আলী, তারপর ফিরতি পথে ছুটল। বারবার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে ঘোড়ার কাছ থেকে সর্বোচ্চ গতি আদায় করতে চাইছে সে।

ঝড়ের গতিতে মার্কার ঘুরল রানাও। ওর ডানপাশে দুই আফগানের ঘোড়ার মধ্যে সংঘর্ষ হলো, জিন থেকে খসে পড়ে গেল দু'জন আরোহীই। রানার সামনে এখন শুধু আহম্মদ আলী। পিছলা পা ধরে বাছুরটাকে জিনে তুলতে পারেনি সর্দার, কোনও রকমে ধরে আছে। জন্তুটার ঘাড়ের খানিকটা অংশ মাটিতে ছেঁচড়ে যাচ্ছে। পেট আরও ফাঁক হয়ে গেছে ওটার, লাল মাংস ও নাড়িভুঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

দূরত্ব কমছে সামনের ঘোড়াটার সঙ্গে রানার ঘোড়ার, পাশ থেকে ছুটে আসা এক আরোহীকে গতি কমিয়ে এড়াল ও, আরেকজন ঘোড়া দাবড়ে ওর সামনে চলে আসছিল, পিছন থেকে অন্য একটা ঘোড়ার গুঁতো খেয়ে দিক পাল্টাল তার ঘোড়া।

ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত রানা সিদ্ধান্ত নিল, আহম্মদ আলী জিতল কি না সেটা বড় ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপার সবার জানা যে, জেতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ও নিজে। সম্মান পেতে এটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত। বরং আহম্মদ আলী জিতলেই বোধহয় ভাল হয়, কারণ ও নিজে জিতলে মুখ থাকবে না বিখ্যাত আফগান সর্দারের,

ঘৃণা করবে হয়তো লোকটা ওকে, রাইফেল সে পাক বা না পাক।

রানার ঘোড়া চলে এসেছে আহম্মদ আলীর ঘোড়ার খানিকটা সামনে ও পাশে। বাছুরের পা ধরতে হাত বাড়াল রানা। আবার রাশটাকে চাবুকের মতো ব্যবহার করল আহম্মদ আলী।

রানার ঠোঁটে লাগল প্রথম আঘাত, দ্বিতীয়টা নাকের ডগায় – ওর মনে হলো ভীমরুল হুল ফুটিয়েছে। ঠোঁটের কোণে রক্তের নোনা স্বাদ পেয়ে মাথায় রক্ত উঠে গেল ওর। খপ করে আহম্মদ আলীর লম্বা দাড়ি মুঠো করে ধরল ও, গায়ের জোরে টান দিল। মনে মনে আশা করল, গোড়া থেকে তুলে আনতে পারবে অন্তত শতখানেক দাড়ি।

ওর আশা পূরণ হলো না, গোটা বিশেক কুচকুচে কালো ছেঁড়া দাড়ি হাতের মুঠোয় পেল ও, তবে বিকট এক চিৎকার ছাড়ল আহম্মদ আলী, বাছুর ছেড়ে দু'হাতে থুতনি চেপে ধরল। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রানার শরীরে, ঝট করে বাছুরটাকে আঁকড়ে ধরল ও, পিছনে ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেয়ে লাশটা তুলে ফেলল নিজের সামনে, জিনের ওপর, তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টে তুলে নিল ঘাড়ের পিছনে, দু'হাতে ধরে থাকল ওটার চারটে পা। ওর দু'কাঁধের ওপর লম্বালম্বি ভাবে আছে এখন মৃত বাছুর। ওজনের কারণে কুঁজো হয়ে গেল রানার পিঠ, রাশ তো ছেড়ে দিয়েছে খানিক আগেই, গোড়ালির খোঁচায় ঘোড়াটাকে ইশারায় জানাল কোন্‌দিকে যেতে হবে ওটাকে।

ওর দু'পাশে চলে এসেছে দু'জন ঘোড়সওয়ার, জিনের ওপর কাত হয়ে বাছুরটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে, তবে রানা ওটার চার পা শক্ত করে ধরে থাকায় সুবিধে করতে পারছে না।

সামনে চলে আসছে অগভীর খাদটা।

ডানপাশের আরোহী আহম্মদ আলী স্বয়ং। বাছুর ধরে রাখা রানার ডান হাত জোর এক টানে ছুটিয়ে ফেলল সে। বাছুরের পিছনের পা দুটো এখন তার দখলে।

বাম হাতে আরও জোরে সামনের পা দুটো চেপে ধরল রানা, ডান হাতে চেষ্টা করল আহম্মদ আলীর আক্রমণ রুখতে।

টান খেয়ে মৃত জানোয়ারটার পেটের চেরা আরও বেড়ে গেল, ভেজা-ভেজা নাড়িভুঁড়ি ঝুলঝুল করতে লাগল রানার বুক-পিঠের ওপর। রক্ত মেখে লাল হয়ে গেল রানা। এমন একটা আঁশটে দুর্গন্ধ নাকে এলো যে বমি করে দিতে ইচ্ছে হলো ওর।

ডান হাতে আহম্মদ আলীর বাড়ানো বাম হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলেই মোচড়াতে শুরু করল রানা। বুঝতে পারছে আরেকটু মুচড়ে দিলেই হাতের হাড় ভেঙে যাবে। তা-ও বাছুরের পা ছাড়ছে না আফগান সর্দার, এখনও চেষ্টা করছে ডান হাতে ওটা কেড়ে নিতে। পৌঁছে গেছে ওরা খাদের কাছে। ঘোড়া থামিয়ে আহম্মদ আলীর উল্টোদিক দিয়ে জিন থেকে পিছলে নেমে পড়ল রানা। এবার আফগান সর্দারকে কাঙ্ক্ষিত জিনিসের দখল ছাড়তেই হলো, নইলে ঘোড়ার ওপর থেকে আছাড় খেত সে। নেমেই বাছুর সহ লাফ দিয়ে খাদের মধ্যে নামল রানা, পিছলে গেল পা, আধ পাক ঘুরে চিত হয়ে পাথুরে মেঝেতে পড়ে গেল। ব্যথা লাগেনি, তবে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে ও। নিজের শ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ ওর কানে এলো না।

আসলেই চারপাশে একটু শব্দও নেই। খাদের প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়ানো খেলোয়াড়রা সবাই তাদের ঘোড়ার পিঠে পাথরের মূর্তির মতো নীরব। বিদেশি লোকটাকে তাদের শ্রদ্ধেয় সর্দার আহম্মদ আলীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতে যেতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে গ্রামবাসীরাও।

জ্বলন্ত কয়লার মতো গনগনে চোখে একদৃষ্টিতে রানাকে দেখছে আহম্মদ আলী তার ঘোড়ার পিঠে বসে। তারপর কর্কশ গলায় কী যেন বলে উঠল সে, রানার মনে হলো গালাগাল দিচ্ছে। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমেই ঝড়ের গতিতে খাদের মধ্যে চলে এলো আফগান সর্দার, শক্ত দু'হাতে রানার দু'কাঁধ ধরে এক টানে

দাঁড় করিয়ে ফেলল। আবার কড়া গলায় কী যেন বলল আহম্মদ আলী, পরক্ষণেই বুকে জড়িয়ে ধরল রানাকে, রানার রক্তাক্ত দু'গালে চপাচপ চুমু খেল দুটো। এবার আন্তরিক ভঙ্গিতে রানার ডান হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল সে জোরেশোরে।

রানা জানে, আফগান রীতি অনুযায়ী গালে চুমু খাওয়ার অর্থ সে যাকে চুমু খেয়েছে তার প্রতি সৎ থাকবে, আর করমর্দন আরও অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে, ওটার অর্থ: কথা দিচ্ছি, তোমাকে চিরদিন মনে রাখব আমি। বিপদে আমাকে পাশে পাবে।

গেরিলারা এতক্ষণে বুঝতে পারল বিদেশি লোকটার এই জিতে যাওয়াটা তাদের কোন্ দৃষ্টিতে দেখা উচিত। হই-হই শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অন্য খেলোয়াড়রা লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত এগিয়ে এসে একে একে রক্তাক্ত রানাকে আলিঙ্গন করল, দু'গালে চুমু খেয়ে হাত ঝাঁকিয়ে দিল। হাসছে সবাই। সর্দার আহম্মদ আলীর ভারী, কর্কশ গলার হাসির আওয়াজটা আর সবার হাসির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল। মিনিট তিনেকের প্রায়-একটানা হাসিটা থামলে ইউনূস মোসাদ্দেক ও আলফাজ কুশের দিকে এগিয়ে গেল সে, রানাকে দেখিয়ে কী যেন বলল।

উত্তেজিত স্বরে আলাপ করতে করতে গাছের ভিতর দিয়ে নিজেদের বসতির দিকে ফিরতে শুরু করল দুর্দান্ত প্রতিযোগিতা দেখে তৃপ্ত গ্রামবাসী। ক্লান্ত প্রতিযোগীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাদের ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোকে দলাইমলাই করতে।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল ফারা রাইনার, রানাকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরাল। মৃদু মৃদু হাসছে মেয়েটা। তারপর বলল, 'আহম্মদ আলী বলেছে কোনও আমেরিকান গুপ্তচরের বাপেরও সাধ্য নেই তাকে বুযকাশিতে হারায়, কাজেই এখন সে নিশ্চিত ভাবে জানে, তুমি কিছুতেই শত্রুপক্ষের লোক হতে পারো না।' চিন্তিত চেহারায় রানার দিকে তাকাল ফারা। 'মানুষের চরিত্র ভাল বোঝো তুমি।'

'মানে?' বুক ভরে সস্তা সিগারেটের ধোঁয়া টানল পরিশ্রান্ত রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল ফারা। 'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তুমি হারলেই ভাল করবে।'

'আমিও কিছুক্ষণের জন্যে তাই ভাবছিলাম,' স্বীকার করল রানা।

'কিন্তু হেরে যাওয়া তোমার চরিত্রে নেই।' রানার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জঙ্গলের ওধারের গোপন বসতির দিকটায় তাকাল ফারা। 'ওরা, আফগানরা মানুষ চেনে, বোঝে কে জীবনের বিনিময়ে হলেও জিততে চেষ্টা করবে, কার অন্তরে ভণিতা নেই। যদি ইচ্ছে করে হারতে, তা হলে ওদের তুমি বোকা বানাতে পারতে না। সর্দার আহম্মদ আলী তোমাকে ঘৃণা করত তোমার কাপুরুষতার জন্যে। হেরে গেলেও তার গর্ব তাকে এখন তোমার প্রশংসা করতে বাধ্য করছে। একটু আগেই বলল, তাকে যে হারাতে পারে সে সাধারণ মানুষ হতে পারে না। এ-কথা বলার মাধ্যমে নিজেকেও সে সাধারণ থেকে আলাদা হিসেবে উপস্থাপন করল। একজন বিজয়ী নতুন আরেকজন বিজয়ীকে মেনে নিয়েছে, ব্যাপারটা সবাই এভাবেই দেখবে।'

হাসল রানা। 'তুমি দেখছি মানুষের মনের গভীরে কী আছে সেটাও বলে ফেলছ গড়গড় করে, বিশ্লেষণ করছ কেন কে কী করছে। তুমিই আসল মানব-চরিত্র বিশ্লেষক, আমি নই।'

'আমি অনেকদিন ধরে ওদের মাঝে আছি,' বিনয় করল না ফারা। 'ক্লিনিকে এসো, তোমার কাটা-ছেঁড়াগুলো ডিসইনফেক্ট করতে হবে।'

'একটা জরুরি কাজ করে তারপর আসছি,' আরেক টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল রানা।

'জরুরি কাজটা কী?' বিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠল ফারা রাইনারের।

'আমাকে যে-ঘোড়াটা দেয়া হয়েছিল ওটার দেখভাল করতে হবে আমাকে।' হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে অগভীর খাদের বাইরে পা বাড়াল ক্লান্ত রানা, ঘোড়াগুলোর দিকে হাঁটছে।

ঘোড়ার গা থেকে কাপড় দিয়ে ঘাম মুছতে দেখে প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল গেরিলারা, শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে রানাও ওদেরই মতো সত্যিকারের একজন পুরুষমানুষ।

ঘোড়ার পরিচর্যা শেষে আধঘণ্টা পর গুহার ভিতরে ঢুকল রানা। গতকালকের সেই আহত লোকটা মারা গেছে, কবর দেয়া হবে তাকে একটু পর। তার পরিত্যক্ত বিছানায় পড়ে আছে গোটা মুখমণ্ডল পুড়ে ফোস্কা পড়ে যাওয়া এক কিশোর ছেলে। অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে সে সর্বক্ষণ। তিক্ত একটা অনুভূতি হলো রানার।

ওর দিকে এগিয়ে এলো ফারা রাইনার, তার হাতে একটা পানি ভর্তি বালতি ও পরিষ্কার গামছা। মেঝেতে বালতি নামিয়ে হাতের ইশারায় একটা পর্দা দেখাল সে। 'ওটার ওপাশে গিয়ে গোসল সেরে নাও। পরিষ্কার কাপড় পাবে ওখানে। তোমার রক্তমাখা কাপড়গুলো জলদি এখান থেকে বের করে ধুতে দিতে হবে, নইলে গন্ধে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে আমার রোগীরা।'

'এতোটাই খারাপ গন্ধ?' একটু অবাকই হলো রানা। 'আমি বোধহয় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফারা। 'মানুষ সময়ে সবকিছুতেই অভ্যস্ত হতে পারে।'

চট্‌ করে একবার ঝলসানো মুখের ছেলেটার দিকে তাকাল রানা, তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, 'সবকিছুতে নয়।'

পর্দার এপাশে চলে এলো ও, আবার যখন ফিরল, ওর শরীরের ছোটখাটো কাটাছেঁড়াগুলো পরিষ্কার করে ডিসইনফেকট্যান্ট লাগিয়ে দিল ফারা।

'ক্ষতগুলো কালকেই শুকাতে শুরু করবে,' বলল সে। 'পরে

আর দাগও খুঁজে পাবে না।' রানার চোখের দিকে তাকাল। 'কে তুমি আসলে? এতো ক্ষতচিহ্ন কেন তোমার সারা শরীরে?'

'এমন একজন মানুষ, যে সবসময় শান্তি খুঁজছে,' বিষণ্ন দেখাল রানার হাসিটা, 'কিন্তু পাচ্ছে না।'

'অর্থাৎ উল্টোটা জুটেছে তোমার কপালে,' বলল ফারা। 'আমরা সবাই তো শান্তিই খুঁজি।'

পাথরের মেঝেতে কাঠ ঠুকবার আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাল রানা। ডান পা নেই যুবকের, দু' হাতে দুটো লাঠি ঠুকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে।

'মর্টারের গোলায় পা হারিয়েছিল ও,' বলল ফারা। 'এখন ও মাইন ডিটেক্টরের কাজ করে।'

কথাটা শুনে থমকে গেল রানা। 'মানে?'

'ক্রল করে মাইন ফিল্ডের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যোদ্ধাদের জন্যে নিরাপদ পথ খোঁজে ও,' জানাল ফারা। 'ওর কাছে জীবনের আর কোনও অর্থ নেই, দেশের মুক্তির জন্যে লড়তে পারবে না ও কখনও আর, কাজেই জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আপত্তি নেই, ও এটা ভেবে খুশি যে, দেশের জন্যে যারা কিছু করতে পারবে তাদের নিরাপত্তার জন্যে ও কিছু করতে পারছে। অন্য সব আফগানের মতোই ওরও বুকে দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব নেই, কিন্তু ওর ধারণা, প্রাণ ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই ওর।'

নীরবে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো রানা, তিক্ত হয়ে আছে মনটা। এটাই হয়তো স্বাভাবিক যে শক্তিশালীরা দুর্বলের ওপর যেমন খুশি অত্যাচার করবে, তবুও মন থেকে ব্যাপারটা মেনে নেয়া যায় না। জঙ্গলের দিকে তাকাল ও, দেখল পাইনের জংলা পথে এগিয়ে আসছে ঈসা আজনবী। তার পিছনে এবার দেখা গেল তিন আফগান যোদ্ধাকে, মাল বোঝাই দুটো ঘোড়া টেনে আনছে তারা।

ঈসা আজনবী ফিরেছে খবরটা চাউর হয়ে গেছে, ছোট

দলটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল গ্রামবাসী, মালবাহী ঘোড়া থেকে কাঠের ক্রেটগুলো নামাতে শুরু করল ব্যস্ত হয়ে। তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেল সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক, আলফাজ কুশে ও আহম্মদ আলী। তলোয়ারের খোঁচায় চামড়ার ফিতে ছিঁড়ে একটা ক্রেট খুলল আহম্মদ আলী, সামান্য ঝুঁকল ভিতরে কী আছে দেখতে, তারপর একটা ঝকঝকে নতুন এম-১৬ রাইফেল তুলে নিয়ে ঘুরে তাকাল গুহার দিকে। জানে, ওখানে রানা আছে। রানাকে গুহার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাতের রাইফেলটা উঁচু করে ধরল সে।

রানার পাশ থেকে ফারা রাইনার বলল, 'এবার তোমার বন্ধুকে খুঁজে বের করতে সাহায্য ওরা করবেই।' এই মাত্র গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

সাত

তীব্র আলো ভরা পাথুরে, চৌকো ঘরটার এক কোণে পড়ে আছে রক্তাক্ত সোহেল। সামান্য নড়লেও অসহ্য ব্যথায় কাতরে উঠতে হচ্ছে ওকে, তাই নড়ছে না।

শেষবার প্রস্রাব করার সময় রক্ত বেরিয়েছে। তলপেটে কিছু বোধহয় জখম হয়েছে, আচ্ছন্ন অবস্থায় ভেবেছে ও। সমস্ত আশা শেষ হয়ে গেছে ওর মন থেকে। ক্ষীণ আশাটুকুও নেই যে কারও কাছ থেকে সাহায্য পাবে। ও নিখোঁজ সে-খবর নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে বিসিআইতে। কিন্তু কেউ জানে না ও কোথায়, বেঁচে আছে কি না; এখানে, এই অচেনা দুর্গে বন্দি হয়ে আছে, সেটা জানা

তো দূরের কথা। বারবার বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে আর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে ওর বুক চিরে। কার ওপর যেন অভিমান হচ্ছে। কার ওপর, ও জানে না। রানা, সলীল, জাহেদ – ওরা যদি জানত ও এখানে বন্দি তা হলে নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও ওকে উদ্ধার করতে আসত। কিন্তু জানে না ওরা। রাহাত খান যদি জানতেন, তা হলে তিনি... অন্তহীন গভীর কালো, মায়াভরা দুটো চোখের কথা আবারও মনে পড়ল ওর। রানা। রানা যদি জানত এখানে ও এভাবে... দুনিয়ার অপরপ্রান্তে থাকলেও তো ছুটে আসত রানা। কেউ ঠেকাতে পারত না ওকে। রানা বোধহয় বিদেশে। ভাল হয়েছে ও জানে না, নইলে সব বাধা অগ্রাহ্য করে চলে আসত। ...আর এলে মরতে হতো ওকেও। চাপা কান্না আটকে হাসার চেষ্টা করল সোহেল, ফাটা ঠোঁটে টান পড়ায় একটু ফুঁপিয়ে উঠল। দুর্বল, অস্ফুট স্বরে বলল, 'দোস্ত, খুব ব্যথা লাগছে, রে!' বলতে গিয়ে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল ওর চোখের কোণ বেয়ে।

দরজা খোলার ধাতব আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে তাকাল ও, মনটাকে শক্ত করল। মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেল কঠোর তিরস্কারের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, কাঁচা-পাকা এক জোড়া কোঁচকানো ভ্রূ। তীব্র ব্যথা সহ্য করেও অল্প একটু নড়াল সোহেল ওর মাথা; আবার শুরু হবে ইন্টারোগেশনের নামে নিষ্ঠুর নির্যাতন, পাশবিক অত্যাচার; কিন্তু মুখ খুলবে না ও, কিছুতেই না। নিজের দেশকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। ভাল হতো যদি একেবারে মেরে ফেলত লোকগুলো ওকে।

কর্নেল হেনরি মর্গান, সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম ঢুকল ঘরে। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন সৈনিকও আছে। সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম সোহেলকে ছেঁচড়ে কোনা থেকে সরাতেই সৈনিকরা প্রায় ঘিরে দাঁড়াল ওকে। মেঝেতে পড়ে আছে বলে তাদেরকে পাহাড়-সমান উঁচু মনে হলো সোহেলের।

'ভাবছ কেউ তোমাকে সাহায্য করবে? কেউ তোমাকে উদ্ধার

করতে আসবে না,' কর্কশ গলাটা ছাড়ল কর্নেল হেনরি মর্গান। মুখটা রাগে টকটকে লাল হয়ে আছে তার। 'আমরা কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জানে না তোমার কথা। বুঝতেই পারছ, আমাদের ওপর নির্ভর করছে তোমার বাঁচা-মরা। তুমি এখানে আমাদের খাতিরে মজায় আছ জানলেও কিছুই করতে পারত না তোমার দেশের সরকার।'

লোকটার নিষ্ঠুর ঘোলাটে সাদা চোখ থেকে ঝাপসা দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল সোহেল। ঠিকই বলেছে লোকটা, বাংলাদেশের সরকার... বুকের ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা লাগল ওর। কেন ওরা কাউকে পাঠাতে যাবে... খুব ক্ষুদ্র মনে হলো নিজেকে... কী এমন দাম ওর!

'ধরা পড়ে বিরাট একটা সুযোগ করে দিয়েছ আমাকে তুমি,' আবার বলল মর্গান। 'এই জঘন্য দেশটা থেকে বেরিয়ে যেতে চাই আমি, কীভাবে তা সম্ভব তোমাকে সেটা বলেছি। আরেকবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, কেন এসেছ তুমি, কাদের সঙ্গে দেখা করেছ; আর কে কে এসেছে তোমার সঙ্গে – সব বলো। কষ্ট থেকে রেহাই পাবে।'

চুপ করে থাকল সোহেল।

'সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম!' খেঁকিয়ে উঠল কর্নেল মর্গান।

সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম সোহেলের পেটে কষে একটা লাথি মারল।

'কেন এসেছ? কে তুমি? সঙ্গে আর কয়জন এসেছে?' গলা চড়ছে কর্নেল মর্গানের।

'ভুল করে চলে এসেছি,' ইলেকট্রিক শকের মতো ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ছে পেটের চারপাশে, ঘোরের মধ্যে বলল সোহেল। 'সীমান্ত পেরোতে চাইনি। ভুল করে...' পেটে আরেকটা লাথি খেয়ে কুঁকড়ে গেল ও।

'সত্যি কথা বলো। মিথ্যে বলছ। কেন এসেছ? সঙ্গে আর কয়জন আছে?'

'কেউ নেই। আমি...আমি সত্যি বলছি।' জড়ানো গলায় আওড়াল সোহেল।

'তুমি জেএমবির সদস্য। নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছ তালেবানদের সঙ্গে? তাদের ঘাঁটি কোথায়? কয়জন ঢুকেছ তোমরা আফগানিস্তানে?'

'জানি না। ভুল করে...'

তলপেটে আরও একটা লাথি খেল সোহেল। সঙ্গে সঙ্গে বমি করে দিল। সামান্য একটু লালা বের হলো শুধু।

'হারামজাদা মিথ্যুক! বল্!'

চুপ করে পড়ে থাকল অর্ধঅচেতন সোহেল, মাথার ভিতরটা পুরোপুরি ফাঁকা ঠেকছে ওর।

'আমার সময় নষ্ট করছ তুমি, সেই সঙ্গে আমার বুদ্ধিকে অপমান করছ,' খানিকটা সামলে নিয়ে বলল কর্নেল মর্গান। 'গতকালই দু' দুটো হেলিকপ্টার গানশিপ ফেলে দেয়া হয়েছে, মারা গেছে ওগুলোর সব ক'জন ক্রু। আমার সেক্টরে আগে কখনও এরকম ঘটনা ঘটেনি। তুমি কি ভাবছ তোমার আফগানিস্তানে আসা আর ওই গানশিপ দুটোর ওপর আক্রমণকে আমি কাকতালীয় ঘটনা মনে করব? এদিকের গোত্রগুলো আমাদের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে, সেটা তুমি ভাল করেই জানো। আহম্মদ আলী, ইউনূস মোসাদ্দেক, আলফাজ কুশে তাদের লোকজন নিয়ে কোথায় জড় হবে? তুমি তো জেএমবি, তোমরা তো এদেরই অস্ত্র সরবরাহ করতে আসছিলে। কোথায় ওদের ক্যাম্প?'

এবার কিছু জানে না বলেই চুপ করে থাকল সোহেল, তারপর মুখে সার্জেন্ট ট্রিসট্রিমের ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারাল।

'যাহ্, অজ্ঞান হয়ে গেল কালো কুত্তার বাচ্চাটা,' সিধে হয়ে দাঁড়াল সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম।

'জ্ঞান ফিরলে আমাকে খবর দিয়ো,' ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল মর্গান। 'ওর মুখ খোলাতেই হবে। জানোই তো, বর্বরগুলোকে

ঠেকাতে না পারলে ধুলোয় মিশে যাবে আমার সুনাম।'

মেঝেতে পা ঠুকল সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম। 'ইয়েস সার!'

কর্নেল মর্গানের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল সোহেলকে ঘিরে দাঁড়ানো নির্বাক সৈনিকরা। তাদের দু'-একজন খুব মজা পেয়েছে কালো সাব-হিউম্যানটার ওপর কর্নেলের ইন্টারোগেশনের পদ্ধতি দেখে। কিন্তু মানবতাবোধ এখনও মরে যায়নি এমন মেরিনের সংখ্যাই বেশি, তাদের ঘৃণা ধরে গেছে কর্নেল হেনরি মর্গানের ওপর, পিশাচটার লাশে জুতো ঠেকাতেও বাধবে তাদের। সার্জেন্ট ট্রিসট্রিমকে তাদের অনেকে নীচ একটা পশু বলেও মানতে পারছে না। পশুও বুঝি এর চেয়ে ভাল। কিন্তু উপরওয়ালার বিরুদ্ধে কিছু করবার নেই তাদের।

বসতির কিনারায় পাইনগাছের জঙ্গলের ধারে বসে আছে রানা। ডুবন্ত সূর্যের লালচে আলো গায়ে মেখে চিকচিক করছে পাইনের সবুজ পাতা। অস্থির লাগছে ওর। বারবার জিজ্ঞেস করার পরেও সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক সোহেল কোথায় আছে বলছে না, সময় হলে জানাব বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। সোহেলের হদিশ জানতে হবে ওকে, তারপর ভেবে বের করতে হবে কীভাবে ওকে উদ্ধার করা যায়। উদ্ধার করলেই হবে না, আফগানিস্তান থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যেতে হবে ওকে। কাজটা হয়তো সম্ভব, যদি আফগানরা সত্যিই সাহায্য করে। একটু আগে রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চারটা পরিষ্কার করেছে রানা। তৃতীয়বার পরীক্ষা করে দেখেছে বিস্ফোরকের ক্রেট।

বিয়ের অনুষ্ঠানটা শুরু হবে যে-কোনও সময়। বসতির সবাই তাদের সেরা পোশাক পরেছে। মহিলারা বাক্স থেকে বের করেছে তাদের সযত্নে তুলে রাখা কারুকার্য খচিত বোরকা। সরু কাঠি দিয়ে চোখের পাতার ওপরে লাল, সবুজ বা নীল কালি মেখেছে পুরুষরা। অনেকেই তাদের আলখেল্লায় রঙ-চঙা ফুল গুঁজেছে।

কয়েকজন বাজনদার হালকা, চটুল সুরে বাজনা বাজাচ্ছে। কালো একটা বাক্স, দেখতে অনেকটা যেন হারমোনিয়াম, ওটা থেকে উঁচু স্বরের অ্যাকর্ডিয়নের মতো সুর বের হচ্ছে। ধাতব একটা লম্বা, সরু তারের যন্ত্র ম্যান্ডোলিনের মতো আওয়াজ করছে। মৃদু ভাবে তাল দিচ্ছে ঢাক।

দরিদ্র মানুষগুলোর অল্প যা কিছু আছে, তা দিয়ে সেরা রান্না রাঁধা হয়েছে বিয়ে উপলক্ষে। কারি, খাসির মাংস ও ভাতের গন্ধে অল্প অল্প খিদে লাগতে শুরু করল রানার।

ওর পাশে এসে বসল ঈসা আজনবী, খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'জীবনের কী অর্থ, কখনও কখনও বুঝতে পারি না। কেউ হয়তো সকালে বিয়ে করল, তারপর বিকেলেই মারা গেল। আসলে যুদ্ধ মানুষকে তাড়াহুড়ো করতে বাধ্য করে। অনেকগুলো বছর যেন পেরিয়ে যায় মাত্র একটা দিনে।'

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন কাছে চলে আসছে। সতর্ক হয়ে উঠল রানা, রাইফেলটা তুলে নিল হাতে।

বসতির মধ্যে এসে ঢুকল একজন অশ্বারোহী, ঘোড়া থামিয়ে লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল সে ইউনূস মোসাদ্দেকের দিকে। সর্দারের সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। লোকটার পরনে মিলিটারিদের ইউনিফর্ম।

উঠে দাঁড়াল রানা, ওদিকে পা বাড়িয়ে ঈসার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'লোকটা হামিদ কারযাইয়ের সরকারী বাহিনীর সৈনিক না?'

'হ্যাঁ,' রানার পাশে হাঁটছে ঈসা। 'একইসঙ্গে ও সর্দারের গুপ্তচরও। এখানে এসেছে বলে আর ফিরতে পারবে না ও, কিন্তু যা বলছে তাতে এই ক্ষতিটা খুব বেশি না।'

'কী বলছে?'

'আগামীকাল আমেরিকান ফোর্স এই এলাকায় একটা আর্মার্ড কলাম পাঠাবে।'

খবরটা ছড়িয়ে গেছে।

মহিলারা উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত, কিন্তু পুরুষদের মাঝে উদ্বেগের কোনও প্রকাশ নেই। মানসিক ভাবে তারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। বিয়েটা দ্রুত পড়িয়ে দেয়া হলো। নববিবাহিত দম্পতি একটা রাত অন্তত পরস্পরের সঙ্গ পাক, সেটাই উদ্দেশ্য।

সূর্য ডুবে গেছে, আগুন জ্বালানো হয়েছে। পুরুষরা এখন বিয়ের উপলক্ষে নাচছে না, নাচতে শুরু করেছে তারা যুদ্ধের উন্মাদনায়। আগুনের আভায় মাটিতে দীর্ঘ ছায়া পড়ছে তাদের। সেতার ও ঢাক যুদ্ধের বার্তা জানাচ্ছে দ্রুত লয়ে।

ইউনূস মোসাদ্দেকের গুপ্তচর এখানে আসবার আগে অন্যান্য গ্রামেও খবরটা দিয়ে এসেছে। আসতে শুরু করেছে সর্দার আলফাজ কুশে ও আহম্মদ আলীর লোকজন। সবাই তারা সশস্ত্র। আগুনের ধারে বসে অন্তত একশোজন আফগান যোদ্ধা তাদের অস্ত্র পরীক্ষা করে দেখছে। অনেকে ব্যস্ত তাদের ঘোড়ার পরিচর্যায়। একটা গুহার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে যোদ্ধাদের দেখছে বাচ্চারা। মহিলারা হাত লাগিয়েছে তাদের স্বামীদের সাহায্য করতে।

একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক, আলফাজ কুশে ও আহম্মদ আলী। তর্ক করছে তারা, বোধহয় কোনও বিষয়েই একমত হতে পারছে না কেউ কারও সঙ্গে।

কাছেই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঈসাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কী নিয়ে তর্ক করছে ওরা?'

'যুদ্ধ,' বলল ঈসা। 'কে যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেবে, কে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করবে – এসব নিয়ে মতবিরোধ হচ্ছে। তিনজনই মনে করছেন তিনি অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিমান, ভাবছেন তাঁর পরিকল্পনা অন্যদের চেয়ে অনেক ভাল। ধারণা করছেন, আল্লাহ্ চান, তিনিই এই যুদ্ধ পরিচালনা করুন।'

'নিজেদের মধ্যে এসব বিষয়ে মতবিরোধ থাকলে মরবে

সবাই,’ মন্তব্য করল গম্ভীর রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল ঈসা। ‘সবসময় মতপার্থক্য হয় এঁদের মধ্যে। গোত্রগুলোর অভ্যন্তরীণ বিরোধও বলতে পারেন। আফগানিস্তানে প্রতিটা গোত্র অন্যদের চেয়ে বেশি মর্যাদা চায়, গোত্রপতিরাও নিজেদের সেরা মনে করে, ফলে শেষ পর্যন্ত একতা থাকে না গোত্রগুলোর মধ্যে। যে-যার আলাদা পথে এগিয়ে যায়।’

তিন সর্দার চোখ গরম করে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। দৃষ্টির লড়াই হচ্ছে তাদের ক্ষণে ক্ষণে।

‘এরকম চলতে থাকলে আমেরিকানদের কাছে হেরে ভূত হয়ে যাবে সবাই,’ তাদের আচরণ লক্ষ করে বলল রানা।

আলফাজ কুশে জোরে জোরে মাথা দোলাল, তারপর হাঁটা দিল, রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকেই আসছে। ইউনূস মোসাদ্দেক ও আহম্মদ আলী তাকে অনুসরণ করল। দু’জনই তারা নিজেদের যুক্তিই যে সেরা তা নিয়ে তর্ক করছে এখনও, তবে মনে হলো কোনও একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে। কাছাকাছি এসে আগুনের আভায় রানাকে দেখে থামল তারা। ইউনূস মোসাদ্দেক বলে উঠল, ‘আপনি আমাদের সঙ্গে লড়ছেন।’

‘না,’ আপত্তি করল রানা। ‘লড়তে নয়, আমি এখানে এসেছি আমার বন্ধুকে উদ্ধার করতে।’

‘ওটা পরে হবে,’ বলল আলফাজ কুশে। ‘আমাদের আস্তানাগুলো চিনে ফেলার আগেই আমেরিকান বাহিনীকে ঠেকাতে হবে যে-করে হোক।’

‘আর আমার বন্ধুকে উদ্ধার করার ব্যাপারটা কী হবে?’ রাগ সামলে জিজ্ঞেস করল রানা। ‘বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও আপনারা বলছেন না ও কোথায় বন্দি।’

‘আগে নিজেদের সাহায্য করব আমরা, তারপর আপনাকে,’ বলল আহম্মদ আলী। রানা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে তার আরও কথা আছে বোঝাতে ডান হাত তুলল সে। ‘আমাদের

তিনটা গোত্রে লড়াই করার মতো কমবেশি বারোশো যুবক আছে। কিন্তু তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিরাট এলাকা জুড়ে, খবরও পায়নি এদিকে আসবে আর্মার্ড কলাম। সময় মতো আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেয়া সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে। এখানে আমাদের যে ক'জন আছে, তাদেরই লড়তে হবে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে। আমরা যদি এই সর্বাত্মক লড়াইয়ে হেরে যাই, তা হলে আপনার বন্ধু যেখানে আছে, সেখানে আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একজনও বেঁচে থাকবে না।'

চোখ সরু করে রানাকে দেখল আলফাজ কুশে। 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, না কাপুরুষের মতো লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ দেখবেন?'

আবার সেই একই ব্যাপার, ওর সাহস নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে, ভাবল রানা। কৌশলটা কাজে দেয়, স্বীকার করতে বাধ্য হলো ও। এটা আফগানিস্তান, এখানে প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহসের প্রমাণ না রাখলে বাচ্চা ছেলেও তাচ্ছিল্য করবে, নিচু চোখে দেখবে কাপুরুষটাকে।

তার মানেই যে-অবস্থান থেকে ও শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে যেতে হবে ওকে। কোনও কাপুরুষকে সাহায্য করবে না আফগান কোনও সর্দার, সে নিজের ছেলে হলেও নয়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল রানা, 'কোথায় আক্রমণ করবেন ভাবছেন আপনারা?'

'এখান থেকে বিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে একটা পাথুরে উপত্যকা আছে, ওখানে,' জানাল আহম্মদ আলী। 'একমাত্র ওদিক দিয়েই এই এলাকায় আসতে পারবে আর্মার্ড কলাম। আমরা যেখানে হামলা করব ঠিক করেছি, ওখানে আক্রমণ হলে আমেরিকানরা সহজে বুঝতে পারবে না আসলে আমাদের ঘাঁটিগুলো কোথায়।'

'ক'টার দিকে আসবে আমেরিকান আর্মার্ড কলাম?'

'আমার লোক বলেছে ওরা আসবে সকাল সাতটার পর,' জানাল ইউনূস মোসাদ্দেক।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'ভোর হবার দু'ঘণ্টা আগে ওখানে পৌঁছতে চাই আমি, রাত তিনটার আগে। সঙ্গে ছয়জন লোক লাগবে। যদি মনে করি জায়গাটা উপযুক্ত, তা হলে ওখানেই হামলা করব আমরা, নইলে নতুন কোনও যুৎসই জায়গা বেছে নেব।'

মাথা নাড়ল আহম্মদ আলী। 'না, আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। আর, হামলা কোথায় হবে সেটা আমরা ঠিক করে ফেলেছি।'

'হয় আমাকে নিজের মতো কাজ করতে দেবেন, নইলে এই অসম লড়াইয়ে বোকার মতো নিজেকে জড়াব না আমি,' শান্ত স্বরে বলল রানা, তবে ওর কণ্ঠে প্রবল ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেল, দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ একটা ভাব থাকল ওর বলার ভঙ্গিতে।

থমকে গিয়ে ওকে দেখল তিন আফগান সর্দার। বিদেশি কেউ তাদের সঙ্গে এভাবে এই সুরে কথা বলবে কখনও, বলতে পারবে, তা তাদের ধারণায় ছিল না। নিজেদের মধ্যে বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় হলো তাদের।

রূপালী দাড়িগুলো হাতড়াল চিন্তিত আহম্মদ আলী, হয়তো তার মনে পড়ল বুযকাশি খেলবার কথা, দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠা পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক – আস্তে করে মাথা দোলাল সে। আপত্তি করল না আলফাজ কুশে বা ইউনূস মোসাদ্দেকও।

রাতের খাবারের পালা চুকলে ঈসা আজনবীর পরামর্শে চার ঘণ্টা বিশ্রাম নিল রানা, রাত ঠিক বারোটায় তিন সর্দারের বাছাই করা পাঁচ আফগান যোদ্ধার সঙ্গে সেই উপত্যকার উদ্দেশে রওনা হলো। ও কীভাবে কী করে সরেজমিনে দেখতে ইউনূস মোসাদ্দেক ও আহম্মদ আলীর তরফ থেকে সর্দার আলফাজ কুশেও চলেছে রানার সঙ্গে। কেউ কিছু না বললেও জুটে গেল

ঈসা আজনবী। বিদেশি জুলুমবাজদের সঙ্গে লড়াইয়ের সুযোগ হাতছাড়া করতে কিছুতেই রাজি নয় সে। রানাও আপত্তি করেনি। লোকটাকে ওর দরকার হবে।

পাহাড়ি পথ, কখনও গেছে টিলার কাঁধ বেয়ে, কখনও ঢেউ খেলানো পাথুরে সমতল দিয়ে। চাঁদের আলোয় পথ চলছে ওরা আটজন। তরুণ এক গেরিলা পথ দেখাচ্ছে। আগে আগে চলেছে সে। পথ দুর্গম বলেই ঘোড়ায় চড়েও পাক্কা পৌনে তিন ঘণ্টা লাগল ওদের নির্দিষ্ট সেই উপত্যকায় পৌঁছতে।

রাশ টেনে ঘোড়াটা থামিয়ে টিলার কিনারা থেকে নীচের পাথুরে উপত্যকাটা দেখল রানা। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে বালি, বড় বড় পাথরের খণ্ডগুলোকে মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড করোটি।

আলফাজ কুশের পাশে ঘোড়া থামিয়েছে ঈসা আজনবী, নীরবতা ভেঙে সে বলে উঠল, 'জায়গাটার নাম *বেদনার উপত্যকা*।'

চাঁদের আলোয় ডানদিকে, উপত্যকায় ঢুকবার সরু, লম্বা গিরিপথটা দেখতে পেল রানা। ওটার মুখ চওড়া হয়ে মিশে গেছে উপত্যকায়। গিরিপথের দু'পাশে মাথা তুলেছে উঁচু, ন্যাড়া, লম্বাটে পাথুরে টিলা। গিরিপথ যেখানে উপত্যকায় মিশেছে, সেখানে আক্রমণ হলে অসুবিধেয় পড়ে যাবে শত্রুপক্ষ। গিরিপথের দু'ধারের টিলাগুলো দেখাল রানা। 'ওখানে চার্জ বসাব আমরা।'

জায়গাটা কয়েক সেকেন্ড দেখে নিয়ে আস্তে করে সম্মতিসূচক মাথা দোলাল আলফাজ কুশে। 'আপনি যা ভাল বোঝেন।'

শেষরাত বলে আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে আসছে আঁধার, এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় না, তবে উজ্জ্বলতা কমছে চাঁদ ও নক্ষত্রগুলোর। গিরিপথের গা ঘেঁষে থাকা বামদিকের টিলার ওপর চলে এলো ওরা। ঘোড়ার পিছন থেকে সি-ফোরের একটা চৌকো বাক্স নামাল রানা, আলো আরেকটু বাড়া পর্যন্ত

অপেক্ষা করল, ভাল মতো দেখল গিরিপথের দু'ধার, তারপর বিস্ফোরক তৈরি করতে শুরু করল। ধাতব টিউবের ভিতর সি-ফোর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ভরছে ও, প্রতিটায় ইলেকট্রনিক ডেটোনেটর ঢোকাচ্ছে, ওগুলোর সঙ্গে সংযোগ দিচ্ছে ব্যাটারি চালিত খুদে রেডিও রিসিভারের। কাজটা হয়ে গেলেই টিউবের মুখ আটকে দিচ্ছে শক্ত করে।

'ঈসা, ওদের বলুন এগুলো এমন ভাবে বয়ে নিয়ে যেতে, যেন পাতলা কাঁচের ভঙ্গুর কিছু ধরছে,' কাজ শেষে বলল ও। 'অসাবধান হলে তার খুলে যেতে পারে। বিস্ফোরিতও হতে পারে বোমাগুলো।'

'ওরা আপনার কথা মতোই কাজ করবে,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল ঈসা। 'যুদ্ধ করে মরতে চায় ওরা, যুদ্ধের আগে নয়।'

'মরার চিন্তা বাদ দিতে বলুন ওদের, অনেক কাজ পড়ে আছে,' কড়া শোনাল রানার গলা। গিরিপথের দু'দিকের টিলা ও উপত্যকার নির্দিষ্ট জায়গাগুলো দেখাতে শুরু করল ও। 'ওদের বলবেন টিউবগুলো যেন গর্তের মধ্যে যতটা পারে গভীরে রাখে। পাথর দিয়ে ভরে দিতে হবে গর্তগুলো।' কোন্ টিউব কোথায় বসাতে হবে ভাল মতো সবাইকে বুঝিয়ে দিল ও।

ভোর মাত্র হতে শুরু করেছে।

একটা খাদ বেয়ে টিলার ওপর থেকে নেমে গেল আফগান যোদ্ধারা। আলফাজ কুশে ও দু'জন আফগান যোদ্ধা গিরিপথ পার হয়ে উল্টোদিকের টিলায় উঠল। ঈসা গেল উপত্যকায় বোমা বসাতে। ওর নীচে টিলায় যে তিনজন আফগান যোদ্ধা কাজ করছে তাদের দেখতে পাচ্ছে না রানা। অন্যদের ওর কথা মতো কাজ করতে দেখল ও। মাথা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে টিলার মাথায় চার্জ বসাতে শুরু করল নিজে।

এক ঘণ্টা পর একে একে ফিরল সবাই। ঈসার হাতে খুদে একটা রেডিও-ট্র্যান্সমিটার ধরিয়ে দিল রানা। ওর নিজের কাছেও ওই একই জিনিস আছে একটা। এবার নিজের হাতের

ট্র্যান্সমিটারটা দেখিয়ে ঈসাকে বলল, 'চার্জ ফাটাতে হলে এই সুইচটা অন করতে হবে। তা হলেই ট্র্যান্সমিটার চালু হয়ে যাবে। তারপর সি-ফোর ফাটাতে টিপতে হবে-এই লাল সুইচটা। ট্র্যান্সমিটার অন করে এই সুইচ টিপলেই রেডিও সিগনাল পাঠাবে ট্র্যান্সমিটার, সিগনালটা পৌঁছে যাবে রিসিভারে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটারির কারেন্ট পাঠাবে ওটা ডেটোনেটরে, সি-ফোর বিস্ফোরিত হবে।'

বুঝেছে, আস্তে করে মাথা দোলাল ঈসা আজনবী।

আরও তথ্য দেয়ার আগে সন্দেহের দোলায় দুলল রানা, সত্যিই লোকটা বুঝেছে তো কীভাবে রিমোট-কন্ট্রোল্ড ডেটোনেশন হবে?

নিশ্চিন্ত হলো ও ঈসার কথায়। ঈসা জিজ্ঞেস করল, 'সুইচটা টিপলে সবগুলো চার্জ একসঙ্গে ফাটবে না? তা হলে তো...

'ফাটবে না,' বলল রানা। 'লাল সুইচটার ওপরের এই ডায়ালটা খেয়াল করুন। ডায়ালের নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট চার্জ ফাটবে। এক থেকে ছ' নম্বর হচ্ছে উপত্যকার মেঝেতে বসানো আপনার চার্জগুলো। প্রথম চার্জটা এক নম্বর, তার পর থেকে বাকিগুলো। পরের ছ'টা এই টিলার গায়ে বসানো চার্জ। ওই একই ভাবে সাজানো। ওপরে আমি যে ছ'টা বসিয়েছি সেগুলো ডায়ালের তেরো থেকে আঠারো নম্বর। যদি বারো নম্বর চার্জ ফাটাতে চান তা হলে ডায়ালের কাঁটা বারোতে নিয়ে সুইচ টিপবেন।'

'জটিল, তবে বুঝেছি আমি, গর্ব প্রকাশ পেল ঈসা আজনবীর কণ্ঠে। 'ভুলে যাব না। ...আপনার হাতেও ট্র্যান্সমিটার থাকছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। ব্যাকআপ। আপনারটা কাজ না করলেও যাতে বিস্ফোরক ডেটোনেট করা যায়।'

'অথবা যদি আমাদের দু'জনের একজন মারা যাই, তখন...

'মরার চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিন,' তাকে থামিয়ে দিল রানা

টিলার কিনারা থেকে পিছিয়ে একটা গর্ত মতো জায়গায় ঝোপের আড়ালে ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখল ওরা। কাজটা শেষ করে আগের জায়গায় ফিরে এসে দেখল, দূরে দেখা যাচ্ছে অশ্বারোহী যোদ্ধাদের, উপত্যকার উল্টোদিকের গিরিপথটা ধরে এগিয়ে আসছে তারা। একটু পর উপত্যকায় ঢুকে তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল, একদল গেল ডানে, আরেকদল বামে। যারা বাকি রইল, মাঝে অবস্থান নিল তারা।

ঘোড়া থেকে নেমে জন্তুগুলোকে বড় বড় বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল আফগান যোদ্ধারা। কাজটা সেরে দ্রুত দৌড়ে এগিয়ে এলো, তারপর তাদের নেতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে বসল, বালিরঙা চাদর দিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেলে পাথরগুলোর রঙের সঙ্গে মিশে গেল একেবারে। না জানলে কেউ বুঝতেই পারবে না ওখানে ওঁৎ পেতে আছে শ'দুয়েক গেরিলা।

'এভাবে আপনাদের লড়তে শিখিয়েছে কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। এরা গেরিলা ওয়ারফেয়ার জানল কী করে ভেবে খানিকটা বিস্মিত বোধ করছে ও।

ঈসা আজনবী বলল, 'হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা এভাবেই লড়ে আসছে।'

যুবক-সর্দার আলফাজ কুশে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার আমি নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাচ্ছি।'

আপত্তি করল না রানা। নিজেকে আমেরিকানদের জায়গায় চিন্তা করে ওর অস্বস্তির বোধটা ক্রমেই বাড়ছে। ও হলে এখানে হামলা হতে পারে এরকম একটা সন্দেহ করতই। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে ভুল করত না। গিরিপথ নিরাপদ কি না বোঝার জন্য হেলিকপ্টার গানশিপ পাঠাত আগে। কথাটা ঈসা আজনবীকে বলল ও।

'আমেরিকানরা মনে করে ওদের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার ক্ষমতা

এদের নেই,' জবাবে বলল ঈসা। 'আসলেই নেই। তালেবানদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এদের পক্ষে নয়। আমেরিকানরা এটাও জানে, এদিকের গোত্রগুলো ধর্মান্ধ নয়। সুতরাং তালেবানদের বিরুদ্ধে অফেন্সিভে গেছে প্রচার করলেও আসলে তালেবান-আক্রমণের ভয় করবে না তারা, অতিরিক্ত সতর্ক থাকার দরকারই মনে করবে না।'

'তারপরও।' একমত হতে না পারলেও এ-ব্যাপারে কথা আর বাড়াল না রানা। টিলা থেকে নামবার জন্য খাদের দিকে পা বাড়ানোর আগে বলল, 'আমি যাচ্ছি ওপাশের টিলায়।'

পিঠের ন্যাপস্যাকে রেডিও-ট্র্যান্সমিটারটা ভরল ও, কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চার, তারপর নামতে শুরু করল খাদ বেয়ে। ছোট-বড় নানা আকৃতির পাথর বেরিয়ে আছে টিলার গা থেকে, ওগুলো ধরে নামতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না ওর। পিছন থেকে ঈসা আজনবীর গলা শুনতে পেল: 'আপনি আমাদের সঙ্গে লড়ছেন, কাজেই এখন থেকে আপনি আমাদের নিজের লোক। আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে থাকুন।'

টিলা থেকে নেমে গিরিপথটা আড়াআড়ি পার হতে শুরু করল রানা। ওপাশের টিলার তিরিশ গজের মধ্যে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে কান পাততে হলো ওকে। স্পষ্ট শুনতে পেল ভারী ডিজেল ইঞ্জিনের আওয়াজ, দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকেই। ঘুরে লম্বা, সরল রেখার মতো গিরিপথটার দূর প্রান্তে তাকাল ও। ধুলো-বালি উড়ছে ওখানে। এবার ধাতব চাকার নীচে পাথর গুঁড়ো হবার গা রী-রী করা আওয়াজটাও কানে ভেসে এলো। ধুলোর ভিতর থেকে নাক বের করল একটা কামানের নল, ওটার পিছু পিছু দেখা দিল গর্জন ছাড়তে ছাড়তে ছুটে আসা একটা এম-১১৩ আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার। অন্তত আশি কিলোমিটার বেগে আসছে ওটা। লম্বাটে, নিচু ও সরু একটা বাহন। ওটার কামানের নলের ওপর একটা অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল বসে আছে। টারেটের মেশিনগানটা এদিকেই তাক করা। নাকের কাছেও কয়েকটা

মেশিনগান আছে। রানা জানে, ভয়ানক কুৎসিত যন্ত্রটার সামনের অংশে আর্মারের নিরাপত্তায় থেকে শত্রু নিকেশ করতে বসে আছে পাঁচজন সৈনিক, পিছনের কম্পার্টমেন্টে ছয়জন।

প্রথমটার পিছু পিছু আরেকটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার দেখা দিল। তারপর আরেকটা। ওগুলোর পর ধুলোর মেঘ থেকে বের হলো একটা এম১এ১ ট্যাঙ্ক। ওটার তুলনায় আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারগুলোকে বামন মনে হলো। এম১এ১ ট্যাঙ্কের ১২০ এমএম কামান ও ৭.৬২ এমএম মেশিনগানগুলোর ধ্বংস-ক্ষমতা অনেক বেশি। এছাড়াও আছে হেভি ক্যালিবার .৫০ এম২ মেশিনগান, এম২৫০ রেড ফসফরাস স্মোক গ্রেনেড লঞ্চার। প্রয়োজনে ইঞ্জিন এগযস্টে ডিজেল ফিউল ইনজেক্ট করে ধোঁয়ার মেঘে হারিয়ে যেতে পারে চোখের পলকে।

এবার একে একে এলো পাঁচ ট্রাক বোঝাই সৈনিক। দ্রুত গিরিপথের শেষের দিকে ছুটে আসছে সবগুলো যুদ্ধযান ও ট্রাক। গিরিপথে ঢুকল আরও একটা ট্যাঙ্ক, পাঁচটা সৈন্য বোঝাই ট্রাক ও সবশেষে আরও একটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার।

বুক-সমান উঁচু একটা বোল্ডারের আড়াল থেকে দেখছে বিহ্বল রানা, চমক কাটিয়ে উঠে রেডিও-ট্র্যান্সমিটার বের করে প্রয়োজনীয় সি-ফোর চার্জ ফাটাবার আগেই কাছে চলে এলো সামনের যন্ত্রদানবগুলো, ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। পিছনে হাত দিয়ে ন্যাপস্যাক খুলে দ্রুত খুঁজছে রানা ট্র্যান্সমিটারটা, মনে মনে বলছে: 'ঈসা, ঊনিশ নম্বর চার্জটা ফাটাও!'

কিছুই ঘটছে না।

হঠাৎ রানা বুঝতে পারল কারণটা। ঈসা সম্ভবত ধারণা করছে ও বিস্ফোরকের খুব বেশি কাছে আছে। ট্র্যান্সমিটারটা খুঁজে পাচ্ছে না রানার ব্যস্ত হাত। 'ঈসা, সুইচটা টেপো!' পিঠ থেকে ন্যাপস্যাক নামাতে শুরু করল ও তাড়াহুড়ো করে। 'ঈসা! দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

বিস্ফোরণের ধাক্কাটা ওকে পিছনে ছিটকে ফেলে দিল। দ্বিতীয় চার্জটা ফাটবার আওয়াজে কানে তালা ধরে গেল ওর। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। বোল্ডারে এখনও ছিটকে এসে লাগছে পাথরের টুকরো, বালিতে নাক গুঁজছে। ঘন ধুলো উড়ছে চারপাশে। মুঠোর সমান বড় একটা পাথর রানার হাঁটুর পাশ দিয়ে ছুটে গেল প্রচণ্ড বেগে। ওর চোখের সামনে দুলে উঠল টিলার বিরাট একটা অংশ, তারপর হাজার হাজার টন পাথর খসে পড়ল গিরিপথের শেষে চলে আসা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার, সৈন্যবাহী পাঁচটা ট্রাক ও ট্যাঙ্কটার ওপর। চোখের পলকে বড় বড় আলগা পাথরের তৈরি মাঝারী আকারের একটা টিলার তলায় চাপা পড়ে গেল আমেরিকান সাঁজোয়া বহরের সামনের অংশ। ক্ষণিকের জন্য মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকদের চিৎকার অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পেল রানা। পুরু, শক্ত ইস্পাত প্রচণ্ড ওজনের কারণে কর্কশ শব্দে দুমড়ে-মুচড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে। সাদা ধুলোর ঘন মেঘ প্রায় আড়াল করে ফেলল গিরিপথ।

যতটা শুনেছে বা দেখেছে রানা সৈনিকদের পরিণতি, তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝতে পারছে অভিজ্ঞতা থেকে। ন্যাপস্যাকটা পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলল ও, বাম হাতে বের করে নিল রেডিও-ট্র্যান্সমিটার। ওর আরেক হাতে রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চার। ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল ও, ওর লক্ষ্য এদিকের টিলার গায়ের কাছে বিশ গজ দূরের একটা বড় বোল্ডার।

গিরিপথের যেসব জায়গায় বিস্ফোরক বসানো সম্ভব হয়নি সেসব জায়গায় আমেরিকানদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে হবে আফগানদের। অবশিষ্ট ট্যাঙ্কটা থেমে গেছে, সেই সঙ্গে ওটার পিছনের সৈন্য বোঝাই পাঁচটা ট্রাক ও আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারটা। ওগুলো আছে সদ্য তৈরি হওয়া টিলার ওপারে, বেশ খানিকটা পিছনে। রানা স্পষ্ট বুঝল, লড়াইটা এখনও পুরোপুরি

অসম। হালকা অস্ত্রধারী গেরিলাদের একমাত্র ভরসা তাদের দুর্জয় সাহস। পিছিয়ে থাকা ট্রাকগুলো থেকে লাফ দিয়ে নামছে আমেরিকান মেরিন সৈন্য, নেমেই বসে পড়ছে, গুলি ছুঁড়ছে গিরিপথের মুখ লক্ষ্য করে। আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারের টারেট ঘুরতে শুরু করেছে। ট্যাঙ্কের সামনে থেকে একটানা গুলি করছে ভারী মেশিনগানটা।

চার্জ ফাটতেই গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে বাড়ল শ'দুয়েক গেরিলা। প্রাচীন সিঙ্গেল-শট এনফিল্ডের আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছে রানার উপহার দেয়া এম-১৬-এর একটানা গুলি-বর্ষণের তীক্ষ্ণ আওয়াজে। তারপর তিরিশ বছর আগের পুরোনো একটা চাইনিজ মেশিনগান গর্জে ওঠায় এম-১৬-এর হুঙ্কার আর শোনা গেল না।

কয়েকজন মেরিন গুলি খেয়ে পড়ে গেল, তবে তাদের বেশিরভাগই পৌঁছে যেতে পারল গিরিপথের মুখের কাছে, বোল্ডারের আড়ালে। ওখান থেকে এম-১৬ দিয়ে পাল্টা গুলি ছুড়তে শুরু করল তারা। আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার তার কামান দাগল। ওটার গোলা কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে যেতেই ট্যাঙ্কটা দুলে উঠল। ট্যাঙ্কের গোলাটা জমি কাঁপিয়ে দিল। টুকরো টুকরো হয়ে গেল কয়েকটা বড় পাথর। চার-পাঁচজন আফগান যোদ্ধা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিটকে গেল এদিক-ওদিক।

গিরিপথের পাশ থেকে আংশিক খসে পড়া টিলার পাথর আমেরিকানদের সাঁজোয়া বহর ঠেকিয়ে দিতে পুরোপুরি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি, দুটো সৈন্যবাহী ট্রাক ও একটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার তুবড়ে গেছে শুধু, চাপা পড়ে ধ্বংস হয়নি। ওগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে সৈনিকরা, পাথরের স্তূপ মাড়িয়ে অংশ নিচ্ছে লড়াইয়ে।

ডায়াল ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট চার্জের নম্বরে কাঁটা নিয়ে গেল রানা,

তারপর সুইচটা টিপল। ওপাশের টিলার আরেকটা অংশ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো। উড়ন্ত পাথরের ঢল নেমে এলো নীচের সৈনিকদের ওপর, পুরোপুরি চাপা দিয়ে দিল অন্তত পনেরো-বিশজনকে। এবার এদিকের টিলার চার্জ ফাটাতে হবে, নইলে পিছনের ট্রাকগুলোতে করে আসা ইউএস মেরিনরা এগিয়ে আসবে বোল্ডারগুলোর আড়াল নিয়ে। কোন্ চার্জ ফাটাবে ঠিক করে সুইচ টেপার আগেই রানা দেখল, ওর ডানপাশে টিলার একটা অংশ আকাশে উড়াল দিল, তারপর অস্বাভাবিক দ্রুততায় নেমে আসতে শুরু করল গিরিপথের দিকে। বিস্ফোরণের আওয়াজে ওপর দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল অগ্রসরমান সৈন্যরা, কিন্তু পালাবার পথ নেই তাদের। পাথর বৃষ্টিতে চাপা পড়ে গেল বিশ-পঁচিশজন, গুরুতর আহত হলো আরও অনেক। ঈসা আজনবী চার্জ ফাটিয়েছে, নিজের চার্জটা ফাটানোর আগে ভাবল রানা। ওর কানে তালা ধরে গেল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের বিস্ফোরণে। পাথর পড়বার গতি বাড়ল আরও।

রানা যে-বোল্ডারের আড়ালে আছে, সেটায় অসংখ্য গুলি এসে মাথা খুঁড়ছে। চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে পাথরের কুচি। ছিটকে উঠছে বালি। পিছনের আর্মার্ড ক্যারিয়ারটা ওর অবস্থান জেনে ফেলেছে। এখন থেকে যে-কোনও সময় ওটার কামান চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে বোল্ডার, সেই সঙ্গে ছাতু হয়ে যাবে ও।

দ্রুত পাঁচ নম্বরে ডায়াল ঘুরিয়ে ট্র্যান্সমিটারের সুইচ টিপল রানা। আর্মার্ড ক্যারিয়ারের ফুট বিশেক আগে প্রচণ্ড আওয়াজে আকাশে বালি ছুঁড়ে দিল সি-ফোর। পাথরগুলো ঠং-ঠং করে পড়তে শুরু করল ক্যারিয়ারের ইস্পাতের বডির ওপর। কিন্তু কোনও ক্ষতি হয়নি ওটার। ক্ষতি হবে আশাও করেনি রানা। চার্জটা বেশ খানিকটা আগে ছিল, কিন্তু যথেষ্ট ধুলো ওড়াবে, ও জানত। গানারের সামনে এখন ধুলোর একটা পর্দা ঝুলছে। এটাই ওর সুযোগ, ভাল একটা আড়ালের আশায় টিলার দিকে ছুটতে

শুরু করল রানা। পিছিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে গুলি করছে নিয়মিত বিরতি দিয়ে। পিঠে একটা বোল্ডারের গুঁতো খেল ও, পাশ কাটিয়ে ওটার পিছনে চলে এলো, তারপর আর্মার্ড ক্যারিয়ারের কামানটা গর্জে উঠেছে বুঝতে পেরেই বসে পড়ল মাটিতে। টার্গেট দেখা না গেলেও গোলা ছুঁড়বে বলে ঠিক করেছে গানার। রানা যে-বোল্ডারের আড়ালে ছিল সেটা হাজার টুকরো হয়ে গেল গোলার আঘাতে। কটুগন্ধী কালো ধোঁয়া ভেসে এলো রানার মাথার ওপর, নাকে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

গেরিলারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে বাড়ছে। বহুবার মেরামত করা প্রাচীন ৮৮ এমএম রিকয়েললেস রাইফেলের একটা শেল অক্ষত ট্যাঙ্কে গিয়ে আঘাত হানল। থরথর করে কাঁপল প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক, তবে ওটার পুরু আর্মার ভেদ করতে পারল না শেলটা। ট্যাঙ্কের মেশিনগানগুলো গেরিলাদের শরীর কোমরের কাছ থেকে অর্ধেক করে কেটে ফেলছে। তারপরেও পরোয়া নেই গেরিলাদের, এগিয়ে যাচ্ছে অকুতোভয় স্বাধীনতাকামী মানুষগুলো।

পাথরের বড় কয়েকটা টুকরোর আড়াল নিয়েছে বেশ কয়েকজন মেরিন, ওখান থেকে গুলি করছে তারা গেরিলাদের দিকে। গ্রেনেড-লঞ্চারটা ফায়ার করল রানা তাদের অবস্থান লক্ষ্য করে। বিস্ফোরিত গ্রেনেড পাথরের টুকরোর সঙ্গে সঙ্গে মাংসের টুকরো ছিটাল চারপাশে। কয়েকজন মেরিন এক পাশ থেকে ওর পিছনে চলে আসতে চেষ্টা করছিল, গেরিলাদের এম-১৬-এর ব্রাশ-ফায়ারে মারা পড়ল তারা।

ট্যাঙ্কের গোলার আঘাতে তিন-চারজন আফগান রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি ধোঁয়ায় পরিণত হলো। তাদের বাঁ পাশে উঠে দাঁড়ানো তিন গেরিলা প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেল মেশিনগানের বুলেটে।

কাছেই প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে গেল রানা।

বুম!

গিরিপথের মুখটা ভরে গেল পাথরের ছোট-বড় টুকরোয়। যেসব আমেরিকান সৈন্য ওখানে আড়াল নিয়েছিল, তারা চাপা পড়ে গেল টনকে টন পাথরের নীচে।

ঈসা চার্জ ফাটিয়েছে।

পিছু হটছে মেরিনরা, বোল্ডারের আড়াল থেকে বের হবার সুযোগই আসেনি তাদের দুঃসাহসী গেরিলাদের আক্রমণের তোড়ে। রণ-হুঙ্কার ছেড়ে সামনে বাড়ছে গেরিলারা, বোঝা যায় দুর্ধর্ষ মানুষগুলো মৃত্যু-ভয়কে জয় করেছে।

চারপাশের গোলাগুলির আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল আরেকটা আওয়াজ। বুকের ভিতর শীতল একটা অনুভূতি হলো রানার। আকাশ থেকে জোর হুশ্‌শ্‌ আওয়াজ করে নেমে আসছে কী যেন একটা।

রকেট! ওটার পিছনে সাদা ধোঁয়ার দীর্ঘ একটা রেখা। উপত্যকার মেঝেতে আঘাত হানল রকেট, বেশ কয়েকটা বোল্ডার ছিল এক জায়গায়, পুরো জায়গাটা একটা গভীর ডোবায় পরিণত হলো। ডোবার কিনারায় তাজা রক্তের লাল ছোপ দেখল রানা। গিরিপথের ওপর থেকে কামান গর্জে উঠল, গানশিপের গানার তার কাজ শুরু করেছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কয়েকজন গেরিলা। অনেকখানি সামনে, টিলার ওপর থেকে গানশিপের মেশিনগান প্রতি সেকেন্ডে অসংখ্য গুলি ওগরাতে শুরু করল। বালির মধ্যে রীতিমতো ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে যেন বুলেটগুলো। যেখানে আঘাত করছে, তছনছ করে ফেলছে সব।

আমেরিকান হেলিকপ্টার গানশিপ। যুদ্ধের কানফাটানো আওয়াজে এএইচ-১ কোবরা গানশিপটা কখন কাছে চলে এসেছে টের পায়নি রানা। বিরাট এবং বিকট দেখাচ্ছে ওটাকে। গিরিপথটা যেখানে ছিল তার ওপর দিয়ে উপত্যকার দিকে ধেয়ে আসছে এখন, সেই সঙ্গে উচ্চতা কমাচ্ছে। আরও দুটো রকেট ছুঁড়ল এএইচ-১ কোবরা, তারপর গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে

এগোতে শুরু করল। সামান্য বিরতির পরপর ওটার নাকে বসানো কামানের নল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

পৃথিবীর বুকে দোজখ নেমে এসেছে যেন। রানার মনে হলো থরথর করে কাঁপছে গোটা পৃথিবী। কোনও জায়গা এখন আর নিরাপদ নয় গেরিলাদের জন্য। এদিক-ওদিক ছুটছে তারা আড়াল নিতে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না তাতে। উপত্যকার ওপর দিয়ে সামনে যাচ্ছে গানশিপ, আফগানদের গুলি করে ফেলে দেয়ার জন্য গানারকে যথেষ্ট সময় দিচ্ছে পাইলট। গানশিপের রোটরের তৈরি বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় চারপাশে ধুলো উড়ছে।

পরাজয় নিশ্চিত জেনেও গুলি করছে আফগানরা। তবে পিছাতে হচ্ছে তাদের।

এই ভয়টাই পাচ্ছিল রানা, আমেরিকানরা ধরে নেবে গিরিপথটা অ্যাম্বুশের জন্য আদর্শ, কাজেই এয়ার সার্ভেইলেন্সের জন্য গানশিপ পাঠাবে। আরও আগেই বোধহয় আসবার কথা ছিল এএইচ-১ কোবরার, সম্ভবত আর্মার্ড কলাম আসবারও আগে, কিন্তু কোনও কারণে আসতে কয়েক মিনিট দেরি হয়েছে ওটার।

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি-আক্রমণের প্রচণ্ডতা কমাতে কাজে আসেনি ওটা, তবে প্রতি-আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পুরোপুরি কাজে আসবে।

রানা যে-টিলার ওপর থেকে প্রথমবারের মতো উপত্যকা দেখেছিল, ওটার ওপর গিয়ে ঘুরল মডিফায়েড এএইচ-১ কোবরা, এবার ফিরে আসবে নতুন করে শত্রু নিধন করতে। নাক নিচু হলো ওটার, উইঙের নীচ থেকে আগুন ঝিলিক দিচ্ছে।

জমি এতোটাই কাঁপছে যে স্থির হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে সতর্ক থাকতে হচ্ছে রানাকে। টলটলায়মান অবস্থায় ও দেখল, গেরিলারা তাদের এম-১৬ থেকে গুলি করছে গানশিপটাকে লক্ষ্য করে। তাদের অনেকেই জানে না, খামোকা গুলি নষ্ট করছে। আর্মারের কারণে কোনও ক্ষতিই হবে না গানশিপের। এএইচ-১ কোবরার

গায়ে টোলও ফেলতে পারবে না এম-১৬-এর বুলেট।

এতোটা দূর থেকে ওর রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চার দিয়েও কিছু করতে পারবে না ও।

কিন্তু একটা জিনিস দিয়ে হয়তো ঠেকানো সম্ভব ওটাকে।

ব্যস্ত হয়ে রেডিও-ট্র্যান্সমিটারটার দিকে তাকাল রানা। উড়ন্ত ধুলোর মেঘের কারণে ডায়ালটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। বিস্ফোরণের শকওয়েভে প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে পড়া খড়কুটোর মতো দুলছে রানা, ওর অস্থির চোখ একটা নম্বর খুঁজছে। মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল গানশিপ। গিরিপথের মুখের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল।

ওটার রোটরের তীব্র বাতাসে ধুলো-ধোঁয়া অনেকটা কেটে যাওয়ায় ডায়ালের নম্বরগুলো পরিষ্কার দেখতে পেল রানা এবার।

গিরিপথের ওপাশে টিলার ওপর যেন ঝুলে আছে মারকুটে যান্ত্রিক ফড়িং।

ট্র্যান্সমিটারের সুইচ টিপল রানা। বিরতি না দিয়েই ডায়ালের কাঁটা ঘুরিয়ে আরেকটা নম্বর বেছে নিয়ে আবার দাবাল লাল সুইচ। পরপর দুটো বিস্ফোরণ ঘটল টিলার মাথায়। ওখানেই নিজের বসানো চার্জগুলো পুঁতেছে রানা। কাজটা করেছে ও দুটো কারণে। এক, যদি লড়াই ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে তা হলে এক্সপ্লোসিভ চার্জগুলো কাজে আসবে। দুই, যদি আফগানদের পিছাতে হয় এবং আমেরিকানদের দেরি করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে তা হলে সেটা সম্ভব হবে চার্জগুলো ওখানে থাকলে সোহেলের চেহারাটা রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল। স্যান্ডহার্স্ট-এ, ব্রিটিশ মিলিটারি-অ্যাকাডেমিতে ট্যাকটিকাল কমান্ডো-ওয়্যারফেয়ার কোর্সে একই সঙ্গে এসব কৌশল শিখেছিল ওরা দু'জন। সোহেল। সোহেল এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছে?

আরেকটা নম্বর বেছে নিয়ে সুইচটা টিপল রানা।

প্রথম বিস্ফোরণটা হেলিকপ্টার গানশিপকে কাঁপিয়ে দিয়েছে,

তবে এগোনোর গতি কমেনি ওটার।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ওটাকে কাত করে দিল। গতি বাড়ছে ওটার।

তৃতীয় বিস্ফোরণে উল্টে গেল গোটা কপ্টার। রোটরগুলো গানশিপের পতনের গতিই বাড়াল কেবল। তার আগে একটা দীর্ঘ মুহূর্ত যেন ঝুলে থাকল ওটা একই জায়গায়, তারপর মনে হলো স্লো মোশনে আকাশ থেকে খসে পড়তে শুরু করেছে যান্ত্রিক ফড়িং। গতিটা দ্রুত হতে কয়েক সেকেন্ড লাগল মাত্র।

পাঁচ সেকেন্ড পর গিরিপথের মেঝেতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো গানশিপ। আগুনের টকটকে লাল লেলিহান শিখা দু'পাশের টিলার গা চেটে দিয়ে গেল। ভয়ঙ্কর আগুনে ঝলসে গেল কয়েকজন মেরিন। শকওয়েভের ধাক্কায় টলে উঠল রানাও, গরম বাতাসের ঝটকা খেল। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে ওর, সেই সঙ্গে অনুভব করছে তীব্র একটা অপরাধ-বোধ। ওদিকের টিলার ওপর ছিল ঈসা আজনবী। বিস্ফোরণে কি মারা গেছে সে?

আরেকবার থরথর করে কেঁপে উঠল রানা। এবার আর্মার্ড ক্যারিয়ারের কারণে। টিলার গায়ের কাছে খানিকটা উঁচু জায়গায় আছে বলে দেখতে পেল, ওটার গোলা ও যেখানে আছে তার ত্রিশ গজ বামে, টিলার গায়ে আঘাত হেনেছে। আফগান যোদ্ধারা না পিছিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বুজে যাওয়া গিরিপথের দিকে এগোচ্ছে এখন, তাদের মোকাবিলা করতে উপত্যকার দিকে এগোচ্ছে তোবড়ানো আর্মার্ড ক্যারিয়ারটা।

একটা বিস্ফোরণে ওটার মেঝের অ্যালিউমিনিয়ামের প্লেট চিরে গেল। চেরাটা থেকে আগুনের হলকা বের হতে দেখল রানা। আটকা পড়া আমেরিকান সৈনিকদের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পেল ও, তারপর বিস্ফোরিত হলো গোটা আর্মার্ড ক্যারিয়ার।

একমাত্র একটা কারণেই ওখানে উপত্যকার মেঝের চার্জে

ফাটতে পারে। তার মানে বেঁচে আছে ঈসা আজনবী! অপরাধ-বোধটা দূর হয়ে গেল রানার মন থেকে।

ছড়িয়ে পড়ে এগিয়ে আসছে আফগান যোদ্ধারা। একজন গেরিলার হাতে গোটা দলের একমাত্র আরপিজি-সেভেনটা দেখল রানা। ওটা আহম্মদ আলীর শেষ ভরসা, সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কেড়ে নেয়া রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড লঞ্চার, এতক্ষণ ব্যবহার করা হয়নি শেষ মুহূর্তে ব্যবহার করা হবে বলে। যার কাছে আরপিজি-সেভেনটা আছে, তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, লক্ষ্যভেদ করতে পারবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকলে তবেই যেন প্রোজেক্টাইলটা ব্যবহার করে সে। অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করল সে, নতুন তৈরি হওয়া টিলার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে সর্তকতার সঙ্গে রকেটটা ছুঁড়ল পিছিয়ে পড়া অক্ষত আর্মার্ড ক্যারিয়ারের নাক লক্ষ্য করে। বিরাট গর্ত তৈরি হলো ক্যারিয়ারের নাকে, পরমুহূর্তে গোটা বাহনটা ছাতু হয়ে গেল মজুদ গোলাবারুদ ও জ্বালানী তেল বিস্ফোরিত হওয়ায়।

তিরিশ-চল্লিশজন মেরিন সৈন্য এখনও গিরিপথের মুখের কাছে আছে, ঘুরেই পাথর-বালির স্তূপের মধ্য দিয়ে পিছনে ফেলে আসা ট্যাঙ্ক ও ট্রাকগুলোর দিকে ছুটল তারা। তাদের ধাওয়া করল গেরিলারা। ডানপাশে টিলার গায়ের কাছেই আছে রানা, গেরিলাদের সঙ্গে গিরিপথের ভিতরে ছুটল ও বোল্ডারগুলোর আড়াল নিয়ে। রিযার্ভ ইউএস মেরিনরা দলের পশ্চাদাপসরণের সুবিধের জন্য ট্রাকগুলোর কাছ থেকে কাভারিং ফায়ার করছে।

ট্যাঙ্কটা গিরিপথের মাঝামাঝি সেই আগের জায়গাতেই আছে, ওটার মেশিনগান কড়কড় আওয়াজ ছাড়ল। ভারী কামান থেকে গোলা ছুঁড়তে শুরু করল গানার। বেশি সামনে চলে গেছে অতি আগ্রহী কয়েকজন গেরিলা, কী ঘটতে পারে বুঝে উঠবার আগেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল তারা মেশিনগানের একটানা গুলি ও কামানের গোলায়।

ট্যাঙ্কটা তেড়ে আসছে সামনে, যেন স্রেফ জেদের বসে এগোচ্ছে ওটার ড্রাইভার, যদিও জানে, গিরিপথ রুদ্ধ করে দিয়ে এখন যে টিলাটক্কর তৈরি হয়েছে, তার ওপর দিয়ে উপত্যকায় ঢুকতে পারবে না সে।

মারাত্মক আহত একজন গেরিলা তার স্যাচেল চার্জের পিন খুলে ট্যাঙ্কের দিকে ছুঁড়বার চেষ্টা করল। তার মাথা থেকে মাত্র ফুট খানেক দূরে পড়ল চার্জটা। মারা গেছে সাহসী আফগান। চার্জের ফিউজটা ধোঁয়া ছেড়ে পুড়ছে। ট্যাঙ্কটা আসছে এখনও। চার্জটা আগেই ফেটে যাবে, টোকাও লাগবে না ট্যাঙ্কের গায়ে। গেরিলারা অনর্থক গুলি করছে অগ্রসরমান দানব গুবরে-পোকাটার দিকে। আফগানদের অবস্থানের দিকে ঘুরে যেতে শুরু করল ট্যাঙ্কের কামানের নল।

স্যাচেল চার্জের জ্বলন্ত ফিউজটা একবার দেখে নিয়ে মনস্থির করে ছুটতে শুরু করল রানা, সোজা ধোঁয়া-ওঠা চার্জের দিকে দৌড়াচ্ছে। না থেমেই তুলে নিল ওটা, তারপর তীর বেগে ছুটে চলল ট্যাঙ্কের দিকে। একটা মেশিনগানের নল ওর দিকে ঘুরতে দেখে বুঝতে পারল, পৌঁছনো সম্ভব নয় ট্যাঙ্কের কাছাকাছি, তার আগেই অসংখ্য গুলির আঘাতে কাটা পড়বে ও। চার্জটা গায়ের জোরে ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে ছুঁড়েই ডাইভ দিল রানা, মুখ থুবড়ে পড়ল শক্ত মাটিতে, পরক্ষণে মাথা তুলে দেখল টারেটের ওপর পড়েছে চার্জ। ট্যাঙ্কটা দ্রুত ছুটে আসছে এখনও। ওটার ছায়া পড়ল ওর ওপর, তারপর ট্যাঙ্কের নীচে চলে যেতে শুরু করল ও। টের পেল সরসর করে আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত বইছে ওর শিরদাঁড়ায়।

নানারকম কর্কশ আওয়াজ তুলে ওর দু'পাশে ঘুরছে ক্যাটারপিলার ট্র্যাক দুটো।

পুরোপুরি ট্যাঙ্কের পেটের নীচে চলে গেল রানা, নাকে ডিজেলের কড়া গন্ধের ধাক্কা খেল, তারপর আবার দেখতে পেল সূর্যের আলো। বুঝতে দেরি হলো না, ওকে পেরিয়ে এগিয়ে গেছে

ট্যাঙ্ক, এখনও এগোচ্ছে। উঠেই ঝেড়ে দৌড় দিল ও বড় একটা বোল্ডার লক্ষ্য করে। খুব দ্রুত নিরাপদ একটা আড়াল দরকার ওর। বোল্ডারটা আরও বিশ ফুট ...পনেরো ...দশ!

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণটার ধাক্কায় শেষ দশ ফুট উড়ে গেল ও, ধুপ করে পড়ল পাথরটার কাছে। ঘাড়ে গরম বাতাসের ঝাপটা লাগল। পতনের ফলে বুকে আঘাত লাগায় মনে হলো আর কোনদিন শ্বাস নিতে পারবে না। তারপরও ঘুরে তাকাল রানা। ঝাপসা ভাবে দেখল, ট্যাঙ্কের টারেট ওটার মাউন্ট থেকে কাত হয়ে ঝুলছে। কামানের নল ঠেকে আছে মাটিতে। থেমে গেছে যন্ত্রদানব। ট্যাঙ্কের পেটের ভিতর থেকে কমলা-হলুদ আগুনের হলকা বের হচ্ছে।

মাটিতে মাথা রাখল রানা। এক ফোঁটা শক্তি পাচ্ছে না শরীরে। পাশে একটা ছায়া দেখে দুর্বল হাতটা তুলল, তারপর কমান্ডো নাইফটা বের করার আগেই দেখল লোকটা সর্দার আহম্মদ আলী। সব ক'টা দাঁতই বোধহয় বেরিয়ে গেছে তার খুশির হাসিতে। দু'হাতে রানাকে ধরে তুলতে ঝুঁকল।

'একটু পরে,' বড় করে শ্বাস নিল রানা, শরীর এলিয়ে দিল মাটিতে। ওর পাশে ধপ করে বসে পড়ল আহম্মদ আলী। ট্রাকের ইঞ্জিনগুলো চালু হবার আওয়াজ পেল দু'জন। রওনা হয়ে গেল আমেরিকান সৈন্যবাহী ট্রাক বহর।

'পালাচ্ছে আমেরিকান আর্মি,' গর্বের সঙ্গে বলল আহম্মদ আলী। 'বোধহয় পিছিয়ে পড়া সহযোদ্ধা বা আহতদের বাঁচানোর চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে লেজ গুটিয়ে ভাগছে কাপুরুষগুলো।'

ইউএস মেরিনদের লক্ষ্য করে থেমে থেমে গুলি করছে এখনও গেরিলারা, পাল্টা কোনও গুলির শব্দ নেই। আওয়াজগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত এনফিল্ড সিঙ্গেল-শট রাইফেলের। হঠাৎই রানা বুঝতে পারল কী ঘটছে আসলে। আহত কিংবা ধরা পড়া আমেরিকান সৈনিকদের খুন করছে বিজয়ী গেরিলারা। তাদের

এনফিল্ডের আওয়াজ ছাড়া চারপাশ প্রায় নীরব। আমেরিকানদের সাঁজোয়া বহরের অবশিষ্ট ট্রাকগুলোর আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

উড়ন্ত ধুলো থিতিয়ে এসেছে। ধুলো-বালি-পাথরের স্তূপের ভিতর থেকে খুঁজে বের করা হচ্ছে ইউএস মেরিনদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র।

উঠে দাঁড়াল রানা, আহম্মদ আলীর পাশে হাঁটতে শুরু করল। অনর্থক হত্যাকাণ্ড ঠেকানোর চেষ্টা করবে।

এক আহত মেরিনকে চিত করে মাটিতে শুইয়ে ধরে রেখেছে দু'জন গেরিলা, দেখল রানা। আরেকজন তলোয়ার তুলল মেরিনের গলা লক্ষ্য করে।

রানা পা বাড়াবার আগেই 'আল্লাহু আকবর' বলে চেঁচিয়ে উঠল তলোয়ারধারী আফগান, তার তলোয়ারটা নেমে এলো আহত মেরিনের গলায়। কাটা শ্বাস-নালী থেকে তপ্ত রক্ত ছিটকে বেরিয়ে ভিজিয়ে দিল জবাইকারীর মুখ।

বামদিকে একটা জটলা চোখে পড়ল রানার। ওখানে গোল হয়ে কিছু একটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন গেরিলা, উঁচু গলায় কী যেন বলছে তারা, কী যেন দেখিয়ে হাসাহাসি করছে। আগুন জ্বলে উঠল যেন আহম্মদ আলীর চোখে, রানার হাত ধরে দ্রুত পা বাড়াল সে জটলা লক্ষ্য করে। ইউনূস মোসাদ্দেক ও আলফাজ কুশেও ওদিকেই চলেছে। সবাই ওরা প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছল। ধাক্কা দিয়ে কয়েকজনকে সরিয়ে পথ করে নিল তিন সর্দার।

ভিতরে গোল ফাঁকা জায়গাটায় এক আমেরিকান সৈনিককে পড়ে থাকতে দেখল রানা। বড় জোর আঠারো হবে তার বয়স, দেহটা শীর্ণই বলা যায়। দু'হাতে মাথা-মুখ ঢেকে নিজেকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে। গেরিলাদের কয়েকজন কাছ থেকে গায়ের জোরে পাথর ছুঁড়ছে তাকে লক্ষ্য করে। একজন বয়স্ক গেরিলা টান দিয়ে তরুণ সৈনিকের হাত সরিয়ে দিল।

এবার তার কচি চেহারাটা দেখতে পেল রানা। নিষ্পাপ চোখ দুটোয় সরল, আতঙ্কিত দৃষ্টি। ভয়ে থরথর করে ঠোঁট জোড়া কাঁপছে তরুণের। বুঝে গেছে, মরতেই হবে তাকে। এবং গুলিতে নয়, তাকে বোধহয় খুন করা হবে পাথর ছুঁড়ে।

ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়া হলো তরুণকে। গেরিলারা নতুন উদ্যমে পাথর ছুঁড়তে শুরু করল। হাত তুলে তাদের থামতে ইশারা করল বয়স্ক গেরিলা, পাথর ছোঁড়া বন্ধ হওয়ামাত্র একটা ছোরা বের করে বন্দির চুলের মুঠি ধরে মাথাটা পিছনে টানল। গলা উন্মুক্ত হতেই ছোরা তুলল সে কোপ মারতে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, আহম্মদ আলীর হাত ছুটিয়ে সামনে বাড়ল ও, গেরিলার হাতটা ধরে ফেলল শক্ত করে। আর এক সেকেন্ড দেরি হলেই দু' টুকরো হয়ে যেত তরুণ সৈনিকের উইন্ডপাইপ। রেগে গেল গেরিলা, গলা দিয়ে গরগর আওয়াজ বের হলো তার, জোর খাটিয়ে ছোরাটা বসিয়ে দিতে চাইল সে আমেরিকানের জুগুলার ভেইনে। শক্তি প্রয়োগ করে তার হাত মুচড়ে ছোরাটা কেড়ে নিল রানা।

ভারসাম্য হারিয়ে পিছাল গেরিলা, রাগে চেহারা কালো হয়ে গেছে তার। কাঁধে ঝোলানো এম-১৬ কারবাইনটা নামিয়েই রানার দিকে তাক করল। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসছে।

রানার সামনে বুক পেতে দিল সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক, বয়স্ক গেরিলাকে ঝড়ের বেগে রাগী গলায় কী যেন বলল, তারপর সে রাইফেলটা নামাতেই ফিরে তাকাল রানার দিকে। এবার তার গলায় রাগের প্রকাশটা আরও বেশি ঘটল। উত্তেজনায় সে ভুলেই গেছে যে রানা পশতু জানলেও তাদের আঞ্চলিক ভাষা জানে না।

'উনি বলছেন আপনার জীবন বাঁচিয়েছেন উনি,' ঈসা আজনবীর পরিচিত গলা শুনতে পেল রানা। হাঁপাচ্ছে লোকটা। 'বলছেন ওঁর মেয়েকে বাঁচিয়ে যে কৃতজ্ঞতাপাশে তাঁকে আবদ্ধ করেছিলেন, সেই ঋণ শোধ হয়ে গেল। আপনার উচিত হয়নি

এখানে এরকম অযাচিত ভাবে নাক গলানো।'

গেরিলারা ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখছে। থমথম করছে তাদের গম্ভীর চেহারা। পরিবেশে আড়ষ্ট একটা ভাব।

এবার রাগী গলায় রানার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করল আলফাজ কুশে। অনুবাদ করল ঈসা আজনবী।

'আপনি একজন যোদ্ধার ছোরা কেড়ে নিয়েছেন, মারাত্মক অপমান করেছেন তাকে, কাজেই এই অসম্মান করার কারণে শাস্তি পেতে হবে আপনাকে।'

'কাউকে আমি অপমান করতে চাইনি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'একজন সত্যিকারের আফগান নিজের জীবন বাঁচানোর দরকার না পড়লে আরেকজন আফগানকে আক্রমণ করে না,' গম্ভীর স্বরে পশতুতে বলল সর্দার আহম্মদ আলী।

'আমি আফগান নই,' গলা একটু চড়ে গেল রানার। 'আফগানদের সব নিয়ম-রীতি অন্যদেরও মানতে হবে? যুদ্ধ শেষ, চোখের সামনে পরাজিত কাউকে জবাই করা হচ্ছে দেখলেও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব?'

'গলা চড়াবেন না,' সাবধান করল ঈসা নরম গলায়। 'দরকার হলে কড়া শব্দ প্রয়োগ করুন, গলা চড়িয়ে কথা বলা আফগানদের কাছে চরম অপমান করার সামিল।'

বড় করে শ্বাস নিয়ে রানা বলল, 'বলে দিন আমি তাকে অপমান করতে চাইনি। তার সাহসকে আমি শ্রদ্ধা করি, সাহসী যোদ্ধা সে। কিন্তু বন্দিকে সে মেরে ফেলবে সেটা আমি হতে দিতে পারি না। তাকে বলুন, কারণ আছে বলেই কাজটা করতে বাধ্য হয়েছি আমি। এই বন্দি...'

যার ছোরা কেড়ে নেয়া হয়েছিল সে রাগে কাঁপছে, চোখ গরম করে দেখছে রানাকে। মনে হলো তার রাগ ক্রমেই বাড়ছে আরও।

'বলুন আমি দুঃখিত,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল রানা। 'তাকে আমি জ্ঞানত অপমান করতে চাইনি।' আফগানদের একটা রীতি মনে পড়ে যাওয়ায় ছোরাটার ক্ষুরধার ফলা দিয়ে বামবাহু থেকে পাতলা এক টুকরো চামড়া কাটল ও নির্বিকার চেহারায়। রক্ত বেরিয়ে ওর কব্জির দিকে গড়াতে শুরু করল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল বয়স্ক আফগান যোদ্ধা। তার দিকে ছোরার বাঁট এগিয়ে দিল রানা। ঈসাকে বলল, 'ওকে বলুন, খামোকা ছোরা বের করেনি সে, তার ছোরা রক্তের স্বাদ পেয়েছে।'

ঈসার কথা শুনে দ্বিধার ছাপ পড়ল গেরিলার রুক্ষ চেহারায়।

'বলুন, সে আমার সঙ্গে লড়াই না করলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল গেরিলা ঈসা আজনবীর কথা শুনে, তারপর সামান্য দ্বিধা করে ছোরাটা নিয়ে খাপে পুরল।

'বলুন, আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি,' বলল রানা।

ঈসার কথা শেষ হবার পর উপস্থিত আফগানদের মধ্যে সন্তুষ্টির মৃদু গুঞ্জন উঠল।

'এবার কুরআনের আইন অনুযায়ী ওর বিচার হোক,' তরুণ সৈনিককে দেখিয়ে বলল সর্দার আহম্মদ আলী। 'বিচারে ওর মৃত্যুদণ্ড হবে।'

আপত্তি করল ইউনূস মোসাদ্দেক। 'না, বিচারের কিছু নেই। ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার পাবে শুধু মুসলমান। আইন অনুযায়ী এই বিধর্মী বিচার পেতে পারে না। বিশেষ করে সে যেরকম কাপুরুষ তাতে কোনওমতেই তার বিচার পাবার অধিকার বা যোগ্যতা নেই। আমরা যখন আক্রমণ করলাম তখন গুলি না ছুঁড়ে এখানে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এই বিধর্মী। জল্লাদ একে নিয়ে যাক, এর মাথা কেটে ফেলুক, এর বেশি কিছু বলার নেই আমার।'

সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেকের কথায় সম্মতি দিয়ে মাথা দোলাল গেরিলারা। কসাই হারিস বিন বিল্লাল ভিড়ের ভিতর থেকে তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে এলো।

'ঈসা, ওদের মানা করুন,' নিচু গলায় বলল রানা। গলার স্বর নামিয়ে রেখেছে অনেক কষ্টে। 'ওদের বলুন আমার কিছু কথা আছে। বলুন, এই বিধর্মীকে আমার জীবিত দরকার। বলুন, আমার বন্ধুকে উদ্ধার করতে এর সাহায্য আমার কাজে আসবে বলে মনে করছি আমি।'

'এ-ব্যাপারে আমরা সালিসে আলোচনা করব,' ঈসা আজনবী মুখ খুলবার আগেই বলল সর্দার আহম্মদ আলী।

'আরও একটা ব্যাপারে আশা করি আলোচনা করবেন,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। প্রতিটা বাক্যের ওপর জোর দিয়ে ধীরে ধীরে বলছে। 'আফগানিস্তানে আসার পর থেকে একটার পর একটা উপকার করে গেছি আমি আপনাদের, এবার বদলে আপনারা কিছু করুন। আমাকে আপনারা, সর্দাররা কথা দিয়েছিলেন, আমার বন্ধুকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবেন। নিজেদের সম্মান নিয়ে সারাক্ষণ আপনারা কথা বলছেন, সত্যিই যদি নিজেদের সম্মানের তোয়াক্কা করেন, তা হলে কথা অনুযায়ী কাজ করুন এবার, আমার বন্ধু যেখানে আছে সেখানে আমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।' লালচে হয়ে গেছে তিন সর্দারের চেহারা, লক্ষ করল রানা। আঙুল দিয়ে বন্দি তরুণ সৈনিককে দেখাল ও। 'ও যদি আমার বন্ধুকে উদ্ধার করতে কাজে আসে, তা হলে বাঁচতে দিন ওকে। মনে করব আপনাদের কথার দাম আছে।'

রানার কথা শেষ হবার পরেও কেউ খানিকক্ষণ কোনও কথা বলল না। সর্দার তিনজনের চেহারা দেখে মনে হলো তারা চরম ভাবে বিস্মিত হয়েছে, অপমানিত বোধ করবে কি না বুঝে উঠতে পারছে না এখনও।

ঈসা আজনবী দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানার কানের কাছে বলল,

'বিরাট ভুল করে ফেলেছেন। এঁদের কথার দাম নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত হয়নি আপনার মোটেই।'

নিষ্পলক তাকিয়ে আছে রানা আহম্মদ আলীর সরু হয়ে যাওয়া দুই চোখের খয়েরী তারার দিকে।

এক পা সামনে বাড়ল আহম্মদ আলী। 'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি আমার কথা রাখব না?'

'আমি শুধু আপনাদের দেয়া কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি,' বলল রানা।

আরেক পা সামনে বেড়ে রানার চেহারায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল সর্দার আহম্মদ আলী। 'আপনি কি জানেন এভাবে কথা বলে নিজেকে আপনি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন?'

'জানি।'

আস্তে আস্তে মাথা দোলাল আহম্মদ আলী। 'মনে হচ্ছে, আপনার বন্ধু আপনার কাছে অনেক বড় কিছু।'

'ও আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি।'

'তার কথা ভেবেই এই বিধর্মীকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন? ভাবছেন এ কোনও কাজে আসবে?'

'না। এত কমবয়সে কাউকে মরতে হবে সেটা মেনে নিতে পারিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রানাকে দেখল আহম্মদ আলী, তারপর বলল, 'আপনার দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ আফগান পুরুষদের মতোই। সাহসটাও। ঠিক আছে, আপনাকে আমি কথা দিলাম, খোদার কসম, এই বিধর্মীকে আপনার কারণে বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু এ যদি কোনও সাহায্যে না আসে, তা হলে...' কসাইয়ের কাছ থেকে তলোয়ারটা নিল আহম্মদ আলী। 'যদি বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করে, তা হলে ওকে কোতল করার দায়িত্ব আপনারই ওপর বর্তাবে।'

আট

ইস্পাতের দরজার কাছে, শুকিয়ে আসা থকথকে কালচে রক্তের মধ্যে পড়ে আছে সোহেল, চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি একটা ঘোর ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বন্ধ চোখ কুঁচকে আছে ওর।

উজ্জ্বল বাতিগুলো যদি নিভে যেত!

করিডরে পায়ের আওয়াজ না?

কর্নেল নয় বোধহয়। তার বুক কাঁপানো হাঁটবার আওয়াজ মনের মধ্যে গেঁথে গেছে ওর।

স্বস্তি বোধ করল সোহেল। মার্চ করছে না ওরা। সৈনিক নিয়ে ওকে জেরা করতে আসছে না হেনরি মর্গান।

মনোযোগ দিয়ে শুনবার চেষ্টা করল।

সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম? সে তো সৈন্য নিয়ে আসে না! তা হলে? ওকে ইন্টারোগেশন করতে আসছে না কেউ? যারা আসছে তারা তো বুট পরা নয়!

আরও ভাবতে চেষ্টা করল ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া অবসন্ন, মৃতপ্রায় সোহেল। চোখ মেলল ও। সব ঝাপসা।

অনেকগুলো স্যান্ডেল পরা পায়ের আওয়াজ। কে যেন পড়ে গেল পাথরের মেঝেতে। মাংসে লাঠির বাড়ির ভোঁতা আওয়াজ হলো। গুঙিয়ে উঠল কে যেন। কাতর স্বরে কাকুতি-মিনতি করছে কেউ পশতুতে, প্রাণভিক্ষা চাইছে। আবারও লাঠির বাড়ির আওয়াজ। ইংরেজিতে ধমকে উঠল একজন সৈনিক। এগিয়ে যাচ্ছে স্যান্ডেলের মৃদু আওয়াজ।

আস্তে আস্তে পাশ ফিরল সোহেল। আহত কাঁধটা দেয়ালে ঠেকিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল। ওহ্, ব্যথা! ঘরটা যেন চোখের সামনে দুলছে, মনে হচ্ছে হাতটা খসে পড়ে যাবে ব্যথায়। কয়েকবার ফুঁপিয়ে উঠল।

অনিয়মিত শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করল। হাত ব্যবহার করা যাবে না। বুলেটের গর্তটা থেকে আবার রক্ত পড়ছে। সমস্ত মানসিক শক্তি একত্রিত করে কোমরের জোরে উঠে বসল সোহেল। সারাশরীর আপত্তি জানাচ্ছে। জখমি পেশীগুলোর ভিতর আগুন জ্বলছে যেন। ডান হাঁটু কাত করল ও, তারপর দেয়ালের গায়ে শরীর ঠেকিয়ে ছেঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। হাঁটু ভর রাখতে চাইছে না।

না, দাঁড়াতে হবে!

বিশ সেকেন্ড লড়াই করবার পর দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে পারল ও। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকাল। কয়েকজন বেসামরিক আফগান হোঁচট খেতে খেতে করিডর ধরে যাচ্ছে।

কতজন ওরা? চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করল সোহেল।

এক... দুই... তিন... দশজনের কম হবে না।

ঘোরের মধ্যে ভাবতে চেষ্টা করল, কী যেন দেখছে ওর চোখ? হ্যাঁ, বেসামরিক লোক। আর কী? বাইরে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। ওদিক থেকেই সবসময় আসে কর্নেল হেনরি মর্গান।

ওকে যেদিক থেকে নিয়ে এসেছিল, সেদিকে, দরজার দিকে যাচ্ছে এরা।

ওদিক দিয়ে দুর্গের উঠানে পৌঁছুনো যায়। ওদিক দিয়ে পালানো...

শরীরটা দরজায় ঠেস দেয়া থাকলেও হাঁটু দুটো আর ভর রাখতে পারল না, পড়ে যেতে গিয়েও কোনওরকমে বসে পড়ল

সোহেল, তারপর বসে থাকতে পারবে না বুঝে শুয়ে পড়ল থকথকে রক্তের মধ্যে।

চিন্তাগুলো কেমন জাবড়ে যাচ্ছে। না, মাথা নাড়ানো যাবে না, ঘাড়ে খুব ব্যথা!

কিন্তু ওদের যদি ছেড়েই দেবে, তা হলে সৈনিকরা এরকম দুর্ব্যবহার করছে কেন?

আফগান লোকগুলো এগোতে চাইছিল না।

কাতর স্বরে অনুনয়-বিনয় করছিল কেন?

দশজন লোককে নিশ্চয়ই একইসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না?

এবার বুঝতে পারল সোহেল। অক্ষম ক্রোধে চোখে জল চলে এলো ওর। ওই অসহায় লোকগুলোকে চিরবিদায় দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওকেও এভাবেই নিয়ে যাবে। বাঁচার কোনও আশা নেই। কোনও উপায় নেই। ছেড়ে দিলেও তো পালাতে পারবে না ও এখান থেকে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিরে। শক্ত করে চোখ বন্ধ করল, তারপর পড়ে থাকল চুপচাপ। আবার আসবে হেনরি মর্গান। সার্জেন্ট ট্রিসট্রিমও আসবে।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, খুব অস্পষ্ট ভাবে অনেকগুলো গুলির আওয়াজ শুনতে পেল ও। বিড়বিড় করে গাল দিতে শুরু করল ও, ফাটা ঠোঁট দুটোর ব্যথা থামাতে পারল না ওকে।

কর্নেল হেনরি মর্গানের অফিসের একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল মেজর অ্যালবার্ট ডুরেল। ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম আলো এসে পড়েছে ওই যে দেয়ালের ওই অংশে। বরাবরের মতোই সৈনিকরা তৈরি হয়ে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল থেকে বিশ ফুট দূরে।

তিক্ত চেহারায় আপনমনে মাথা নাড়ল মেজর ডুরেল। বয়সে প্রায় কর্নেলের সমান সে। সামরিক জীবন তার চেহারায়

কঠোরতার ছাপ আনতে পারেনি। ভাল করেই জানে সে, আসলে তার আর্মিতে যোগ দেওয়া উচিত হয়নি। বিরাট ভুল করেছে সে। তার উচিত ছিল স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানো। হাজার বারের মতো বিড়বিড় করে বলল মেজর, 'এখানে এই নরকে আমি আসতে চাইনি। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।'

ঘুরে তাকাল সে কমান্ডিং অফিসারের দিকে। কর্নেল মর্গান তার দিকেই তাকিয়ে আছে। লোকটা একটা পশু, জানে মেজর। কিন্তু করার কিছু নেই তার। অনেকবার ভেবেছে কর্নেলকে ডিঙিয়ে অভিযোগ করবে কি না সে কাবুলে, সাহসে কুলায়নি। কাজটা সরাসরি ইনসাবোর্ডিনেশন বলে গণ্য হবে। আইন অনুযায়ী অভিযোগ করতে হলেও তাকে তা করতে হবে এই পিশাচটার মাধ্যমেই, চেইন অভ কমান্ড ভাঙা যাবে না। যদি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা করে তা হলে ওপরওয়ালারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে তার বিরুদ্ধে। নরম গলায় সে বলল, 'কর্নেল, গেরিলারা কোথায় আছে আমরা সেটা জানার আগেই আর্মার্ড কলাম পাঠানোর সিদ্ধান্তটা কিন্তু আপনিই নিয়েছিলেন।'

চোখ সরু করে মেজর ডুরেলের দিকে তাকাল কর্নেল মর্গান, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'আপনি কি বলতে চান যা ঘটেছে সেটা আমার দোষে ঘটেছে, মেজর ডুরেল?'

চট্ করে মাথা নাড়ল মেজর ডুরেল। 'অবশ্যই না, সার। আমাদের ওদিকে মুভ করতেই হতো। প্ল্যান যত ভালই হোক, কোনও খণ্ডযুদ্ধের পরিণতি কী হবে বোঝার উপায় আসলে কারও নেই, সে যত দক্ষ আর্মি অফিসারই হোক।'

কলাম পাঠানো যে কর্নেলের একান্ত নিজস্ব পরিকল্পনা সেটা দ্বিতীয়বার বলবার সাহস পেল না মেজর অ্যালবার্ট ডুরেল।

মেজর ডুরেলকে নীরব দেখে কর্নেল মর্গান টের পেল, আরও রেগে যাচ্ছে সে। 'আফগান বর্বরগুলোকে এবার ভালরকম শিক্ষা দিতে হবে,' নিচু গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। 'আমাদের ওপর

যেখানে হামলা করেছে তার কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়ে আছে কালো কুত্তাগুলো। হ্যাঁ, আমি জানি, ওখানেই কোথাও থাকবে হারামজাদারা। আগামীকাল ফুলস্কেল সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় অপারেশন শুরু করার নির্দেশ দেব আমি সবাইকে। আপনার কিছু বলার আছে, মেজর?'

'সেটা কি ঠিক হবে, সার?' কর্নেলের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল মেজর ডুরেল। 'এমনও তো হতে পারে গেরিলারা চাইছে ঠিক তাই করি আমরা, মনে করি ওদিকে কোথাও লুকিয়ে আছে তারা। হয়তো আবারও ফাঁদ পেতে তৈরি হয়ে আছে।'

'আমার কথার ওপর দিয়ে কথা বলবেন না, মেজর,' ধমকে উঠল কর্নেল মর্গান। 'পরিণতির কথা বলেছেন আপনি একবার। আজকে যা ঘটেছে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে আফগান কুকুরদের!'

আবার জানালার দিকে তাকাল মেজর ডুরেল। ছায়া ঘনাচ্ছে প্রশস্ত উঠানে। সৈনিকরা আগের মতোই অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করল সে, 'ওই বাংলাদেশি বন্দির ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?'

চোখ সরু করে মেজরকে দেখল হেনরি মর্গান। 'কী ভাবব?'

'লোকটাকে কাবুলে পাঠানো দরকার না?'

'পেট থেকে কথা বের করার আগে কোথাও পাঠানো হবে না তাকে,' কড়া গলায় বলল কর্নেল মর্গান। 'আমি জানি ওই জেএমবির বাচ্চার পেটে অনেক তথ্য আছে। ও জানে তালেবানদের ঘাঁটি কোথায়।'

দরজায় টোকা দেবার ঠকঠক শব্দ হলো, তারপর অফিসে ঢুকল সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম।

'গেরিলাদের কোর্টইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কর্নেল, সার।'

'তা হলে যা বলেছি সেটা করছ না কেন!' ধমকে উঠল হেনরি মর্গান।

খটাস করে পা ঠুকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল সার্জেন্ট।

গলার ভিতরটা টকটক লাগল মেজর ডুরেলের। মনে মনে আরেকবার বলল, 'আমাকে যদি আফগানিস্তানে না পাঠাত তা হলে খুব ভাল হতো।'

বন্দি তরুণ সৈনিকের নাম উইলিয়াম হবসন। গুহার মেঝেতে মুখোমুখি বসে আছে সে ও রানা। জেরার ফাঁকে তার দিকে একবার তাকাল রানা। ওর যদি বুঝতে ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে সরল-সোজা, নীতিপরায়ণ একটা বাচ্চা ছেলে উইলিয়াম হবসন, যে এখনও পরিণত পুরুষ হয়নি, দেশপ্রেমের ঘোরে ভুল করে আর্মিতে যোগ দিয়েছে তারুণ্য পেরুবার আগেই। তরুণ হবসনের চেহারা ও চোখের নিষ্পাপ সরলতা বারবার রানাকে গিল্টি মিয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে ডুবন্ত সূর্য। ধীরে ধীরে ছায়া ঘনাতে শুরু করেছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে আরেকটা দিন, অথচ সোহেলকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে প্রায় কোনও অগ্রগতিই হয়নি।

ইতিমধ্যেই হবসনকে খানিকটা বলেছে রানা কী চায় ও। অল্প অল্প পশতু জানে উইলিয়াম হবসন, উপত্যকায় কী ঘটতে যাচ্ছিল বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি, এটাও বুঝতে পেরেছে, রানার কারণেই এখনও বেঁচে আছে সে। কাজেই রানার প্রশ্নের জবাবে নির্দ্বিধায় জানিয়েছে, 'হ্যাঁ, আপনার বন্ধুকে আমি ফোর্টে নিয়ে যেতে দেখেছি।'

গুহা-মুখের লালচে আলো একবার দেখে নিয়ে উইলিয়াম হবসনের দিকে একটু সামনে ঝুঁকল উদ্বিগ্ন রানা। 'কেমন আছে ও?'

চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল হবসন। 'ভাল নেই। শুনেছি প্রতিদিন তাকে জেরা করার নামে ভয়ঙ্কর নির্যাতন করা হয়। কর্নেল মর্গান কাউকে ইন্টারোগেশন শুরু করলে তাকে মুখ

খুলতে হয়, নইলে ছয়-সাতদিনের বেশি টিকতে পারে না কেউ।'

শঙ্কায় কেঁপে উঠল রানার বুক। বাংলাদেশের স্বার্থ জড়িত বলে সোহেল তো মরলেও মুখ খুলবে না, কিছুতেই বলবে না কে ও। তার মানে ওর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে। 'ফোর্টের একটা ম্যাপ এঁকে আমাকে দেখাও কোথায় কী আছে,' নিচু গলায় বলল রানা।

হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল তরুণ সৈনিক। 'কোনও লাভ নেই। কিছুতেই ওখান থেকে আপনার বন্ধুকে বের করে আনতে পারবেন না। অনেক বেশি সুরক্ষিত ওই ফোর্ট। এখানে যতজন আফগান যোদ্ধা আছে, সবাই যদি আক্রমণ করত, তা হলেও ওটা দখল করতে পারত না।'

'ওরা ওখানে যাবে না,' বলল রানা। 'আমি যাব।'

অবাক হয়ে রানার চোখে তাকাল তরুণ। 'আপনি একা যাবেন?'

'সঙ্গে আরেকজন যাবে,' বলল রানা। 'দু'জন গেলে গার্ডদের চোখ এড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে পারার সম্ভাবনা বাড়বে।'

'ম্যাপ আঁকলেও কাজ হবে না, ফোর্টের চারপাশে মাইনফিল্ড আছে। একজন গাইড লাগবে আপনাদের।' একটু দ্বিধা করল হবসন, তারপর বলল, 'আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে তা হলে আপনার।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। 'নিতেই হবে? ভাল করে ভেবে দেখো।'

'নিশ্চয়ই বিশ্বাস করছেন না আমাকে?' ম্লান হাসল তরুণ সৈনিক। 'আপনার জায়গায় আমি হলেও বিশ্বাস করতাম না।'

হবসনের কথাগুলো বিচার করে দেখছে রানা এখনও। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছে। অন্যায় যুদ্ধে অংশ নিতে না চাওয়ায় কোর্ট-মার্শাল হয়ে যাচ্ছিল তার। অপমান থেকে বাঁচতে আক্রমণে যোগ দিতে রাজি হয় সে। তখনই ঠিক করে, একটা গুলিও করবে না সে আফগানদের দিকে। সত্যিই গুলি

করেনি। তার রাইফেলের ম্যাগাযিন পুরো ভর্তি ছিল। ব্যারেলে করডাইডের গন্ধ পায়নি ও।

'আপনি কি আমাকে কাপুরুষ ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল হবসন। উৎকণ্ঠিত চেহারা দেখে মনে হলো তার সম্বন্ধে রানার কী ধারণা তাতে অনেক কিছু এসে যায়।

চুপ করে থাকল রানা।

'এখানে যুদ্ধ হচ্ছে না, যা হচ্ছে সেটা জেনোসাইড,' আবার বলল তরুণ। 'আমার দেশকে আমি ভালবাসি, কিন্তু ঘৃণা করি সেই সব রাজনীতিকদের, যারা ক্ষমতার দম্ভে মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। চামড়ার রঙের কারণে বৈষম্য দেখে বমি আসে আমার।'

'তুমি কি আফগানদের পক্ষে লড়ার কথা ভাবছ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল হবসন। 'না, দেশকে আমি ভালবাসি। কিন্তু কোনও লড়াইয়ে আমি থাকতে চাই না। বুঝে গেছি মানুষ খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোর্ট-মার্শালের ভয় না থাকলে আর্মি থেকে পালাতাম। আসলে লজ্জায় পালাতে পারিনি। তারপর তো ধরাই পড়লাম আফগানদের হাতে। যদি বেঁচে যাই, তা হলে অন্য কোনও দেশে চলে যাব, নতুন পরিচয়ে মিশে যাব সাধারণের ভিড়ে।'

'যদি তোমাকে সঙ্গে নিই তা হলে কী করবে তুমি, যদি কোনও স্বদেশি সৈনিকের মুখোমুখি পড়ে যাও?' হবসনের চোখের দিকে তাকাল রানা।

'মেরে অজ্ঞান করতে চেষ্টা করব,' মনে হলো সত্যি কথাই বলছে ছেলেটা। 'রাইফেলের কুঁদো ব্যবহার করার ট্রেইনিংটা অন্তত আছে আমার।'

'তুমি ভাবছ তোমাকে নিয়ে গেলে রাইফেল দেব তোমার হাতে?'

শ্রাগ করল হবসন। 'একটা লাঠি তো অন্তত দেবেন?'

রাইফেলই দেব, মনে মনে বলল রানা, তবে গুলি ছাড়া। নইলে আমেরিকান গার্ডদের মুখোমুখি পড়ে গেলে সন্দেহ করে বসতে পারে তারা।

পাথরের ওপর জুতোর শব্দ শুনে গুহামুখের দিকে তাকাল রানা। ইউনূস মোসাদ্দেকের মেয়ে হানিফাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে ফারা রাইনার, তার ঠোঁট থেকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে। কচি মেয়েটাকে সামনে বাড়িয়ে দিল হাতের ঠেলায়। 'ভাবলাম তুমি জানতে চাইবে তোমার ছোট্ট বন্ধু কেমন আছে।'

হানিফার দিকে চেয়ে হাসল রানা।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে গম্ভীর চেহারায় কথা বলতে শুরু করল হানিফা।

'কী বলছে?' ফারার দিকে তাকাল রানা।

'তেমন কিছু না।'

'তারপরও বলো কী বলছে।'

'জানোই তো বাচ্চারা ভাবনা-চিন্তা না করেই কথা বলে অনেক সময়,' বলল ফারা রাইনার। 'ও জানে না আসলে কী বলছে ও।'

বক্তব্য জানবার জন্য কৌতূহলী চোখে ফারার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল ফারা রাইনার। 'ও বলছে তুমি যেন শীঘ্রি লড়াইয়ে আহত হও, তা হলে ও জানপ্রাণ দিয়ে তোমার সেবা করতে পারবে।'

মৃদু হাসল রানা, নরম গলায় বলল, 'ও বোধহয় সুযোগটা পাবে।' ফারা রাইনার হানিফাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর তরুণ বন্দির দিকে তাকাল ও। 'ফোর্টের ম্যাপটা এঁকে ফেলো।'

কাগজ-কলম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল উইলিয়াম হবসন। গুহার ভিতরে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল বোরকা পরা এক আফগান নারী, মুখ তুলেও দেখল না সে, গভীর মনোযোগে ম্যাপ আঁকছে। পনেরো মিনিট পর শেষ হলো তার কাজ। ম্যাপটা

রানার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ওটা নিয়ে চোখ বুলাল রানা, মনের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছে দুর্গের ভিতরে কোথায় কী আছে। দশ মিনিট পর ছোটখাটো সমস্ত তথ্যও মুখস্থ হয়ে গেল ওর। ম্যাপটা পকেটে রেখে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো ও রাতের আঁধারে। তাজা শীতল বাতাসে ওর নাক থেকে দূর হয়ে গেল কেরোসিনের ঝাঁঝ।.

আজ রাতে আগুন জ্বালেনি আফগান পুরুষরা। পুরো বসতি অন্ধকারে ডুবে আছে। টিলাগুলোর ওপর দিয়ে শত্রুদের যদি খুঁজতে আসে হেলিকপ্টার গানশিপ, তা হলে বসতির কোনও চিহ্ন দেখতে পাবে না ওপর থেকে। সবাই জানে, আসবে প্রতিহিংসাপরায়ণ আমেরিকানরা। যদি কাউকে পায়, তা হলে খুন করবে নির্বিচারে।

অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে মিনিট খানেক লাগল, তারপর চারপাশটা ভাল করে দেখল রানা। তাঁবুগুলো অন্ধকারে মিশে আছে। রাতের আঁধারে আরও গাঢ় কিছু ছায়া। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর নাক ঝাড়ছে ঘোড়াগুলো, পা ঠুকছে মাটিতে, এছাড়া বুঝবার কোনও উপায় নেই যে ধারেকাছেই কয়েকশো লোক আছে। প্রকৃতিও যেন তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আফগানদের দিকে, নক্ষত্রগুলোকে ঢেকে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ঘন কালচে মেঘ।

ইউনূস মোসাদ্দেকের সেই গুপ্তচর, প্রাক্তন সরকারী সৈনিক যে-তাঁবুতে আছে, সেটায় চলে এলো রানা। ভিতরে ঢুকে দেখল লোকটা বসে বসে মোমের আলোয় একটা বই পড়ছে। ওকে দেখে বই নামিয়ে রেখে কৌতূহলী চোখে তাকাল সে। সংক্ষেপে কী চায় তাকে জানাল রানা, ম্যাপটা বের করে তার হাতে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ ওটা দেখল প্রাক্তন সরকারী সৈনিক, তারপর নিচু গলায় নিজের বক্তব্য জানাল। মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনল রানা, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে

এলো বাইরে। গুহার দিকে হাঁটছে ও, পাশ থেকে স্যান্ডেলের খসখস আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল। ঈসা আজনবী চলে এসেছে ওর পাশে। সর্দারদের তাঁবুগুলোর দিকে হাঁটছে ওরা। নীরবে কেটে গেল কিছুক্ষণ, তারপর রানা বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন। ইউনূস মোসাদ্দেকের সঙ্গে কথা আছে আমার।'

ঈসার সঙ্গে সরাসরি সামনের একটা তাঁবুর দিকে পা বাড়াল ও। ওরা দু'জন তাঁবুতে ঢুকতেই থেমে গেল তিন সর্দারের শলা-পরামর্শ। মোমের মৃদু আলোয় ইউনূস মোসাদ্দেক, আলফাজ কুশে ও আহম্মদ আলীর চেহারায় গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ দেখল রানা।

'বিধর্মীটার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলেন?' ওরা বসবার পর জিজ্ঞেস করল ইউনূস মোসাদ্দেক।

পকেট থেকে বের করে ম্যাপটা তাকে দেখাল রানা।

'বুঝবেন কী করে যে এটায় সবকিছু ঠিক ঠিক দেখানো হয়েছে?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল আলফাজ কুশে।

'কালকে আপনাদের যে গুপ্তচর আমেরিকান হামলার খবর এনেছে, তাকে ম্যাপটা দেখিয়েছি আমি,' জানাল রানা। 'বলল আফগান মিলিটারির যে-ইউনিটের সঙ্গে সে ছিল তাদের ব্যারাক নেই ওই দুর্গে, তবে দু'বার ওখানে গেছে সে। তখন দুর্গের যতটুকু দেখেছে সেটা এই ম্যাপে দেখানো আছে।'

'কিন্তু ও যা দেখেনি সেসব আছে কি না তার নিশ্চয়তা কী?' জিজ্ঞেস করল আহম্মদ আলী।

'আছে কি নেই শীঘ্রি জানতে পারব আমি,' বলল গম্ভীর রানা।

'শীঘ্রি?' ভ্রূ কুঁচকে উঠল আহম্মদ আলীর। 'কত শীঘ্রি? কবে যাবেন ভাবছেন?'

'আজ রাতে।'

'আজ রাতে? কিন্তু তৈরি হতে সময় লাগবে না আপনার?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল রানা, 'হাতে সময় নেই। বন্দি ছেলেটার কাছে শুনেছি আমার বন্ধুর ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন করা

হচ্ছে। যে-কোনও সময় মারা যেতে পারে ও। কাজেই যা করার দ্রুত করতে হবে আমাকে।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' মাথা নাড়ল ইউনূস মোসাদ্দেক।

'আমারও না,' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল রানা।

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল আহম্মদ আলী। 'আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম সাহায্য করব। কথা রাখব আমি। সঙ্গে কতজন লোক লাগবে আপনার?'

'ঈসা যাচ্ছে আমার সঙ্গে,' বলল রানা। 'এছাড়া ঘোড়া নিয়ে পাঁচজন যদি বাইরে অপেক্ষা করে তা হলেই চলবে।'

মাথা নাড়ল অসম্মত আলফাজ কুশে। 'এতো কম লোক নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করবেন কী করে আপনি?'

'আক্রমণ করব না,' বলল রানা। 'আক্রমণ বলতে আপনারা যা বোঝেন সে-ধরনের কিছু করার পরিকল্পনা নেই আমার। গোপনে ঢুকব, গোপনে বেরিয়ে আসব। বন্দি সৈনিককেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'বিশ্বাস করছেন ওকে?' বিস্মিত চোখে রানার দিকে তাকাল আহম্মদ আলী।

'না। তবে ঝুঁকিটা আমাকে নিতে হবে। ছেলেটা বলেছে দুর্গের চারপাশে মাইনফিল্ড আছে। জায়গাটা পার হতে ওর সাহায্য দরকার হবে আমার।'

ইউনূস মোসাদ্দেক বলল, 'কিন্তু বিধর্মীটা যদি চিৎকার করে প্রহরীদের সতর্ক করে দেয়? বিশ্বাসঘাতকতা তো করতেই পারে।'

ক্ষণিকের জন্য কঠোরতার ছাপ পড়ল রানার চেহারায়। 'কথা দিচ্ছি আপনাদের, ও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তা হলে মরতে হবে ওকে।'

'মরতে হবে আপনাকেও,' বলল আলফাজ কুশে।

রানার কাঁধে হাত রাখল আহম্মদ আলী, গম্ভীর স্বরে বলল,

'আপনার মতো দুর্দান্ত একজন বুযকাশি খেলোয়াড় মারা যাবে ভাবলে কষ্ট হচ্ছে আমার বুকের ভেতর। আমি চাই আরও অনেকবার বুযকাশি খেলায় জয়ী হোন আপনি।'

'পরেরবার আপনি আমাকে হারিয়ে দেবেন,' মৃদু হাসল রানা।

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবল আহম্মদ আলী, দাড়িগুলো হাতাল, তারপর বলল, 'পারি কি না সেটা আমি দেখতে চাই।'

কথা শেষ হয়ে গেছে, বলবার আর কিছু নেই, কাজেই বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল রানা, ঈসাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল, বেরিয়ে এসেছে আহম্মদ আলীও, ওদের দিকেই আসছে। দাঁড়াল রানা। ওর পাশে এসে থামল সর্দার, আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, 'আল্লাহ্ বোধহয় এবার আপনার সহায় নন।'

'কেন?'

আঙুল তুলে ওপরে দেখাল আহম্মদ আলী। ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ, কালো মেঘ উড়ে চলেছে তীব্র বেগে। 'ঝড় আসছে।'

বুকের মধ্যে উত্তেজনার জোয়ার অনুভব করল রানা। মৃদু স্বরে বলল, 'হয়তো ভুল বলছেন আপনি। আল্লাহ্ বোধহয় আমার পক্ষেই আছেন।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝিয়ে বলার সময় নেই এখন, পরে হয়তো বলার সময় আসবে।'

'আমি যাচ্ছি আমার লোকদের বলতে যে তৈরি হতে হবে ওদের,' ঘুরে দাঁড়িয়ে পাইন বনের দিকে চলল সর্দার আহম্মদ আলী।

ঈসা আজনবীর দিকে তাকাল রানা। 'ঈসা, রওনা হতে হবে আমাদের। ঝড় শুরু হবার আগেই। আপনি ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে ফেলুন। তিনটে ঘোড়া তৈরি রাখবেন।' ঈসা পাইন বনের

দিকে এগোতেই দ্রুত পায়ে নিজের তাঁবুতে গিয়ে আফগান পোশাক বদলে পরে নিল কমান্ডো-ফেটিগ। তারপর প্রহরীরা যেখানে রেখেছে উইলিয়াম হবসনকে চলল সেই গুহার দিকে। ঢুকেই কোনও ভূমিকা না করে থম মেরে বসে থাকা আমেরিকান তরুণকে বলল, 'তুমিও আমার সঙ্গে আসছ, হবসন। চলে এসো।'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল তরুণ বন্দি। 'তা হলে আমাকে সঙ্গে নিচ্ছেন? বিশ্বাস করছেন আমাকে?'

'এসো,' ওর প্রশ্নের জবাব দিল না রানা।

বাইরে বেরিয়ে ওরা দেখল জোর বাতাস বইতে শুরু করেছে। পাইন বনের কাছ থেকে ডাকল ঈসা আজনবী। 'এদিকে, জনাব রানা।'

মিনিট দশেক পর রওনা হলো ওরা। আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল উইলিয়াম ওরফে বিল হবসন তার রাইফেলটা ফেরত পেয়ে। ওটায় গুলি ভরা আছে কি না পরখ করে দেখতে ভুলে গেল।

পাইনের বন পিছনে ফেলে উত্তর-পশ্চিমে এগোল ওরা। পথ দেখাচ্ছে আহম্মদ আলীর গোত্রের একজন গেরিলা। একটু পরেই শুরু হলো পাথুরে, পাহাড়ি পথ, এঁকেবেঁকে টিলার কাঁধ বেয়ে চলে গেছে কোথায় কে জানে। গাঢ় অন্ধকারে পথ চলতে হচ্ছে, পথ দেখাবার জন্য নক্ষত্রের সামান্য আলোটুকুও নেই। পাইন বন পিছনে ফেলে আসবার পর থেকেই শুরু হয়েছে বাতাসে ওড়া ধুলো-বালির ঝাপটা। তার ভিতর দিয়ে পথ করে একের পর এক পাহাড়ি ঢাল পার হচ্ছে ওরা আটজন। ঘণ্টা দুয়েক পর একটা জায়গায় পৌঁছে ঘোড়া থামাল পথপ্রদর্শক গেরিলা। জায়গাটা টিলার ওপর একটা শুকনো, গভীর ডোবা বলে মনে হলো রানার। অবশ্য এই জোর বাতাস ও ধূলিঝড়ে ঠিক মতো বুঝবার উপায় নেই ওর ধারণা সঠিক কি না। ঝড়ের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে আরও।

এপর্যন্ত আসতে বারবার শ্বাস-কষ্টের শিকার হতে হয়েছে সবাইকে। পরিচিত পথ ব্যবহার করেছে গাইড, তারপরও পথ

রুদ্ধ করা পাথর এবং উপড়ে পড়া গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে বারবার হোঁচট খেয়ে এগোতে হয়েছে অন্ধকারে। পথপ্রদর্শক গেরিলা যদি এলাকাটা নিজের হাতের তালুর মতো ভাল করে না চিনত, তা হলে নির্দিষ্ট উপত্যকায় সকালের আগে কিছুতেই পৌঁছতে পারত না ওরা।

ঝড়টা সুবিধে করে দেবে, সবার দেখাদেখি ঘোড়া থামিয়ে মনে মনে বলল রানা।

রাতের আঁধারের সঙ্গে ঘন ধুলো-বালির মেঘ মিলে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছে যে, শত্রুপক্ষের চোখে ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তা ছাড়া, যারা দুর্গটা পাহারা দিচ্ছে তারাও আজ স্বাভাবিকের চেয়ে কম সতর্ক থাকবে বলেই মনে হয়। আপন মনে ভাবল রানা, আহম্মদ আলী ভুল বলেছিল সম্ভবত, স্রষ্টা ওর সঙ্গে আছেন।

পথপ্রদর্শক গেরিলা তার ঘোড়া থেকে নামল। সামনে ডোবার ঢালু দেয়ালের গায়ে একটা গুহা, সেটার মধ্যে ঘোড়াটা ঢোকাল সে। তার দেখাদেখি ঈসা আজনবী ও অন্য চারজন আফগানও নামল ঘোড়া থেকে, জন্তুগুলোকে গুহার ভিতরে ঢোকাতে শুরু করল। নামল রানাও, দেখল বিল হবসনও নামছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে গুহার মুখের সামনে দাঁড়াল ও, ঠেলে ভিতরে ঢুকতে বাধ্য করল ঘোড়া দুটোকে। হবসনের পিছু নিয়ে নিজেও ঢুকল।

'ফোর্টের কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা,' পথপ্রদর্শক গেরিলা মুখ খুলবার আগেই বলল হবসন। ঝড়ো বাতাসের কারণে আবছা ভাবে তার কথা শুনতে পেল রানা। 'ঘোড়াগুলো এখানে আড়ালে থাকতে পারবে। পাহাড়ি ঢাল ঝড় থেকে বাঁচাবে ওগুলোকে।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'দুর্গ আর কতোটা দূরে?'

পকেট থেকে বের করে কম্পাসের ফসফোরেসেন্ট ডায়াল দেখল তরুণ হবসন। উত্তর-পশ্চিমে হাত তুলল। 'ওদিকে আর তিন-চারশো গজ।'

সন্দেহের দোলায় দুলল রানার মন। 'ঠিক তো? ঝড়ের মধ্যে তুমি হয়তো ভুল করছ দূরত্ব।'

'গত তিনমাস এখানে আছি আমি,' বলল হবসন। 'আমি একশো ভাগ গ্যারান্টি দিতে পারি যে ওদিকে খুব কাছেই আছে ফোর্ট।'

'আবহাওয়ার যেরকম অবস্থা তাতে হয়তো ওটাকে আমরা পাশ কাটিয়ে এসেছি,' সন্দেহ দূর হলো না রানার মন থেকে।

'ফোর্টটা এতো ছোট নয় যে চোখ এড়িয়ে যাবে,' আপত্তি করল হবসন। 'তবে মনে রাখবেন, বন্দিদের ফোর্টের উত্তর দিকে রাখা হয়। ডানজনে।'

রানার গা ঘেঁষে দাঁড়াল ঈসা আজনবী। তার হাতে একটা ক্যান। 'এটা মেখে নিন,' ওটা খুলে তাগাদার সুরে বলল সে।

'কী এটা?' ক্যানটা নিল না রানা।

'চিতাবাঘের চর্বি দিয়ে তৈরি গ্রিয,' বলল ঈসা।

মৃদু হাসল রানা। 'যেরকম বালিঝড় হচ্ছে তাতে এর কোনও দরকার হবে বলে তো মনে হয় না।'

'বাইরের এই আবহাওয়ার কথা চিন্তা করলে আপনার কথাই ঠিক, কিন্তু দুর্গের ভেতরে?' ক্যান বাড়িয়ে দিল ঈসা।

'কিন্তু কেন?' ঈসার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না রানা।

ঈসা বলল, 'পাহারাদার কুকুরগুলো চিতাবাঘের গায়ের গন্ধ পেলে ঘেউ-ঘেউ করবে না, দূরে পালিয়ে যাবার আগে ভয়ে মুতেও দিতে পারে।'

মুখে, ঘাড়ে, বাহুতে গ্রিয মেখে নিল রানা। হাত দুটো মুছে নিল শার্টে। হাত পিছলা থাকলে চলবে না। প্রয়োজনের মুহূর্তে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করবার জন্য শক্ত করে অস্ত্র ধরতে হবে ওকে।

আঠালো গ্রিযে উড়ন্ত ধুলো-বালির কণা এসে আটকে যাচ্ছে। আধ মিনিটেই ঘন ধুলো-বালি ওড়ানো ঝড়ো বাতাসের ধূসর রং পেল রানার মুখ, ঘাড় ও বাহু।

গ্রিয মেখেছে তরুণ হবসন ও ঈসা আজনবীও, তাদেরও দেখে মনে হলো উড়ন্ত বালিঝড়েরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। জিন থেকে নামিয়ে রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চারটা বাম কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা, ডান কাঁধে ঝুলাল হুক লাগানো দড়ির কয়েল। রাইফেল চেক করে নিল ঈসা আজনবী। একই কাজ করতে যাচ্ছিল হবসন, রানা বলল, 'দরকার নেই, চলো রওনা হওয়া যাক। তুমি তো কাউকে গুলি করবে না।'

আবার রাইফেলটা কাঁধে ঝোলাল হবসন, আস্তে করে মাথা দোলাল। 'কাউকে খুন করা সম্ভব না আমার পক্ষে।'

হবসনের কাঁধে হাত রাখল রানা, নিচু গলায় বলল, 'পথ দেখাও।'

গলা চড়িয়ে পাঁচ গেরিলাকে কী যেন বলল ঈসা আজনবী, তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি বলেছিলেন এক ঘণ্টার কথা। আমি ওদের বলেছি দেড় ঘণ্টার মধ্যে যদি আমরা না ফিরি তা হলে যেন ফিরে যায় ওরা।'

গুহা থেকে বের হলো তিনজন। ঝড়ের ভিতর তিন ফুটও দৃষ্টি চলে না। তরুণ আমেরিকান সৈনিকের শার্টের পিছনটা ধরে আছে রানা, ওর শার্টের পিছনটা খামচে ধরেছে ঈসা আজনবী।

খানিকটা সামনে এগোতেই পিঠে বাতাসের জোরাল ধাক্কা টের পেল রানা, ওকে কুঁজো করে দিতে চাইছে ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা। তীব্র বেগে ছুটে আসা ধুলো-বালি শরীরের উন্মুক্ত জায়গায় কামড় বসাচ্ছে, মনে হচ্ছে শত শত পিন দিয়ে খুঁচিয়ে চামড়া ফুটো করতে চাইছে কেউ। চারপাশে ঝড়ের শোঁ-শোঁ গর্জন। কিছুক্ষণ পর রানার মনে হলো অপেক্ষারত গেরিলাদের অন্তত তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলে আসা উচিত ছিল। হয়তো ঝড়ের কারণেই ওর মনে হচ্ছে আধঘণ্টা হয়ে গেছে ওরা এক নাগাড়ে এগিয়ে চলেছে। ঝড়ের বেগ বাড়ছে ক্রমেই, মনে হচ্ছে সারা দুনিয়ায় এই বালিঝড় ছাড়া আর কোনও কিছুর কোনও

অস্তিত্ব নেই। হঠাৎ হঠাৎ ভয় হচ্ছে, উপত্যকার মেঝে বাতাসের তোড়ে পায়ের নীচ থেকে সড়াৎ করে সরে যেতে পারে যে-কোনও সময়, আর তা হলেই পড়ে যেতে হবে অন্তহীন গভীর খাদের ভিতর।

রানার শার্ট খামচে ধরে আছে ঈসা আজনবী। আরও শক্ত করে হবসনের শার্টের পিছনটা ধরল রানা। একটু পরেই থামল তরুণ আমেরিকান, কুঁজো হলো, কম্পাসটা দেখল সামনে ঝুঁকে। কোর্স বদলে সামান্য ডানদিকে এগোল সে আবার। তিনজনের কেউ তাড়াহুড়ো করছে না, ঝড়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে মাঝারী গতিতে এগোচ্ছে।

রানার মনে হলো আরও আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে। কিন্তু যুক্তি বলছে ছয় মিনিটের বেশি হবে না ওরা গুহা থেকে বেরিয়েছে। ছয় মিনিট। তা হলে তো এতক্ষণে দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার কথা ওদের। পথ ভুল করেনি তো হবসন? সন্দেহের দোলায় দুলতে শুরু করল রানার মন। বোধহয় দুর্গটা আমরা পাশ কাটিয়ে এসেছি। পার হয়ে এসেছি দুর্গ। এভাবে এগোতে থাকলে একসময় উপত্যকার শেষে পৌঁছে যাব।

কঠোর ট্রেইনিং রানার কল্পনার রাশ টেনে ধরল, হতাশা ঝেড়ে ফেলে ধৈর্য ধরল ও। সোহেলের কথা মনে করে শান্ত রাখল নিজেকে।

আরও পাঁচ মিনিট পর বালিঝড়ের ভিতর দিয়ে আবছা একটা আভা দেখতে পেয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল ওর মন থেকে। একটা সার্চলাইট! তার মানে দুর্গ! ওটা দুর্গ-প্রাচীরের বাইরের একটা সার্চলাইট। দূরে আরেকটা আভা দেখতে পেল রানা। তারপর আরেকটা। ডান থেকে বামে, নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর তিনটে সার্চলাইট ঝড়ের রাত আলোকিত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ওগুলো এখন বিপদের কারণ হতে পারবে না। ছুটে চলা উড়ন্ত ধুলো-বালির কারণে সার্চলাইটের তীব্র আলো পাঁচ ফুটও

আলোকিত করতে পারছে না ঠিক মতো। তবে ওগুলো রানার কাজে আসবে। দুর্গ-প্রাচীরের অবস্থান বুঝতে সাহায্য করবে বাতিগুলো।

তিনজনই দেখেছে বাতির আভা। চলার গতি কমাল ওরা, কুঁজো হয়ে এগিয়ে চলল। তারপর থামল হবসন। কারণটা জানতে তার পাশ থেকে তাকাল রানা। হবসনের খানিকটা সামনে জঞ্জাল মতো কীসব যেন আছে। ওটা কী বুঝতে পারল এবার ও।

বুক সমান উঁচু, তিন ফুট ব্যাসের কাঁটাতারের রোল।

উপত্যকায় আসবার সময় হবসন বলেছে, 'ফোর্টের মাইনফিল্ড তৈরিতে হাত লাগাতে হয়েছিল আমাকে। কাঁটাতারের বেড়ার পর থেকে শুরু হয়েছে মাইনফিল্ড, যাতে সৈন্যরা ভুল করে ওখানে চলে না যায়। মাইনগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী, বিস্ফোরণ হলে শুধু পা উড়িয়ে দেবে না, ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে শরীর। বাঁচার কোনও উপায় নেই।'

রানা লক্ষ করল, কাঁটাতারের বেড়া বাধা হিসেবে যতটুকু কাজ করছে সেটা গোনার মধ্যে ধরা যায় না। ওটার কাজ আসলে শেষ সীমানা নির্ধারণ করা। ওর ইশারায় সঙ্গে নিয়ে আসা একটা কম্বল বেড়ার ওপর পাতল ঈসা আজনবী, তারপর সহজেই পার হয়ে গেল বেড়া। রানা ও হবসনও পেরিয়ে গেল কাঁটাতারের বেড়া। মাত্র কয়েকটা কাঁটা কম্বল ফুটো করতে পারল। দু'একটা খোঁচা খেল রানা, কিন্তু পাত্তা দিল না।

ওদের সামনে থেকে শুরু হয়েছে মাইনফিল্ড। হবসনের কথা অনুযায়ী কাঁটাতারের বেড়া থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে দুর্গের প্রাচীর, কিন্তু তীব্র বালি-ঝড়ের ভিতর ওই প্রাচীর দেখতে পেল না রানা। সার্চলাইটগুলো ঘুরছে, উপত্যকায় আলো ফেলতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ওগুলো ওদের বিরুদ্ধে কোনও কাজে আসবে না, বুঝতে পারছে রানা। ওদের পরনে বালিরঙা পোশাক, তার ওপর ধুলো-বালি মাখা গ্রিয – ঝড়ো বাতাসে ছুটে চলা লক্ষ লক্ষ বালি-কণার

সঙ্গে মিশে গেছে তিনজন। একটা সার্চলাইট ওদের দিকে ঘুরছে দেখে কাঁটাতারের পাশে শুয়ে পড়ল ওরা। ওদের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল অস্পষ্ট আলোর আভা, শঙ্কা নিয়ে আধ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, কোনও সাইরেন বেজে উঠল না।

হবসন বলেছে ট্যাঙ্ক আর আর্মার্ড পারসোনেল্ ক্যারিয়ারগুলো দুর্গের পিছনে করোগেটেড স্টিলের দেয়াল ঘেরা মজবুত ছাউনিওয়ালা গ্যারাজে রাখা হয়। গানশিপগুলো যেখানে থাকে, সেখানে অবশ্য ছাউনি নেই। ঝড়ের সময় ওগুলোকে তারপুলিন দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। দুর্গের বাইরে, সামনে ও দু'পাশে ফাঁকা জমি, তবে পাহারা থাকে ওসব জায়গায়। কখনও কখনও পাহারাদার কুকুরও সঙ্গে রাখে গার্ডরা।

রানার মনে প্রশ্ন জাগল, আজকে যেরকম প্রচণ্ড বালি-ঝড় হচ্ছে তার পরেও কি পাহারার ব্যবস্থা রাখা হবে? কুখ্যাত সেই কালো বাতাস নয় ঝড়টা, তবে বাংলাদেশের কাল-বৈশাখীর চেয়ে তীব্র বেগে বইছে বাতাস, সেই হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ধুলো-বালির অজস্র কণা। ঘন ধুলো-বালির মধ্যে প্রহরী সৈনিকরা যদি থাকেও, কতটুকু বিপদের কারণ হতে পারবে তারা? তিন ফুট দূরেও দেখতে পাবে না কেউ। কাজেই তাদের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই চলে। ঝড়ের মধ্যে বাইরে থাকলে বরং নিজেরাই তারা বিপদে আছে। বেশিক্ষণ এই অসহনীয় পরিবেশে থাকলে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। এমন হবার সম্ভাবনাই বেশি যে, সুপিরিয়র অফিসাররা তাদের দুর্গের দেয়ালের ভিতরেই রাখবার কথা ভাববে, দুর্যোগের এই রাতে নিশ্চিন্তে নির্ভর করবে মাইনফিল্ডের দেয়া নিরাপত্তার ওপর। মাইন ফাটলে প্রাচীরের ওপরের সৈনিকরা আওয়াজ শুনেই টের পাবে, দুর্গের দিকে আসছে কেউ।

এসব শুধুই ওর ভাবনা, বিভিন্ন সম্ভাবনা। সত্যি না-ও হতে পারে। এখন প্রথম সমস্যা মাইনফিল্ড পেরোনো। ইশারায়

হবসনকে এগোতে বলল রানা।

কাঁটাতারের বেড়ার পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল তরুণ, এক হাতে মাঝে মাঝে বেড়া ধরে দেখছে। একটা খুঁটির সামনে থামল সে, তারপর আবার দুর্গের দিকে ফিরল।

আরেকটা সার্চলাইটের আভা ওদের মাটিতে শুয়ে পড়তে বাধ্য করল। শঙ্কায় কেটে গেল কয়েকটা সেকেন্ড। সাইরেন বাজল না এবারও।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, টের পেল ঈসা ও হবসনও উঠে বসেছে। খুব ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল হবসন।

কাঁটাতারের বেড়া আটকে রাখার খুঁটিগুলো মাইনফিল্ড পার হবার চাবিকাঠি, আসবার পথে জানিয়েছে হবসন। ওই খুঁটিগুলো থেকেই নির্দিষ্ট প্যাটার্নে বিস্ফোরক বসানো হয়েছে।

'মাইনফিল্ডে কোনও প্যাটার্ন থাকে বলে তো শুনিনি,' নিঃসন্দেহ হবার জন্য বলেছে রানা।

ব্যাখ্যা করেছে হসবন। যদি বিপক্ষের সৈনিক বা গাড়ি-ঘোড়া উড়িয়ে দিতে কোনও রাস্তা বা মাঠে মাইন পোঁতা হয়, তা হলে ছক ধরে করা হয় না কাজটা। কিন্তু দুর্গের ব্যাপারটা ভিন্ন। এখানে মাইন পোঁতার সময় চিন্তা করা হয়েছে, যদি গেরিলারা কাঁটাতারের বেড়া পার হয় এবং মাইন বিস্ফোরণে উড়ে যায়, তা হলে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সরাতে হবে। সরাতে হলে মাইনফিল্ডে ঢুকতে হবে আমেরিকান সৈনিকদের। মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করে তারা, তবে কাজটা দ্রুত সারবার জন্য এমন ভাবে মাইন বসানো হয়েছে যে সৈনিকরা ভাল করেই জানে, মাইন কোথায় আছে, কোথায় নেই।

'খুঁটিগুলো থেকে একটা নির্দিষ্ট ছক ধরে মাইন বসিয়েছি আমরা,' বলেছে হবসন। 'বেজোড় নম্বর ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে ছক। এক, তিন, পাঁচ ও সাত ব্যবহার করা হয়েছে। খুঁটি

থেকে দুর্গের দিকে প্রতিবার কয় পা এগোতে হবে সেটাই জানানো হচ্ছে নম্বরগুলো দিয়ে। এক সংখ্যায় দু'ফুট ডানে একটা মাইন বসিয়েছি আমরা। তিন নম্বরে দু'ফুট বামে আরেকটা। এভাবে বসানো হয়েছে সবগুলো মাইন। শেষে একবারে সাত পা যাবার পর উল্টো ভাবে মাইন বসানো আছে। তখন ডান হয়ে যাবে বাম, বাম হয়ে...'

ছেলেটা সত্যি না বলে থাকলে নিজেও মরবে, মাইনফিল্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবল রানা।

'এগোও তুমি,' হবসন দ্বিধা করছে দেখে তাগাদা দিল ও। 'আমরা পেছনে আসছি।'

শোঁ-শোঁ বাতাসের ভিতর দিয়ে কুঁজো হয়ে সামনে বাড়ল হবসন। খুব ধীরে এগোচ্ছে সে। পিছু নিল রানা ও ঈসা আজনবী। এখন যদি কোনও মাইন ফাটে তা হলে তিনজনই ওরা উড়ে যাবে। কিন্তু হবসনের কাছ থেকে পিছিয়ে পড়বার উপায় নেই। হবসন কোথা দিয়ে হাঁটছে সেটা দেখতেই তার গায়ের কাছে থাকতে হচ্ছে।

দরদর করে ঘামছে রানা। ওর গ্রিয ধুয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে হবসন। আরেকবার সার্চলাইটের আলো ওদের দিকে ফিরে এলো।

যদি শুয়ে পড়ি তা হলে হয়তো মাইন ফাটবে, ভাবল রানা। যদি না শুই তা হলে...

বসে পড়ল রানা। ওর দেখাদেখি ঈসা আজনবীও বসল।

ফ্যাকাসে হলদে আলোটা আরও কাছে চলে আসছে।

ওদের ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেল। এখনও সরে যাচ্ছে।

আবার সামনে বাড়ল হবসন, মাইনফিল্ডের আরও ভিতরে ঢুকে পড়ছে সে রানা ও ঈসা আজনবীকে পিছনে নিয়ে।

কতটা সময় পেরিয়েছে সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই রানার। রোলেক্স ঘড়ির লুমিনাস ডায়ালটা দেখল। প্রায় পনেরো মিনিট

হলো ওরা গুহা থেকে রওনা দিয়েছে। এখনও দুর্গে ঢুকতে পারেনি ওরা। দুর্গে ঢুকে নিরাপদে সোহেলকে বের করে আনতে হবে, তারপর আবার ফিরতে হবে ওই গুহায়। দেড় ঘণ্টায় সম্ভব হবে? দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে তো ঘোড়া নিয়ে ফিরে যাবে আফগানরা, ধরে নেবে ব্যর্থ হয়েছে ওরা! হবসনকে তাড়াতাড়ি এগোবার জন্য তাগাদা দিতে ইচ্ছে করল ওর, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকল। দ্রুত নয়, প্রয়োজনে আরও ধীরে এগোনো উচিত ওদের।

হিসাব কষতে থামল হবসন, দু' পা এগোল, তারপর আবার থামল।

রানা ধারণা করল সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে হবসন। তার মানে কি সে জানে না এখান থেকে কীভাবে এগোতে হবে? উৎকণ্ঠা অনুভব করল ও। হবসনের পাশ দিয়ে তাকিয়ে এবার দেখতে পেল কেন থেমেছে ছেলেটা। তার সামনে আরেক প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার ওপর কম্বলটা পাতল হবসন, তারপর পেরিয়ে গেল বেড়া। রানা ও ঈসাও দেরি করল না।

'এই বেড়ার এদিকে আর কোনও মাইন নেই,' নিচু গলায় রানার কানের কাছে বলল হবসন। 'তবে এদিকে গার্ড থাকতে পারে।'

'এসো!' চাপা স্বরে নির্দেশ দিয়ে দ্রুত পৌঁছে গেল রানা দুর্গ-প্রাচীরের সামনে, প্রাচীরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল, তাকাল এদিক-ওদিক। এই আবহাওয়ায় কি বাইরে গার্ড থাকবে? যদি থাকে তা হলে একেবারে গায়ের কাছে চলে আসবার আগে তাদের দেখতে পাবে না ও।

চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল রানা। আরও অনেক রকমের সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে ওকে। বেশি ভাববার সময় বা সুযোগ কোনওটাই নেই ওর এখন।

হবসনকে ছিটকে সামনে বাড়তে দেখল রানা। পালাচ্ছে?

সতর্ক করে দেবে ছেলেটা গার্ডদের? ধরা পড়তে হবে? সোহেলকে উদ্ধার করা যাবে না? এক সেকেন্ডও লাগল না রানার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে, কমান্ডো নাইফটা এক ঝটকায় বের করেই তীরের মতো পিছু নিল ও হবসনের। ছেলেটাকে খুন করতে চায়নি ও, কিন্তু এছাড়া এখন আর কোনও উপায়ও নেই।

কিন্তু পালাচ্ছে না হবসন, এই মাত্র বালির পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ছায়ামূর্তি, দূরত্ব তিন ফুটের বেশি হবে না। সোজা তার সামনে থামল হবসন, রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলেছে আগেই। ওটার বাঁট দিয়ে গার্ডের চোয়ালে কষে একটা বাড়ি মারল সে। ধুপ করে পড়ে গেল অপ্রস্তুত অসতর্ক গার্ড। লোকটা জ্ঞান হারিয়েছে নিশ্চিত হবার জন্য আরেকবার তার চোয়ালে কুঁদো দিয়ে গুঁতো দিল হবসন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, তার ঠিক দেড় ফুট পিছনে উদ্যত ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে আছে রানা। 'অজ্ঞান হয়ে গেছে,' বলল হবসন। 'হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিই, কী বলেন?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, কমান্ডো নাইফটা খাপে পুরে রাখল, মনে মনে বলল, তুমি জানো না, নিশ্চিত মৃত্যুর একচুল দূর থেকে ফিরে এসেছ তুমি, হবসন।

ঈসা আজনবীও চলে এসেছে ওদের পাশে। তিনজন মিলে ছেঁচড়ে অজ্ঞান সৈনিককে দেয়ালের কোনায় টেনে নিয়ে গেল ওরা। জায়গাটা সার্চলাইটের আওতার বাইরে। দক্ষ হাতে অচেতন সৈনিককে বাঁধল হবসন, ঈসা আজনবী তার নাক ঝাড়ার রুমালটা পুরে দিল গার্ডের মুখের ভিতর।

এবার প্রাচীর বেয়ে উঠতে হবে। কোনার সার্চলাইট থেকে মাঝখানের প্যারাপেটের সার্চলাইট – মাঝখানের একটা জায়গা বাছল রানা। প্রাচীরের উচ্চতা চল্লিশ ফুটের কম হবে না। কাঁধ থেকে দড়ির কয়েলটা নামাল ও, দড়ির শেষমাথা ধরে ফোল্ডেড হুক ছুঁড়বার জন্য তৈরি হলো। একবার দেখে নিল দড়িতে কোনও

প্যাঁচ লেগে নেই, তারপর ওপরে, দেয়ালের কিনারা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল হুক। ঠিক করেছে নিতান্ত বাধ্য না হলে গ্রেনেড লঞ্চার ব্যবহার করবে না।

বাতাসের কারণে দড়িতে এতো জোর টান পড়ল যে হালকা হুকটা প্রাচীরের চার ভাগের তিনভাগ পর্যন্ত গিয়ে গতি হারিয়ে পড়ে গেল বালিতে।

ওটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার ছুঁড়ল রানা, এবার আগের চেয়ে জোরে। দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। এই ঝড়ের রাতেও কি প্যারাপেটে গার্ড থাকবে? থাকলে সে কি এই জোর বাতাসের মাঝেও রাবার কোটিং দেয়া ধাতব হুক রেইলিঙে আটকাবার মৃদু আওয়াজটা শুনতে পাবে? হবসন বলেছে খারাপ আবহাওয়ায় সেন্ট্রি-বক্সে থাকে গার্ডরা। সামনের দেয়ালে তিনটে সেন্ট্রি-বক্স আছে। একটা মাঝখানে, দুটো দেয়ালের দুই কোনায়।

হুকটা আটকে গেল দেয়ালের রেইলিঙে।

নয়

বুট পরা পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। শিউরে উঠল সোহেল। আবার আসছে ওরা। দু'জন। হেনরি মর্গান, সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম। পায়ের আওয়াজগুলো চেনে ও। তার মানে আবারও ইন্টারোগেশনের নামে শুরু হবে নির্যাতন। সমস্ত মানসিক জোর একত্রিত করে দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষায় থাকল সোহেল। দড়াম করে খুলে যাবে দরজা, ভেতরে ঢুকবে আমেরিকান কর্নেল। তার পিছু নিয়ে আসবে সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম।

পুরো একটা মিনিট পেরিয়ে গেল, কুঠুরির দরজাটা খুলল না কেউ। পায়ের আওয়াজ করিডরে থেমে গেছে। জানালার গরাদে ঝাপসা ভাবে কর্নেল মর্গানের মুখটা দেখতে পেল সোহেল।

'আমার সুপিরিয়র অফিসাররা যোগাযোগ করেছে,' কর্কশ স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল হেনরি মর্গান। 'এই সেক্টরে যা ঘটছে তাতে তারা আমার ওপর অখুশি। তারা অখুশি বলে আমিও অখুশি। তোমাকে কথা দিচ্ছি, কালো কুত্তার বাচ্চা, আমার চেয়ে বেশি অখুশি হয়ে উঠবে তুমি শীঘ্রি। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি। এখনও ভেবে দেখো, যা জানতে চাই সেটা জানাবে তুমি, না মরবে?'

'যদি আমার কিছু বলার থাকত আর বলতাম, তা হলে ওই অসহায় আফগানদের মতোই গুলি করে মারতে তুমি আমাকে,' দুর্বল গলায় বলল সোহেল।

'মুখ না খুললে তোমার মনে হবে গুলি খেয়ে মরলে প্রাণে বেঁচে যেতে,' দাঁতে দাঁত চাপল কর্নেল। 'আজ রাতে মুখ খুলবে তুমি, খুলতেই হবে। আমি যখন আবার আসব তখন স্পষ্ট বুঝবে, এখন পর্যন্ত ফুলের টোকাও দেয়া হয়নি তোমার গায়ে। যদি নিজের ভাল চাও তো গড়গড় করে বলে দেবে সব। বলার পর পানি দেব তোমাকে, বাতিগুলো নেভাবার হুকুম দেব, ব্যথা কমাবার জন্যে সেডেটিভ দেবে তোমাকে ডাক্তার। বলবে কি না সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি তোমাকে। এই আধঘণ্টা যাতে স্বচ্ছ চিন্তা করতে পারো সেজন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।'

জানালার গরাদের ওপাশ থেকে সরে গেল হেনরি মর্গানের লালচে চেহারা।

জোরে একটা ধাতব দরজা খুলবার শব্দ পেল সোহেল। ওর কুঠুরির দরজা খোলেনি। তবে সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম বোধহয় এখনই আসবে।

'বয়স কতো তোমার?' কর্নেল মর্গানের চড়া গলা শুনতে পেল

সোহেল। একই কথা পশতুতে জিজ্ঞেস করল আরেকজন। লোকটার গলা চেনে ও। সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম। এবার ইংরেজিতে কর্নেলকে জানাল সে বয়স কতো।

'তেরো? খুব দুঃখের কথা!' কপট আফসোসের সঙ্গে বলল কর্নেল।

কী ঘটছে প্রথমে বুঝতে পারল না সোহেল, তারপর টের পেল কর্নেল মর্গানের উদ্দেশ্য। ঘৃণায় ভরে গেল ওর অন্তর। নীচ পশুটা ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে কোনও বাচ্চাকে টর্চার করবে!

'সত্যি, খুবই দুঃখের কথা! ওই পাশের সেলে এক লোক আছে। সে আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। সে মুখ খুলছে না বলে তোমাকেই জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে আমার। তুমি জানো নিশ্চয়ই ইউনূস মোসাদ্দেক, আলফাজ কুশে আর আহম্মদ আলী তাদের দলবল নিয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে?'

কচি একটা গলা শুনতে পেল সোহেল। ভয়ে কাঁপছে গলাটা।

'জানো না? সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম, ওর বুকে অল্প অল্প করে অ্যাসিড ঢালো তো!'

অমানুষিক আর্তচিৎকারটা এমনই করুণ, হৃদয়স্পর্শী, যে বুকের ভিতর কাঁপ ধরে যায়। অজান্তেই শরীরটা ছেঁচড়ে কুঠুরির এক কোণে সরে গেল সোহেল। মেঝেতে কান চেপে ধরল, আহতটা হাতটা দিয়ে ঢাকল বাম কান।

তারপরও শোনা যাচ্ছে বাচ্চা ছেলেটার আর্তচিৎকার। অসহায়, আহত সোহেলের মনে হলো রাগে-দুঃখে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে ও।

কর্নেল মর্গানের চড়া গলা শুনতে পেল: 'শুধু যদি ওই বাংলাদেশি কুকুরটা মুখ খুলত, তা হলে তোমাকে জেরা করতে হতো না আমার।'

খবরটা গুজব কি না জানে না এখনও মেজর অ্যালবার্ট ডুরেল।

পাঁচ মিনিট আগে একজন করপোরাল বলে গেল। কিন্তু এতো বড় উন্মাদ ওই কর্নেল হেনরি মর্গান নামের পিশাচটা? যাবে না যাবে না করেও মনকে মানাতে পারছে না সে। খবরটা যখন জানল, একা একা বসে দাবা খেলছিল সে। এখন দাবার বোর্ডের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। মনস্থির করে উঠে দাঁড়াল সে, রওনা হলো দুর্গের ডানজনের দিকে।

করিডরে পা দিয়েই মেজর ডুরেল বুঝতে পারল, যা শুনেছে সেটা গুজব নয়। শিউরে উঠল সে একটানা আর্তচিৎকারটা শুনে। বন্দি বাংলাদেশির উল্টোদিকের সেলের দরজাটা খোলা। ভিতরে ঢুকল সে। মুখ হাঁ হয়ে গেল ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখে, ঢোক গিলে বমি আটকাল অনেক কষ্টে। কিশোর ছেলেটাকে বেঁধে চিত করে ফেলে রাখা হয়েছে। পাশে বসে একটা বোতল থেকে তার উন্মুক্ত বুকে ফোঁটা ফোঁটা অ্যাসিড ঢালছে সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম। মাংস পোড়াচ্ছে অ্যাসিড, ছোট ছোট বুদ্বুদ তৈরি করছে দগদগে লালচে ক্ষতটায়।

'জবাব দাও!' গর্জে উঠল কর্নেল হেনরি মর্গান। 'ওই হারামির বাচ্চাগুলো কোথায়?'

একটানা চিৎকার করছে ছেলেটা অসহ্য কষ্টে। শরীর মোচড়াচ্ছে।

'সব ওই বাংলাদেশি হারামজাদার দোষ!' খেঁকিয়ে উঠল কর্নেল।

আরও খানিকটা অ্যাসিড ঢালল সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম। আর্তচিৎকারটা তীক্ষ্ণ হলো ছেলেটার। ছটফট করছে সে তীব্র কষ্টে। গলা-কাটা মুরগির ছটফটানির কথা মনে পড়ে গেল মেজর ডুরেলের। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছে সে। প্রচণ্ড ক্রোধ সামলে দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কর্নেল! কী করছেন এসব আপনি!'

'যা করা উচিত তাই করছি, মেজর,' না ফিরেই শান্ত গলায়

বলল কর্নেল মর্গান। 'দেখতেই পাচ্ছেন কী করছি। আর্মি ইন্টারোগেশন যদি সহ্য করতে না পারেন তো নিজের কোয়ার্টারে ফিরে যান।' সার্জেন্টের দিকে তাকাল সে। 'অ্যাসিড ঢালো, সার্জেন্ট। একটু পরে বাঁদরের বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশি কুত্তাটাকে দেখাব আমরা। কুত্তাটা বুঝুক তার কারণে এটার কী অবস্থা হয়েছে।'

'এমন হতেই পারে যে ওই বাংলাদেশি আসলে কিছু জানে না,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেজর ডুরেল। 'যদি জানেও তো কী এসে যায় তাতে! অযথা মাতবরি করতে এখানে এসেছি আমরা, অযথা শত্রু তৈরি করছি। এখানে আমাদের কাজটা কী! নিজেদের দেশকে রক্ষা করছি আমরা এখানে এসে গায়ে পড়ে লড়াই করে? আমাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি? কর্নেল...'

'আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন, মেজর ডুরেল,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কর্নেল হেনরি মর্গান। 'আপনার বোধহয় নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। ডাক্তার দেখান গিয়ে। আমি এখানে যা করছি সেটা মাদারল্যান্ড আমেরিকার স্বার্থেই করছি।'

'আমার হয়তো নার্ভাস ব্রেকডাউনই হয়েছে, সার, কিন্তু আপনি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন,' চেষ্টা করেও গলা নামাতে পারল না মেজর ডুরেল। যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত সে সাক্ষাৎ শয়তানটার ওপর! কিন্তু সাহসে কুলাল না তার।

'গেট আউট!' গর্জে উঠল কর্নেল মর্গান। 'কালকে ডিসঅর্ডারলি বিহেভিয়ারের জন্যে আপনার ব্যাপারে কী করা যায় সেটা নিয়ে ভাবব আমি। নাউ, গেট লস্ট!'

রাগে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে মেজর ডুরেল। সার্জেন্ট ট্রিসট্রিমকে ছেলেটার বুকে ফোঁটায় ফোঁটায় আরও অ্যাসিড ঢালতে দেখে তার মনে হলো নিজের মাথার চুল ছেঁড়ে। গোঙাচ্ছে ছেলেটা, চিৎকার করছে, কাতর স্বরে অনুনয়-বিনয় করছে, কিন্তু মুক্তি মিলবে না তার।

ঝড়ের বেগে ঘুরে দাঁড়াল মেজর ডুরেল, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ডানজন থেকে। দ্রুত তাকে সরে যেতে হবে; এমন কোথাও, যেখানে বাচ্চা ছেলেটার চিৎকার কানে আসবে না। কিন্তু ওই দৃশ্য মন থেকে মুছবে কী করে সে? প্রচুর পরিমাণে মদ গিলে বোধবুদ্ধিহীন হয়ে পড়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তার।

কমান্ডো ফেটিগের পকেট থেকে সাইলেন্সার বের করে ওয়ালথার পিপিকের নলে প্যাঁচ দিয়ে আটকাল রানা, পিস্তলটা কোমরের বেল্টে আলগা ভাবে গুঁজে উঠতে শুরু করল দড়ি বেয়ে। দু'পা দেয়ালে ঠেক দিচ্ছে ও উঠবার সুবিধের জন্য। ঘন বালি ওড়ানো জোর বাতাসের তোড়ে ওকে নিয়ে দুলছে দড়ি, ফলে দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা কষ্টকর ঠেকছে। এখন যদি ওপরের প্যারাপেট থেকে কোনও গার্ড রেইলিঙের কাছে আসে, তা হলে কালো রাবার মোড়া হুকটা দেখতে পাবে। নীচে উঁকি দিলে আবছা ভাবে হলেও দেখতে পাবে ওকে। ও যে প্রকাণ্ড কোনও মাকড়সা হতে পারে না সেটা বুঝতে দেরি হবে না তার। সহজেই গুলি করে ফেলে দিতে পারবে ওকে। সতর্ক করে দিতে পারবে অন্যান্য গার্ডদের।

মিনিট ছয়েক লাগল রানার প্যারাপেটের সমান উচ্চতায় পৌঁছে যেতে। এদিক ওদিক তাকাল রানা, কাউকে দেখতে না পেয়ে সাবধানে নিঃশব্দে রেইলিং টপকাল। দেখা যাচ্ছে না কাউকে। ঈসা ও হবসনকে উঠে আসতে ইশারা করল ও দড়িতে বার কয়েক টান দিয়ে। কথা হয়ে আছে ঈসার সঙ্গে, হবসনকে আগে ওপরে পাঠাবে সে।

ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। ঈসা আজনবী ও হবসন আসবার আগেই বেশ কিছু কাজ সেরে ফেলতে হবে ওকে। পকেট থেকে টাইম কন্ট্রোল্ড চার্জ বের করে ছায়ার মতো চলে গেল ও কোনার সেন্ট্রি-পোস্টের কাছে। করোগেটেড মেটাল ওয়ালের ওপাশ থেকে আবছা ভাবে গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পঁচিশ মিনিটে চার্জ

সেট করল রানা, দেয়ালের গায়ে সেঁটে দিল চৌকো বোমাটা। এরপর একই ভাবে চার্জ বসাল ও প্যারাপেটের মাঝখানের সেন্ট্রি-বক্সে। ওখান থেকেই সার্চলাইটগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

উঠানের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল বাইরের ঝড় অনেকটাই ঠেকিয়ে দিয়েছে দুর্গের চারপাশ ঘেরা উঁচু দেয়াল। উঠানে বালি উড়ছে এখানে ওখানে, কিন্তু সেটাকে বাইরের বালি-ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আলো-ছায়ার খেলা প্রশস্ত জায়গাটাতে। তিনটে আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারের পাশে পাঁচটা জিপ পার্ক করে রাখা আছে, দেখল ও। মেরিনরা কীরকম ধ্বংসযজ্ঞ চালাল তাদের নির্দেশে সেটা দেখবার শখ জাগলে ওগুলোতে করে বেড়াতে বের হবে উচ্চপদস্থ অফিসাররা, তিক্ত মনে ভাবল রানা। আরও আছে কয়েকটা ট্রাক ও ট্যাঙ্ক।

দু'জন গার্ড ভেহিকলগুলোর কাছে পাহারায় আছে। এত রাতেও ঘুমাচ্ছে না মেরিনদের সবাই । সাতজন সৈনিককে ডানদিকের একটা দরজা দিয়ে বের হতে দেখল রানা। কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে লোকগুলো। একজন একটা সিগারেট দিল আরেকজনকে, কিন্তু বাতাসের কারণে লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে পারল না। আরেকটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল সৈনিকরা।

প্যারাপেটে হুকটা যেখানে আছে, সেখানে ফিরে এসে রানা দেখল উঠে এসেছে হবসন ও ঈসা। মাথা কাত করে তাদের ইশারা করল ও, তারপর ঘুরে ডানদিকে পা বাড়াল, নিচু স্বরে জানাল কোথায় কোথায় বিস্ফোরক বসিয়েছে।

হবসনের ম্যাপে যদি কোনও ভুল না থাকে তা হলে ওদিকে গার্ড-পোস্টের পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি আছে। চওড়া উঠানে নেমেছে ওটা দুর্গ-প্রাচীর থেকে। সেদিকে এগোল রানা।

সাইলেন্সার লাগানো ওয়ালথারটা এখন ওর হাঁটুর পাশে ঝুলছে। তবে নিতান্ত বাধ্য না হলে ওটা দিয়ে গুলি করবে না ও।

আওয়াজ যত কম হয় ততই ভাল। অন্তত বিস্ফোরণগুলো যতক্ষণ শুরু না হচ্ছে।

সিঁড়ির মুখে চলে এসেছে রানা, নামতে গিয়েও থমকে গেল ও। বুটের খটাখট আওয়াজ তুলে উঠে আসছে একজন মেরিন। মুখ নিচু করে দ্রুত উঠছিল সে, হঠাৎ করেই ফুট তিনেক দূরে অন্যরকম এক জোড়া বুট দেখে চমকে গেল। ঝট করে তার হাত চলে গেল রাইফেলের স্টকে, তাড়াহুড়ো করে কাঁধ থেকে নামাতে চেষ্টা করল অস্ত্রটা।

কপালের মাঝখানে গুলি খেল মেরিন।

লাশটা ঢলে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলল রানা। রাইফেলটা সিঁড়ির ওপর পড়লে নীচে পড়তে শুরু করে জোরে আওয়াজ করত। সিঁড়িঘরের এক কোণে লাশটা টেনে এনে রাখল ও, সহজে ওখানে চোখ যাবে না কারও।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে হবসন ও ঈসা, তাদের পিছু নিল ও এবার, পাশ কাটাল দু'জনকে। হবসন খপ্ করে ধরল ওর কনুই, টান দিয়ে ওকে পিছনে থাকতে ইঙ্গিত করল। কারণটা বুঝতে এক সেকেন্ড দেরি হলো রানার। হবসনের পরনে আমেরিকান আর্মির ইউনিফর্ম, নীচে থেকে কোনও সৈনিক যদি তাকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখে তা হলে সন্দেহ করবে না, যদি না হবসনকে চিনে ফেলে সে, যদি না তার জানা থাকে গতদিনের লড়াইয়ে হবসনকে নিখোঁজ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। যদি জানেও, তারপরও প্রথমেই লোকটা চিন্তা করবে কীভাবে হবসন দুর্গে ফিরে এলো। সন্দেহ হলে হবসন কীভাবে ফিরল জিজ্ঞেস করতে এগিয়ে আসবে লোকটা। কপাল খারাপ হলে অন্য কাউকে ডাকবে। রানা আশা করছে, হবসনকে কাছ থেকে দেখে ফেলবে না কেউ। দূরত্ব যদি পনেরো ফুটও হয়, তা হলেও উড়ন্ত বালির কারণে ওকে স্পষ্ট দেখা যাবে না, চিনতে পারবে না কে ও।

নীচে নেমে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে উঠানে নজর বোলাল তরুণ

আমেরিকান। শান্তই মনে হচ্ছে তাকে, তবে রানা খেয়াল করল, ছেলেটার ঘাড়ের পেশী থরথর করে কাঁপছে। হাতের ইশারায় রানা ও ঈসাকে আসতে বলে পা বাড়াল সে উঠানের দিকে

একটু দ্বিধা করে এগোল রানা। নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে হবসন, এখন যদি মত বদলে হঠাৎ চিৎকার করে সাহায্য চায় ও, তা হলে কী হবে?

জিপ ও আর্মার্ড ক্যারিয়ারগুলো চল্লিশ ফুট দূরে। এদিকে পিছন ফিরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন গার্ড, মনে হয় গল্প জুড়েছে। দ্রুত পায়ে একটা ট্রুপ ট্রাকের আড়াল নিল রানা, গড়িয়ে চলে গেল ট্রাকের তলায়, বিশ মিনিটে সেট করে একটা চার্জ আটকে দিল চেসিসের গায়ে। ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে বিল হবসনের ওপর চোখ রাখছে ঈসা আজনবী।

নির্দেশ মতো সিঁড়ির ডানদিকে হেঁটে গেল হবসন, কয়েকটা দরজা পার হয়ে একটা দরজার পাশে ছায়ায় থামল। ম্যাপে দেখানো হয়েছে দুর্গের ডানজনে যেতে হলে ওই দরজা দিয়েই ঢুকতে হবে।

ঈসা আজনবীকে হবসনের দিকে খেয়াল রাখতে বলে ক্রল করে এগোল রানা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার ও জিপগুলোর দিকে। এখানে ওখানে রাখা তেলের গোল ড্রামগুলো ওকে বেশ খানিকটা সুবিধে করে দিল। প্রথম আর্মার্ড ক্যারিয়ারের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে একটু থামল রানা, একবারের জন্যেও ওর চোখ সরছে না দুই গার্ডের দিক থেকে। নোংরা কৌতুক বলছে গার্ডদের একজন, অন্যজন খিকখিক করে হাসছে। নিশ্চিন্ত না থাকবার কোনও কারণ নেই তাদের। দুর্গের ভিতর এত রাতে কে আসবে, কার এত বড় সাহস!

ক্রল করে আর্মার্ড ক্যারিয়ারের তলায় ঢুকল রানা, সতেরো মিনিটে চার্জ সেট করল। সবগুলো ভেহিকল পাশাপাশি রাখায় সুবিধে হলো ওর, একে একে প্রত্যেকটার নীচে চার্জ সেট করল

ও। শেষ চার্জটা সেট করল বারো মিনিটে। বিস্ফোরণগুলো প্রায় একই সময়ে হলে ভাল।

ফিরতি পথে ক্রল শুরু করেও সিদ্ধান্ত পাল্টাল রানা। শেষ আর্মার্ড ক্যারিয়ারের প্রায় পাশেই দু'হাজার গ্যালনের গ্যাসোলিন স্টোরেজ ট্যাঙ্কটা ওকে যেন অমোঘ আকর্ষণে টানছে। ওটার দিকে ক্রল করে খানিকটা এগিয়ে একবার গার্ডদের দিকে তাকাল ও। ধক করে উঠল ওর বুক। গার্ডদের একজন ওর দিকেই ফিরছে। শরীর গড়িয়ে দিয়ে আর্মার্ড ক্যারিয়ারের আড়াল পেতে চাইল রানা, ঢুকে পড়ল যন্ত্রদানবটার তলায়। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে বোধহয়। গার্ডের বুট পরা পা দেখতে পাচ্ছে ও, এদিকেই এগিয়ে আসছে দ্রুত।

ঠিক ওর মুখ থেকে এক ফুট দূরে, আর্মার্ড ক্যারিয়ারের গায়ের কাছে থামল লোকটার বুট পরা পা দুটো।

কী দেখছে লোকটা?

এবার বুঝতে পারল রানা।

লোকটা অবাক গলায় বলে উঠেছে: 'আরে, আমি তো ভেবেছিলাম মারা গেছ তুমি!'

শ্বাস আটকে ফেলল রানা। সর্বনাশ! বিল হবসনকে দেখে ফেলেছে গার্ড!

'কোথায় ছিলে?' আস্তে আস্তে বিস্ময় আরও বাড়ছে লোকটার। বাতাসের গোঙানিতে অস্পষ্ট শোনাচ্ছে তার গলার আওয়াজ। 'ফিরলে কী করে, হবসন?'

ঈসা আজনবীকেও দেখে ফেলেছে নাকি লোকটা? রানা টের পেল, বুকের খাঁচায় পাগলা নাচ জুড়েছে ওর হৃৎপিণ্ড। পিছাতে শুরু করল ও, আর্মার্ড ক্যারিয়ারের পিছনে গিয়ে বেরিয়ে এলো নীচ থেকে, ঝুঁকি নিয়ে সাবধানে তাকাল গার্ডের দিকে। বিল হবসনের দিকে দ্বিধান্বিত পায়ে হাঁটছে গার্ড। তার দিকে তাকিয়ে আছে দ্বিতীয় গার্ড।

'অ্যাম্বুশের পর সরে যাই আমি,' হবসনের চাপা গলা শুনতে পেল রানা। 'ট্রাকের কাছে পৌঁছুবার আগেই রওনা হয়ে গেল ওরা। বিকেলে পায়ে হেঁটে এখানে ফিরেছি।' হবসনের হাসিটা কৃত্রিম শোনাল। 'অনেক দূর হাঁটতে হয়েছে।'

'কেউ আমাকে বলেনি তুমি ফিরেছ,' অসন্তুষ্ট গলায় বলল গার্ড। 'এরকম একটা খবর চেপে রাখতে পারবে না কেউ। সত্যি করে বলো...' হবসনের কাছাকাছি চলে গেছে লোকটা।

ব্যাপার কী ভাল মতো বুঝবার জন্য দ্বিতীয় গার্ডও পা বাড়াল।

'কর্নেল মর্গানের ওখানে ছিলাম, রিপোর্ট দিচ্ছিলাম,' অসহিষ্ণু গলায় জানাল হবসন। ঝটকা খেল তার শরীর, রাইফেলটা তুলেই কাছে চলে আসা গার্ডের নাকের ওপর গায়ের জোরে অস্ত্রটার বাঁট নামিয়ে আনল সে।

অজ্ঞান লোকটা ঢলে পড়ে যাবার আগেই হবসনের দিকে কারবাইন তুলল দ্বিতীয় গার্ড। মাথার পিছনটা উড়ে গেল তার রানার গুলিতে।

প্রায় একই সঙ্গে ধুলোর মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গার্ড দু'জন। তার আগেই শূন্যে কারবাইন দুটো ধরে ফেলেছে রানা ও হবসন।

দ্রুত পায়ে হবসনের কাছে পৌঁছে গেল রানা। ঈসা আজনবীও আড়াল ছেড়ে চলে এসেছে। রানার নির্দেশে দুই গার্ডকে কয়েকটা তেলের ড্রামের আড়ালে টেনে নিয়ে রাখল দু'জন। অজ্ঞান গার্ডকে বেঁধে তারই রুমাল গুঁজে দেয়া হলো মুখের ভিতর। গ্যাসোলিনের ট্যাঙ্কে চার্জ সেট করল রানা। দশ মিনিট পর ফাটবে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।

ও ফিরে আসতেই দরজাটা খুলল হবসন। দূর থেকে আসা আবছা তীক্ষ্ণ চিৎকারটা অমানুষিক শোনাল ওদের কানে। কতটা কষ্ট পেলে মানুষের গলা দিয়ে ওরকম আওয়াজ বের হয়? অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। আমেরিকান সৈন্যরা কি সোহেলকে মারছে?

ওখানে যা ঘটছে সেটা যে ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কিছু তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

রানার মন চাইল চিৎকার লক্ষ্য করে ছুটে যায়, কিন্তু ওর ট্রেইনিং শান্ত রাখল ওকে। অসতর্ক হওয়া চলবে না। ভিতর থেকে দরজার বল্টু আটকে হবসনকে এগোতে ইশারা করল ও।

দরজা থেকে বেযমেন্টে নেমে গেছে সিঁড়ি। নীচের ল্যান্ডিং থেকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে একটা করিডর। হবসন বাঁকটা ঘুরল। তার ঠিক দেড় ফুট পিছনে ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে আছে রানা, টেনে ধরা ছিলার মতো টানটান হয়ে আছে ওর স্নায়ু।

'হবসন!' বিস্মিত একটা গলা শুনতে পেল ও। পিস্তল হাতে উঁকি দিল রানা দেয়ালের কোনা থেকে। খানিকটা দূরে লোহার একটা মজবুত দরজার পাশে, টেবিলের পিছনে বসে আছে লালচে চেহারার এক হোঁৎকা আমেরিকান সৈনিক।

'গেরিলাদের হাতে ধরা পড়েছিলাম, তারপর অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি,' কাঁধ ঝাঁকাল হবসন। টেবিলের দিকে ধীর পায়ে এগোচ্ছে। 'মাত্র ফিরেছি। জরুরি কিছু তথ্য জেনে এসেছি পালানোর আগে। গেরিলারা কোথায় আস্তানা গেড়েছে সেটা এখন জানি আমি।'

'জানো? তা হলে তো কর্নেলের সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করা দরকার তোমার।'

'তাঁকেই তো খুঁজছি,' আরও দু'পা এগোল হবসন। 'কোয়ার্টারে তাঁকে পেলাম না। গার্ডদের একজন বলল তিনি এখানে থাকতে পারেন।'

একটানা চিৎকারটা এখন অনেক স্পষ্ট। চিকন গলাটা শুনে মনে হয়, কোনও বাচ্চা ছেলে বা মেয়েকে টর্চার করা হচ্ছে।

'উনি এখানেই আছেন,' ঘড়ঘড় শব্দে চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল গার্ড, কোমরে ঝোলানো চাবির রিঙের দিকে হাত বাড়াল। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি সে স্বদেশি সৈনিককে। মাথার

পাশে যখন রাইফেলের নলের জোর বাড়ি খেল, তখনও চাবির রিঙের দিকে চেয়ে আছে সে। অস্ফুট একটা শব্দ করে টেবিলের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গার্ড, ওখান থেকে মেঝেতে। ঝনঝন আওয়াজ করল চাবির গোছা। দু'হাতে মাথা ধরে উঠে বসতে চাইল হতভম্ব গার্ড। তার মাথায় দ্বিতীয়বারের মতো রাইফেলের নল নামিয়ে আনল হবসন। একটা আওয়াজও না করে এবার জ্ঞান হারাল লোকটা।

আড়াল থেকে বের হলো রানা, ঝুঁকে চাবির রিংটা খুলে নিল গার্ডের বেল্ট থেকে।

ঈসা আজনবী ও বিল হবসন পাশের একটা সাপ্লাই রুমে টেনে নিয়ে গেল অজ্ঞান দেহটা। লোকটার হাত-পা দ্রুত বেঁধে ফেলল দু'জন, তারপর বেরিয়ে এলো। বাইরে থেকে বল্টু আটকে দিল ঈসা আজনবী।

ইস্পাতের দরজাটার গায়ে বুক সমান উচ্চতায় লোহার মোটা গরাদ দেয়া একটা ছোট্ট জানালা আছে। ওখান দিয়েই আসছে করুণ আর্তনাদ।

কয়েকটা চাবি ব্যবহার করবার পর একটা দিয়ে দরজার তালাটা খুলতে পারল রানা, হাতলে মোচড় দিয়ে দরজা খুলল। সামনে লম্বা-চওড়া একটা করিডর। দু'পাশে অনেকগুলো সেল। শেষের ডানদিকেরটা ছাড়া অন্য সেলগুলোর লোহার দরজা বন্ধ দেখল রানা। প্রধান করিডর থেকে আরও কয়েকটা অপেক্ষাকৃত সরু করিডর চলে গেছে নানাদিকে।

'মেইন করিডরে আপনার বন্ধুকে রাখা হয়েছে শুনেছি,' বলল হবসন। 'সম্ভবত শেষ মাথার কোনও সেলে আছেন। যাদের টর্চার করা হয় তাদের ওদিকেই রাখে কর্নেল, যাতে বাইরে থেকে বন্দির চিৎকার শোনা না যায়।'

করিডরে বিশ ফুট পরপর উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। কোথা থেকে যেন একটা ইঞ্জিনের অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসছে।

'কীসের ইঞ্জিন ওটা?' হবসনের দিকে তাকাল রানা। 'আওয়াজটা কীসের?'

ডানদিকের অপেক্ষাকৃত সরু আরেকটা শাখা করিডর দেখাল হবসন। ভিতরে ছায়া ছায়া একটা ভাব। বাতিগুলোর উজ্জ্বলতা ওদিকটাতে অনেক কম। 'জেনারেটর রুম,' বলল হবসন।

'এসো,' পা বাড়াল রানা।

ঈসা আজনবী সব সময় বিল হবসনের পিছনে থাকছে, খেয়াল করেছে ও। কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না সতর্ক আফগান।

বিশ ফুট যাবার পর ডানদিকে একটা লোহার দরজা দেখতে পেল রানা, থামল ওটার সামনে। থরথর করে কাঁপছে পুরু দরজাটা ভিতরের প্রচণ্ড আওয়াজে। নবে মোচড় দিয়ে দরজা খুলে আগে ঢুকল হবসন, তার ভাব দেখে মনে হলো কোনও মেজর জেনারেল সদলবলে পরিদর্শনে এসেছে। কর্তৃত্বের সঙ্গে এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশ দেখে নিল সে, তারপর রানা ও ঈসা আজনবীকে ঢুকতে ইঙ্গিত করল।

প্রকাণ্ড একটা ডিজেল জেনারেটর কান ফাটানো আওয়াজ করছে। কাঁপছে মেঝে। কেউ নেই ঘরে। পনেরো মিনিট পর চার্জটা ফাটবে, সময় ঠিক করে দিয়ে ওটা জেনারেটরের তলায় আটকে দিল রানা। আর মাত্র গোটা ছয়েক এক্সপ্লোসিভ চার্জ আছে ওর কাছে।

দুশ্চিন্তা বারবার হানা দিচ্ছে ওর মনে। যদি সোহেল না থাকে ডানজনে? যদি ভুল হয় হবসনের? যদি ফেলা হয় ওকে অন্য কোথাও? হয়তো কাবুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। অথবা... হয়তো বেঁচে নেই সোহেল। চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করতে চেষ্টা করল রানা। অসম্ভব! সোহেল মারা যেতে পারে না। কিছুতেই না! ও এতটা কাছে চলে আসবার পর কিছুতেই মরতে পারে না সোহেল! নিশ্চয়ই বেঁচে আছে ও! ওকে এই দুর্গ নামের দোজখ থেকে বের করে নিয়ে যেতেই হবে!

বাচ্চাটার করুণ আর্তনাদের ভয়াবহতা অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল রানার। আরও তীক্ষ্ণ হচ্ছে চিৎকার, মনে হচ্ছে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবে।

তারপর থেমে গেল তীক্ষ্ণ, মর্মস্পর্শী আর্তনাদ। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই ভুতুড়ে নীরবতা যেন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল রানাকে। পা টিপে টিপে এগোতে শুরু করল ও।

মেইন করিডরে ফিরে এঁলো ওরা। ডানদিকের শেষ সেলের দরজাটা এখনও খোলা। বিরক্তিমাখা একটা গলা শুনতে পেল ওরা, ইংরেজিতে বলছে, 'কর্নেল, কালো কুত্তার বাচ্চাটার হৃৎপিণ্ড খেয়ে ফেলেছে অ্যাসিড।'

'খুবই দুঃখের কথা,' কর্কশ একটা কণ্ঠ কপট দুঃখের সঙ্গে বলল। 'অপরাধ স্বীকার না করলে এমনই হয়। অযথা মরে ওরা। অথচ ছেলেটাকে মরতে হতো না, যদি ওই বাংলাদেশি কুকুরটা মুখ খুলত তা হলে এখনও বেঁচে থাকত ছোকরা। ছোকরা মরেছে সেটা আমাদের দোষ না, দোষটা ওই জেএমরি হারামজাদার।'

'শুয়োরের বাচ্চা!' বাম পাশের সেল থেকে জড়ানো, কাঁপা গলায় দুর্বল চিৎকার করল একজন।

রানার মনে হলো বুকের খাঁচা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাবে ওর হৃৎপিণ্ডটা। বড় করে শ্বাস নিল ও। গলাটা ওর অতি পরিচিত। সোহেল ছাড়া আর কেউ নয় ও!

সোহেল! বেঁচে আছে ও!

পাগলের মতো এক নাগাড়ে গালি দিয়ে যাচ্ছে সোহেল। রাগে কাঁপছে ওর দুর্বল গলা, কর্কশ শোনাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে কথাগুলো। কিন্তু গলাটা সোহেলের। কয়েক সেকেন্ড পর আরও দুর্বল হয়ে গেল কণ্ঠস্বর, গলা ভেঙে গেল। ক্লান্তির কারণেই বোধহয় চুপ করল ও।

'আরে, ও দেখি কথা ভালই বলে,' হাসি-হাসি গলায় বলল কর্কশ স্বরটা। 'দুঃখের কথা যে আগেই মুখ খোলেনি ও। যদি যা

জানতে চেয়েছি বলে ফেলত, তা হলে... আচ্ছা, সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম, তোমার কী মনে হয়, আমরা যদি আরও কমবয়সী কোনও বন্দিকে জিজ্ঞেসাবাদ করি তা হলে কি ও স্বেচ্ছায় মুখ খুলবে? কী বলো?'

'ইয়েস, সার, কর্নেল!'

করিডরে নীরবতা নামল।

'খোদার কসম আমি কিছু জানি না!' ভাঙা গলায় চিৎকার করল সোহেল।

'সেটা সময়ে জানা যাবে,' হাসছে কর্কশ কণ্ঠের মালিক। 'এবার যেটাকে ইন্টারোগেট করতে আনব সেটা নিশ্চয়ই জানে গেরিলারা কোথায় আছে।'

রানার পাশ থেকে ফিসফিস করল তরুণ হবসন, 'ওই পিশাচটাই কর্নেল হেনরি মর্গান। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম ছাড়াও আরও কয়েকজন মেরিন আছে।'

প্রথমেই রানার মনে চিন্তাটা এলো, খুন করা গেল না তা হলে সাক্ষাৎ শয়তানটাকে। রাইফেল দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করা যাবে না এখনই, দুর্গের সবাই সতর্ক হয়ে উঠবে গুলির আওয়াজ পেয়ে। তা ছাড়া, একটা ওয়ালথার কয়েকটা অটোমেটিক রাইফেলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট নয়।

প্রথম কাজ সোহেলকে উদ্ধার করা। রানা খেয়াল করেছে, একটা সেলের দরজাতেও তালা নেই। মজবুত বল্টু দিয়ে আটকানো রয়েছে সব ক'টা দরজা। সময় বেশি পাবে না ও, আর বড় জোর আট মিনিট, তারপরই ফাটতে শুরু করবে চার্জগুলো। ঈসা আজনবী ও হবসনকে করিডরে ঢুকবার দরজার সামনে দাঁড়াতে ইশারা করে নিঃশব্দ পায়ে খোলা দরজাটার পাশে চলে গেল রানা, পকেট থেকে পিংপং বল আকৃতির কনসেন্ট্রেটেড টিয়ার-গ্যাস বোমা বের করল। ওর আরেক হাতে পিস্তল।

কর্কশ গলাটা শুনতে পেল আবার: 'সার্জেন্ট, আরেকটাকে

নিয়ে এসো। এবার একটা মেয়ে আনবে। কচি দেখে এনো। এবার তোমাকে অ্যাসিড ব্যবহার করতে হবে না, সময়টা অন্যভাবে উপভোগ করার একটা সুযোগ দিচ্ছি বলতে পারো। সেই সেদিনের যুবতী মেয়েটার মতো। জলদি গিয়ে বাছাই করে পছন্দ মতো মেয়ে নিয়ে এসো। ওটাও যদি মরে তো দোষ ওই বাংলাদেশি হারামজাদার।'

গলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা কুৎসিত ঘড়ঘড়ে হাসির আওয়াজ শুনতে পেল রানা। তারপরই, 'ইয়েস, সার! কর্নেল!'

বুট পরা পায়ের শব্দ দরজার দিকে আসছে। গ্যাস-বোমাটা ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়েই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা, দ্রুত হাতে বল্টু আটকাল। ঠুস করে ফাটল কাঁচের গোলক, নাকে টিয়ার-গ্যাসের ঝাঁঝ পেল ও। এক টানে জানালার ইস্পাতের স্লাইড আটকে দিল। ঘর থেকে বের হতে পারবে না সাদা রঙের ঘোলাটে টিয়ার-গ্যাস, শ্বাস আটকে আসবে ভিতরের লোকগুলোর, জ্ঞান যদি না-ও হারায়, অসহ্য কষ্ট পাবে।

হাউমাউ চিৎকার শুনতে পেল ও ভিতর থেকে। খক্-খক্ করে প্রবল কাশির ফাঁকে ভাঙা গলায় সাহায্য চাইছে সেই কর্কশ গলার মালিক। দমাদম দরজা পিটাচ্ছে কে যেন।

দেরি না করে উল্টোদিকের সেলের বন্ধ দরজার সামনে চলে এলো রানা, বল্টু খুলতে শুরু করে দেখল থরথর করে কাঁপছে ওর হাত। একটানে বল্টু সরিয়ে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল ও। রক্তাক্ত মেঝেতে ভাঙাচোরা পুতুলের মতো কুঁকড়ে পড়ে থাকা মানুষটাকে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল, চিনতে পারছে না।

ফুলে গেছে সোহেলের বিকৃত চেহারা; সারা মুখ রক্তে মাখামাখি, চোখ দুটো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে; ডান কাঁধে বুলেটের ফুটো, রক্ত জমাট বেঁধে আছে ওখানে। ফাটা ঠোঁটগুলো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

'সোহেল!' দ্রুত সামনে বাড়ল রানা। উৎকণ্ঠার কারণে

পাঁজরে ধুপধাপ বাড়ি খাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড।

চোখ খুলে গেল সোহেলের, ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকাল দরজার দিকে। আস্তে আস্তে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল ওর ফোলা চোখে, তারপর শঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠল। ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? হ্যালিউসিনেশন হচ্ছে ওর? যদি বেসামাল হয়ে মুখ খোলে? তার আগেই শেষ করে দিতে হবে নিজেকে। কীভাবে? দেয়ালে মাথা ঠুকে মরবার চেষ্টা করা ছাড়া তো আর কোনও উপায় নেই! কিন্তু যদি হ্যালিউসিনেশন না হয়, তা হলে কে ও? মুখে কালো রং মাখা লোকটা কে? ওর নাম ধরে ডাকল কেন? ওই গলার আওয়াজ। ওই চোখ। ওই চোখ দুটো ওর বড় বেশি পরিচিত, বড় বেশি প্রিয়। রানা এসেছে? সে তো অসম্ভব। ভুল শুনেছে ও। ভুল দেখছে। চোখের ঝাপসা ভাবটা দূর করতে মাথা নাড়ানো যাবে না, ভীষণ ব্যথা লাগবে।

'সোহেল!' ঝুঁকল রানা, 'ওঠ্, দোস্ত! বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

'পারি না!' অস্ফুট হাহাকার বেরিয়ে এলো সোহেলের বুক চিরে। বুঝতে পেরেছে সত্যিই রানা এসেছে ওকে এই দোজখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। ফুঁপিয়ে উঠল কয়েকবার। 'দাঁড়াতে পারি না আর। হাঁটুগুলো বোধহয়...'

আহত দেহটা বাম কাঁধে তুলে নিল রানা। 'চল্, দোস্ত।'

'রানা!' ফিসফিস করে বলল সোহেল, তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। সবকিছু আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে ও। কুঠুরির উজ্জ্বল বাতি থেকে করিডরে বেরিয়ে এসে অন্ধকার লাগছে চারপাশ। হাঁটছে রানা, ঝাঁকি লাগছে, কাতর গোঙানি বেরিয়ে এলো সোহেলের মুখ দিয়ে। অবিশ্বাসটা পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে ওর মন থেকে। পাগল হয়ে যায়নি ও। সত্যিই রানা এসেছে ওকে নিয়ে যেতে! কিছু একটা বলতে চাইল ও, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও শব্দ বের হলো না।

করিডরে বেরিয়ে ঈসা আজনবী ও হবসনকে দরজা খোলার নির্দেশ দিল রানা। নিজে বারবার থামছে, দু'পাশের সেলগুলোর দরজা খুলে দিচ্ছে। বেরিয়ে আসার জন্য তাগাদা দিচ্ছে ভিতরের বন্দিদের।

ছুটে বেরিয়ে আসছে আফগান বন্দিরা, সংখ্যায় পনেরো-বিশজনের কম হবে না। তাদের দুটো করে দেখছে সোহেল, তারপর দেখতে পেল আমেরিকান আর্মির ইউনিফর্ম পরা সোনালী চুলের এক কমবয়সী সৈনিককে। হতাশায় ছেয়ে গেল ওর বুক। আবার তা হলে বন্দি হবে ওরা। এবার রানাও ...ওকে উদ্ধার করতে এসে ...ইশ্, রানা যদি না আসত! ওর কারণে রানা

কিন্তু রানা সৈনিকের দিকে এগোচ্ছে কেন? আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টাই কি করবে না রানা?

'রানা, ওরা মেরে ফেলবে আমাদের,' ফিসফিস করল সোহেল।

'হবসন, জলদি দরজা খোলো,' নির্দেশ দিল রানা।

কী ঘটছে বুঝতে পারল না সোহেল, জ্ঞান হারাচ্ছে বলে মনে হলো ওর, দুর্বল স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে ও?'

'পরে বলব, দোস্ত, আগে এখান থেকে বেরিয়ে যাই,' হাঁটবার গতি বাড়াল রানা, বাম হাতে শক্ত করে সোহেলকে ধরে আছে ও।

আফগান বন্দিদের দ্রুত স্বরে নির্দেশ দিচ্ছে ঈসা আজনবী। তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'আর দুই মিনিটও নেই ফাটবে চার্জগুলো। জলদি আসুন।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল হবসন। দরজার ওপাশ থেকে জোরে জোরে টোকা দিচ্ছে কে যেন। কোনও সৈনিক। একজন, না বেশ কয়েকজন?

হবসনের পাশে চলে এলো রানা, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা বুক সমান উচ্চতায় তুলে দরজা খুলতে ইশারা করল।

'কী ব্যাপার, রবার্ট! বলি কী করছ...'

একজন সৈনিক। মেজাজ দেখানোর মুডে ছিল, ক্যামোফ্লেজ গ্রিজ মাখা রানার চেহারা ও উদ্যত পিস্তলটা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল তার। ঝট্ করে মাথার ওপর হাত তুলল। ঈসা আজনবী রানাকে পাশ কাটাল। কারবাইনের নলের গুঁতোয় সৈনিককে নীচের ল্যান্ডিঙে নামতে বাধ্য করল সে। ধাক্কা দিয়ে তাকে ঢুকিয়ে দিল করিডরের ভিতর, তারপর ইস্পাতের দরজা বন্ধ করে বল্টু আটকে তালা মেরে দিল। চাবিটা গুঁজে রাখল জোব্বার পকেটে।

দরজা থেকে উঠানের দিকে তাকাল রানা। ঝড়ো বাতাসে ধুলো-বালি উড়ছে আগেরই মতো। বাতাসের শিস এবং হুঙ্কার ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই চারপাশে। দেয়ালের ওপর কোনও গার্ড দেখা গেল না। চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা। আর সত্তর সেকেন্ড আছে, তারপর ফাটবে প্রথম চার্জ। তার আগেই উঠান পেরিয়ে দুর্গ-প্রাচীরের ওপারে চলে যাওয়া দরকার।

পিছনের লোকগুলোকে আসতে ইশারা করে হালকা পায়ে দৌড়াতে শুরু করল রানা। দুর্গের উত্তর দেয়ালের দিকে ছুটছে ও ছায়ার মধ্য দিয়ে। ওর উল্টোদিকে বেশ খানিকটা দূরে আর্মি ভেহিকেলগুলো থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর নীচে সময় গুনছে টাইমার, নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাটারি থেকে ভোল্টেজ সাপ্লাই পাবে ডেটোনেটর, বিস্ফোরিত হবে বোমাগুলো।

রানার পাশে ছুটছে হবসন ও ঈসা আজনবী। তাদের পিছনেই আছে সদ্য মুক্তি পাওয়া আফগান বন্দিরা। কাছে চলে আসছে প্রাচীরে উঠবার সিঁড়িঘর। আর বিশ ফুট ...দশ ...সিঁড়ি-ঘরের মুখে পৌঁছে গিয়ে পিছন থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেল রানা। ঝট করে ঘুরে তাকাল ও। একটা খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সৈনিক, ওদের দেখে ফেলেছে। দরজার পাশে হাত দিয়েই একটা রাইফেল বের করে কাঁধে তুলল সে।

গুলি না করে আর কোনও উপায় নেই। ঈসা আজনবীর এম-১৬ কারবাইনের বুলেট রাইফেলধারী সৈনিকের কপাল চুরমার করে দিল।

গুলির আওয়াজে যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল, দরজার কাছে মৃত সৈনিককে পড়ে যেতে দেখেছে ঘরের অন্যান্য মেরিন, অস্ত্র হাতে এবার দরজায় দেখা দিল তারা।

ছুটবার ফাঁকে একের পর এক গুলি করতে শুরু করল ঈসা আজনবী। দু'জন সৈনিক আহত হয়ে পড়ে যেতেই দরজার আড়ালে সরে গেল অন্যরা, কাভার নিয়ে পাল্টা গুলি করছে। ঈসার কারবাইনের গুলিবর্ষণে লক্ষ্যস্থির করবার সুযোগ পাচ্ছে না তারা এখনও। দেয়ালের পাথরে লেগে চল্টা ওঠাচ্ছে তাদের বুলেট।

রানাকে ছাড়িয়ে গেল আফগান বন্দিরা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। তাদের পরেই আছে হবসন। রানাও ঢুকে পড়ল সিঁড়ি-ঘরে। এখন ওকে দেখতে পাবে না ইউএস মেরিনরা। ওর পরপরই চলে এলো ঈসা আজনবী। সোহেলকে তার হাতে সোপর্দ করল রানা, তারপর ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে গেল সিঁড়ি-ঘর থেকে, দেয়ালের পাশে দাঁড়াল। ওর হাতে চলে এসেছে এম-২০৩ রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চার। চার্জ ফাটতে আরও অন্তত পনেরো-বিশ সেকেন্ড। তার আগেই সৈনিকদের মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে হবে। গ্রেনেড লঞ্চার তাক করল ও ভেহিকেলগুলোর ওপাশে গ্যাসোলিন ট্যাঙ্কের ওপর, ট্রিগার স্পর্শ করল তর্জনী।

গ্রেনেড বিস্ফোরণে বিকট শব্দে ফাটল ট্যাঙ্ক, সেই সঙ্গে ওটার নীচে বসানো চার্জ। বিশ ফুট বৃত্তাকার একটা আগুনের গোলক ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। দরজার কাছে কাভার নেয়া কয়েকজন মেরিন দেয়াল চাপা পড়ে গেল। ইউনিফর্মে আগুন ধরে গেল কয়েকজনের। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়তে ছাড়তে দরজা দিয়ে বেরিয়ে

এলো তারা, উঠানে বালির ওপর গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। ট্যাঙ্কের পাশের জিপগাড়িটাতেও আগুন ধরে গেছে, বিস্ফোরিত হলো ওটা। একটার পর একটা তেলের ড্রাম ফাটছে, দাউ দাউ জ্বলে উঠছে গ্যাসোলিন। উঠানের আগুনের তেজ বাড়ছে ক্রমেই।

অসংখ্য বুলেট সিঁড়ি-ঘরের পাথরের দেয়াল থেকে চল্টা ওঠাচ্ছে।

গুলি করতে করতে পিছু হটে আবার সিঁড়ি-ঘরের অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তায় ফিরে এলো রানা, ঈসা আজনবীর কাছ থেকে অচেতন সোহেলকে নিয়ে কাঁধে তুলল, তারপর দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করল। ওকে ছাড়িয়ে অস্ত্র হাতে ওপরে উঠে গেল ঈসা। রানার উঠবার গতি ধীর, কয়েক সেকেন্ড পর ঈসা আজনবীকে আর দেখতে পেল না ও।

প্যারাপেটেও গুলির আওয়াজ হচ্ছে। সেন্ট্রি-বক্সের গার্ডরা বেরিয়ে এসেছে, বুঝতে পারল রানা। এম-১৬-এর ব্রাশ ফায়ারের হুঙ্কার শুনল। পাল্টা গুলি করছে বোধহয় ঈসা আজনবী। তারপর প্যারাপেটে গুলির শব্দ থেমে গেল। উঠান থেকে এখনও গুলি করা হচ্ছে। একজন মেরিন ছুটে ঢুকল সিঁড়ি-ঘরে। রানার দিকে রাইফেলটা তাক করছে সে। বুটের আওয়াজে ঘাড় ফেরাল রানা, কিন্তু সোহেল কাঁধে থাকায় সময় মতো পাল্টা গুলি করবার সুযোগ নেই ওর। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল ও। শকওয়েভটা আট-দশ হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিল নীচে দাঁড়ানো মেরিনকে।

একটার পর একটা চার্জ ফাটছে। পরপর তিনটে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। এগিয়ে আসছিল একদল মেরিন, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের আওতার মধ্যে পড়ে উড়ে গেল দিগ্বিদিক।

বাতাসের ঝাপটায় নাচছে আগুন, সেই লালচে আভায় সিঁড়ি-ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। শকওয়েভের ধাক্কায় আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে সোহেলকে নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল রানা, সামলে

নিয়ে ওপর দিকে ছুটল।

প্যারাপেট থেকে আবারও গোলাগুলির আওয়াজ পেল ও। মাঝখানের সেন্ট্রি-বক্সের গার্ডরা বোধহয় বেরিয়ে এসেছে। তার মানে দেয়ালের দুই কোনা থেকে ছুটে আসছে এখন বেশ কয়েকজন গার্ড। ওর বসানো চার্জগুলো এখনও ফাটেনি। ওগুলো ফাটলে ঈসা আজনবী, হবসন আর আফগান বন্দিরা হয়তো উড়ে যাবে। উড়ে যাবে ও আর সোহেলও, যদি আগেই প্যারাপেটে ওঠে। ঈসা-হবসনের মনে আছে তো যে প্যারাপেটে চার্জ সেট করেছে ও?

সিঁড়ি-ঘরে বুলেট ঢুকছে, পিছলে ছুটে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। দু'একটা ওপরেও আসছে। জোর আওয়াজের পরপরই পিঠে গরম বাতাসের হলকা টের পেল রানা। সেন্ট্রি-পোস্টগুলোর একটা নিশ্চয়ই বিস্ফোরিত হয়েছে। আগুনের শিখা চেটে দিয়ে গেল ওপরের সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ। জোর বাতাসে কয়েকবার নেচে নিভে গেল আগুন।

প্রাচীরের কোণে সিঁড়ি-ঘরে পৌঁছে গেল রানা। ঠিক তখনই প্যারাপেটের মাঝখানের সেন্ট্রি-বক্সটা আগুনের একটা গোলকে রূপান্তরিত হলো। চারপাশে ছিটকে গেল করোগেটেড মেটালের ভাঙা টুকরো-টাকরা। শকওয়েভটা আরেকটু হলেই সিঁড়ির মাথা থেকে নীচে ছিটকে ফেলে দিচ্ছিল রানাকে।

উঠান থেকে এগিয়ে আসা সৈন্যরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

ডান হাতের জোরে গ্রেনেড লঞ্চারটাকে কাঁধে তুলল রানা, জানে শক্ত করে কাঁধে চেপে ধরতে পারবে না ও অস্ত্রটার কুঁদো, ফলে জোরাল রিকয়েল ওর কাঁধের হাড় ভেঙে দিতে পারে। নীচের দিকে তাক করে গ্রেনেড ফায়ার করল ও। বদ্ধ জায়গায় ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে বিস্ফোরিত হলো ৪০ এমএম গ্রেনেড, সামনের সৈনিকদের থেঁতলানো শরীর উড়ে গিয়ে পড়ল সিঁড়ির

গোড়ায়, পিছনের সৈন্যদের পায়ের কাছে।

উঠানে একটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার বিস্ফোরিত হলো। দুর্গের উত্তর দিক থেকে ভেসে এলো ভোঁতা একটা গম্ভীর আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের সব ক'টা বাতি নিভে গেল। জেনারেটরের তলার চার্জটা তার কাজ ঠিক মতোই করেছে। আগুনের আভায় নীচের উঠানে সৈনিকদের ছুটাছুটি দেখা যাচ্ছে। সেদিকে এক পশলা গুলি করল রানা ওর রাইফেল থেকে, তারপর ছুটল প্যারাপেটের দিকে।

কয়েকটা দেহ পড়ে আছে প্যারাপেটে। কাছে গিয়ে রানা দেখল, তাদের দু'জন আফগান বন্দি, ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গার্ডদের বুলেটে। চার্জ বিস্ফোরণে শক পেয়েছে বোধহয় ঈসা আজনবী, শোওয়া অবস্থা থেকে আস্তে করে বসল, মাথা ঝাঁকাল যেন ঘোরের মধ্যে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগোল দড়ির দিকে। রানার পাশে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিল হবসন। হাতে গুলিশূন্য রাইফেলটা নেই এখন তার।

ঝুঁকে ঈসা আজনবীর ফেলে যাওয়া কারবাইনটা তুলে নিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'উঠানের দিকে গুলি করো। গুলি শেষ হলে সোজা এক দৌড়ে দড়ির কাছে চলে আসবে। নামতে সময় লাগবে আমার। সৈনিকরা দেয়ালের ওপরে উঠে এলে বাঁচার কোনও উপায় নেই আমাদের, কাজেই ওরা বেশি কাছে চলে আসার আগে পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে।'

'আমি কারও দিকে গুলি করতে পারব না,' আড়ষ্ট গলায় বলল হবসন, রানার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না।

'কাউকে গুলি করতে বলছি না, তুমি ওদের এগিয়ে আসতে বাধা দাও,' বলল অধৈর্য রানা। 'ওদের কাছাকাছি বালিতে গুলি করলেও হবে।'

একটু দ্বিধা করে দেয়ালের কিনারায় চলে গেল হবসন, রাইফেলটা কাঁধে তুলে থেমে থেমে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

প্যারাপেটে দড়ির হুকটার কাছে চলে এসে সোহেলকে নামাল রানা। ঈসা আজনবী নেমে গেলেই দড়িটা টেনে তুলতে হবে ওকে। হবসনের দিকে তাকাল, ছেলেটা কাভার না নিয়ে বেপরোয়া ভাবে গুলি করছে দেখে চিৎকার করে ডাকল, 'হবসন! চলে এসো!'

হবসনকে পিছাতে দেখল রানা, তারপর ওর চোখের সামনে আস্তে আস্তে চিৎ হয়ে পড়ে গেল ছেলেটা, তখনও কারবাইন ছাড়েনি হাত থেকে। আগুনের আভায় তার বুকে কালচে দাগ ছড়িয়ে পড়তে দেখল রানা। বুকে গুলি খেয়েছে হবসন। ওর পাশে ছুটে গেল রানা, কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আহত সোহেলকে নিয়ে সরে যাওয়াই প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, হবসনকে তা হলে কী করে...

রক্তাক্ত ক্ষতটা দেখতে ঝুঁকল রানা। ওর চোখে চোখ রাখল হবসন, দৃষ্টিতে অদ্ভুত আকুতি। সরল নিষ্পাপ চেহারাটা ব্যথায় কুঁচকে আছে। ফিসফিস করে বলল, 'মিস্টার রানা, আমি কাপুরুষ নই, তাই না?' বন্ধ হয়ে গেল ওর চোখ দুটো। একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল ছেলেটা। ওর বুক এখন আর ওঠা-নামা করছে না। পাল্‌স্‌ দেখল রানা। নেই। ওর মনে হলো গলার কাছে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে আটকে গেছে, কোনদিন ওটা গিলে ফেলতে পারবে না।

নীচে আরেকটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার বিস্ফোরিত হলো। আগুনের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল চারপাশ। হবসনকে দেখে মনে হলো নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। শেষ একবার ছেলেটাকে দেখে নিয়ে দেয়ালের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল রানা, একটানা গুলি করে রাইফেলের ম্যাগাযিন খালি করে ফেলল, তারপর স্পেয়ার ম্যাগাযিন ভরে নিয়ে আবার ফিরে এলো হবসনের মৃতদেহের পাশে, লাশের বুক-পকেট থেকে কম্পাসটা নিয়ে দ্রুত পা বাড়াল দড়ির দিকে। মন থেকে হবসনের নিষ্পাপ,

সরল চেহারাটা মুছতে পারছে না ও। অপরাধ বোধে মনটা ছেয়ে গেল, হবসনের মৃত্যুর জন্য নিজেকেই ওর দায়ী মনে হচ্ছে।

দড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেছে ঈসা আজনবী। ওকেও নামতে হবে জলদি, নইলে প্রাচীরে উঠে আসা আমেরিকান সৈনিকদের সহজ শিকারে পরিণত হবে ও আর সোহেল।

দড়িটা টেনে তুলতে শুরু করল রানা, শেষ প্রান্ত হাতে চলে আসতেই একটা ফাঁস তৈরি করে সোহেলের দুই বগলের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে শক্ত করল ফাঁস। সিঁড়ির মুখে দু'জন সৈনিককে দেখে ঝট করে রাইফেলটা তুলল, তবে রাইফেল থেকে গুলি না করে গ্রেনেড ফায়ার করল ও। বিস্ফোরণের ফলাফল দেখবার জন্য বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে হুকের কাছের দড়ি কাঁধে কয়েক পাক দিয়ে পেঁচিয়ে নিল, তারপর দড়ি পেঁচাল কব্জিতে। এবার সাবধানে সোহেলকে তুলে নামিয়ে দিল দেয়ালের ওপারে। আস্তে আস্তে দড়ি ছাড়ছে রানা, রেইলিঙে গা ঘেঁষে দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। সোহেলের ওজন বহন করতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠছে ওর দু'কাঁধের পেশী। দড়ির ঘষায় যেন আগুন জ্বলে উঠবে হাতের তালুতে, কব্জিতে। নীরবে জ্বলুনি সহ্য করল রানা। ওর মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য বুলেট।

দুর্গের বাইরে, নীচের আঙিনা থেকে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেয়ে চেহারা কুঁচকে গেল রানার। বোধহয় ঈসার কথা মতো আস্তে-ধীরে হাঁটতে রাজি হয়নি কোনও আফগান, দ্রুত পালাবার তাড়নায় ছুটতে গিয়ে পা দিয়ে বসেছে মাইনের ওপর।

সিঁড়ি-ঘরটা ধসে পড়েছে গ্রেনেড বিস্ফোরণে, কিন্তু সিঁড়ি বোধহয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ফাঁক-ফোকর খুঁজে নিয়ে গুলি করছে আমেরিকান সৈন্যরা। একটা গুলি রানার ডান বাহুর পেশী চিরে দিয়ে গেল। ব্যথায় চোখে পানি চলে এলো ওর। দড়ি ছাড়বার গতি আরও বাড়াল ও, সেই সঙ্গে বেড়ে গেল হাতের তালুর

জ্বলুনি। ঘাড় সামান্য ফিরিয়ে পিছনে তাকাল একবার, আগুনের লালচে আলোয় অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল। একজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে দুর্গের চারতলার একটা জানালার সামনে, ওর দিকে তাক করা পিস্তলটা নামিয়ে নিল সে!

শেষ কয়েক ফুট দড়ি ছাড়তে বড়জোর দশ সেকেন্ড পার হলো, কিন্তু রানার মনে হলো অনন্তকাল ধরে দড়ি নামাচ্ছে ও। মাটি স্পর্শ করেছে সোহেলের অচেতন শরীর। হুকটা রেইলিঙে আটকে নিল রানা, তারপর বিধ্বস্ত সিঁড়ি-ঘরের দিকে এক পশলা গুলি করেই দেয়াল টপকে নামতে শুরু করল। সময় যেন স্থির হয়ে গেছে, মনে হলো ওর। খানিক পর মাটি স্পর্শ করল ওর পা, ঘড়ি দেখলে বুঝতে পারত পুরো দু'মিনিটও পার হয়নি।

অন্ধকারে বালি-ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা আবছা মূর্তিগুলোর দিকে এগোল ও।

দু'হাতে সোহেলকে পাঁজাকোলা করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঈসা আজনবী। মুক্তি পাওয়া আফগানরা অস্থির ভাবে উসখুস করছে। মাইন বিস্ফোরণ দেখে ভয়ে অন্তরাত্মা উড়ে গেছে তাদের।

ঈসা আজনবীর গলাটা শুকনো শোনাল: 'হবসন তো এলো না, মাইনফিল্ড পার হবো কী করে আমরা?'

'মারা গেছে ও,' দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'আসুন।'

এদিকের কাঁটাতারের বেড়ায় খুঁটি কোথায় আছে দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড ঝড়ের প্রকোপে উড়ন্ত ঘন ধুলো-বালির মধ্যে তিন ফুট দূরেও ভাল মতো দৃষ্টি চলে না। হাতে সময় নেই খুঁটি খুঁজবার। গ্রেনেড লঞ্চার ফায়ার করে বেড়ার একটা অংশ উড়িয়ে দিল রানা, তারপর আবার রিলোড করে গ্রেনেড ছুঁড়ল সামনের জমি লক্ষ্য করে। বুম্ শব্দে ফাটল একটা মাইন। সে-পর্যন্ত এগোল রানা, তারপর আবার সরাসরি সামনের জমিতে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটাল। প্রায় প্রতিটা গ্রেনেড বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই মাইনও ফাটছে। ওদের পায়ের নীচে কেঁপে কেঁপে উঠছে জমি। দমকা

বাতাসের ঝাপটায় চারপাশে বালির পুরু পর্দা যেন দুলছে। জায়গাটা পৃথিবীর কোনও অংশ নয় বলে মনে হলো রানার। একটার পর একটা গ্রেনেড ফাটিয়ে এগিয়ে চলেছে ও। ওর পিছনে আসছে আফগানরা।

সামনে কাঁটাতারের বেড়া দেখতে পেল রানা। মাইনফিল্ড পেরিয়ে এসেছে ওরা। গ্রেনেডের আঘাতে উড়ে গেল কাঁটাতারের বেড়ার একটা অংশ। ওকে পাশ কাটাল ছুটন্ত আফগানরা, মিলিয়ে যাচ্ছে ঝড়ের মধ্যে, সরে যেতে চাইছে দুর্গের কাছ থেকে, ভয়াবহ অত্যাচার থেকে দূরে।

রানার পাশে চলে এলো ঈসা আজনবী।

'ওকে আমার কাছে দিন,' হাত বাড়িয়ে সোহেলকে কাঁধে তুলে নিল রানা। পকেট থেকে কম্পাস বের করল। দিক ঠিক করে নিয়ে দ্রুত পা বাড়াল ঈসা আজনবীর পাশে। সোহেলের ওজনটা বেকায়দা লাগছে। ঝাঁকি খাচ্ছে সোহেল। ক্ষত থেকে রক্ত পড়া শুরু হতে পারে। হাঁটবার ভঙ্গি পাল্টাল রানা, মসৃণ ভাবে এগোতে চেষ্টা করল। দুর্গ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে। ঘোড়াগুলো দরকার। আফগানরা আছে তো, না ওরা ব্যর্থ হবে ধরে নিয়ে চলে গেছে আগেই?

দশ

কম্পিউটারের স্ক্রিনে চোখ বুলাল মেজর অ্যালবার্ট ডুরেল। প্রথমে সে ভেবেছিল অন্য কোথাও ট্রান্সফার হবার জন্য দরখাস্ত করবে। চিঠিটা লেখা হয়ে গেছে তার। কিন্তু অ্যাসিড দগ্ধ ছেলেটার

অসহায় কচি চেহারা বারবার তাড়া করে ফিরছে তাকে। হাইলাইট শেষে ডিলিট করে দিল সে লেখাগুলো। আরেকটা অ্যাপলিকেশন লিখতে শুরু করল। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে। রেযিগনেশন লেটার লিখছে সে এখন। অনেক হয়েছে, যুদ্ধ নামের পাশবিক এই আগ্রাসনে জড়িত থাকতে চায় না সে আর। ফিরে যাবে নিজেদের পারিবারিক খামারে, ওখানে শস্য জন্মাতে দেখবে, মানুষের করুণ মৃত্যু দেখতে হবে না তাকে আর। যুদ্ধাবস্থায় রিযাইন করলে কী হবে – বড়জোর কোর্ট-মার্শাল? তা-ও ভাল।

কিন্তু যতই সে যুদ্ধ অপছন্দ করুক, যতই দূরে সরে যেতে চাক পাশবিকতা থেকে, যুদ্ধই যেন তার দিকে এগিয়ে আসে। গুলির শব্দে চমকে গেল মেজর ডুরেল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ তার চারতলার কোয়ার্টারের জানালাগুলোর কাঁচ ফাটিয়ে দিল। জানালার বাইরে আগুনের একটা গোলক পাক খেতে দেখল সে।

ওটা এতো উজ্জ্বল যে চোখ কুঁচকে গেল মেজর ডুরেলের। হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে। আরও গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। বুঝে উঠবার আগেই তার হাতে বেরিয়ে এলো পিস্তল। গোটা ঘর থরথর করে কাঁপল আরেকটা বিস্ফোরণের শকওয়েভের ধাক্কায়। খানিক দ্বিধা করে জানালার সামনে চলে গেল সে, পাল্লা খুলে নীচে তাকাল।

পুরো উঠান জুড়ে এখানে ওখানে নাচছে আগুনের কুণ্ডলী। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া ট্রাক, আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার ও ট্যাঙ্কের ধ্বংসাবশেষ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বেশ কয়েকজন মেরিন। অক্ষত সৈনিকরা দুর্গের উত্তর-পুব দিকে প্রাচীরে উঠবার সিঁড়ি-ঘর লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। এক মিনিট পর প্রাচীরের প্যারাপেটের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল তারা।

জানালার পাশে সরে নিজেকে আড়াল করে বাইরে তাকাল

মেজর ডুরেল। একবারে তিন সেকেন্ডের বেশি আড়াল থেকে মুখ বের করছে না। অগোছাল খণ্ডযুদ্ধটা তাকে দ্বিধায় ফেলে দিল। মনে হচ্ছে আক্রমণটা দুর্গের বাইরে থেকে আসেনি, হামলা হয়েছে দুর্গের ভিতর থেকে। উঠানে শিস কেটে এসে পড়েনি কোনও মর্টার শেল। ভেহিকেলগুলোর নীচ থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে, যেন কেউ টাইম কন্ট্রোল্ড বোমা ফিট করে রেখেছিল। পঞ্চমবারের মতো তাকিয়ে দুর্গ-প্রাচীরের ওপর বেসামরিক পোশাক পরা আফগানদের ছোটাছুটি করতে দেখল সে। এবার বিস্মিত হতে হলো তাকে। আফগানদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গও আছে একজন! তার ইউনিফর্মটা আমেরিকান আর্মির!

আরেকটা বিস্ফোরণের শকওয়েভের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে পিছাতে হলো মেজর ডুরেলকে। তারই ফাঁকে দেখল প্যারাপেট থেকে অদৃশ্য হচ্ছে আফগানরা। টলমল পায়ে আবার জানালার পাশে চলে এলো মেজর। তার মনে হলো প্যারাপেটে কোনও দড়ি বাঁধা আছে, ওটা বেয়ে নেমে যাচ্ছে লোকগুলো। তা হলে কি সৈন্যরা আফগানদের আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়েছে? তাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে দেয়াল বেয়ে নেমে পালাচ্ছে গেরিলারা?

আস্তে করে মাথা নাড়ল মেজর ডুরেল। যুক্তিতে মেলে না। গেরিলারা আক্রমণ করলে তাদের কাছে অস্ত্র থাকত, কিন্তু যাদের সে দেখেছে তাদের একজনের কাছেও কোনও অস্ত্র ছিল না। জানালা দিয়ে উঁকি দিল সে। মাত্র একজন সশস্ত্র আফগানকে প্যারাপেটের ওপর দেখতে পেল। তার সঙ্গে একজন আমেরিকান আর্মির ইউনিফর্ম পরা সৈনিকও আছে!

হঠাৎ করেই এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল মেজরের কাছে। আফগানরা আক্রমণ করতে আসেনি, ওরা বন্দি আফগান, দুর্গের সেল ব্লক থেকে মুক্তি পেয়ে পালাচ্ছে। তাদের সাহায্য করছে আমেরিকান আর্মির ওই সৈনিক।

প্যারাপেটের উত্তর-পুব দিকের সেন্ট্রি-বক্স আগুনের একটা

বলে রূপান্তরিত হতে দেখল সে। শকওয়েভটা আমেরিকান সৈন্য ও রয়ে যাওয়া আফগানকে ছিটকে ফেলে দিল প্যারাপেটের মেঝেতে। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল তারা, কিন্তু প্যারাপেটের আরেকটা বিস্ফোরণ তাদের আবার ফেলে দিল।

এক নাগাড়ে গুলির শব্দ হচ্ছে। মেজর ডুরেল স্পষ্ট বুঝতে পারল, এখনই নীচে গিয়ে সৈনিকদের নেতৃত্ব তার নিজের হাতে নেয়া উচিত। তাদের সংগঠিত করা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু রেযিগনেশন লেটারে লেখা কথাগুলো মনে পড়ে যাওয়ায় জানালার কাছ থেকে নড়ল না সে। চুলোয় যাক সমস্ত ট্রেইনিং, দায়িত্ব। এ লড়াই তার লড়াই নয়।

প্যারাপেটের ওপর আরও দু'জনকে উঠে আসতে দেখল সে। কমান্ডো-ফেটিগ পরা একজন কাঁধে তুলে আরেকজনকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সে-ই বোধহয় এই সফল আক্রমণের নেতা। উড়ন্ত ধুলো-বালির মধ্য দিয়েও স্পষ্ট দেখতে পেল মেজর দু'জনকে। আহত মানুষটাকে দেয়ালের ধারে নামিয়ে ফিরে এলো লোকটা, ঝুঁকে বসল অবশিষ্ট আফগান ও দাঁড়িয়ে থাকা আমেরিকান সৈনিকের পাশে। উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে দেয়ালের দিকে রওনা হলো আফগান। আমেরিকান সৈন্যের হাতে একটা রাইফেল ধরিয়ে দিল ব্যাটল-ড্রেস পরা দলনেতা। ওটা দিয়ে নীচে, উঠানের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সৈনিক। একটু পরেই ঝাঁকি খেয়ে পিছাল সে, পড়ে গেল চিৎ হয়ে। গুলি খেয়েছে।

কী করছে সচেতন ভাবে জানে না মেজর ডুরেল, কখন যেন তার হাতে উঠে এসেছে পিস্তল। ওটা ব্যাটল-ড্রেস পরা লোকটার বুকে তাক করল সে। সচেতন হয়ে টের পেল, জানালা থেকে লোকটা যে-দূরত্বে আছে এবং যেভাবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে, তাতে গুলি লক্ষ্যচ্যুত হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। পিস্তলের পিছনের ও সামনের সাইট একই সরল রেখায় চলে

এসেছে। ট্রিগারে চাপ বাড়ালেই সোজা লোকটার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুকবে বুলেট।

কিশোর বয়স থেকেই আগ্নেয়াস্ত্রে হাত ভাল মেজর ডুরেলের। তার রেজিমেন্টের অন্য সব সদস্যের চেয়ে বেশি স্বর্ণপদক জিতেছে সে শুটিং প্রতিযোগিতায়। গোটা ডিভিশনে তার রেকর্ড এখনও ভাঙতে পারেনি কেউ। এখন শুধু আলতো করে ট্রিগারটায় আঙুলের চাপ। ব্যস। খুব খুশি হবে কর্নেল হেনরি মর্গান।

আস্তে করে পিস্তলটা নামিয়ে নিল মেজর ডুরেল।

মরুক মর্গান নামের হাড়-হারামি পিশাচটা।

মনে মনে বলল, 'এই যুদ্ধে আমি আর নেই। গুডলাক টু ইউ, আননোওন ব্রেভ সোলজার।'

বিস্ফোরণ ঘটবার কিছুক্ষণের মধ্যেই জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে কর্নেল হেনরি মর্গানের খোঁজ পড়ে গেল। দুর্গের ডানজনে কয়েকজন সৈনিক পাঠানো হলো কর্নেলকে জানানোর জন্য যে, তারা আক্রান্ত হয়েছে।

চিৎকার, গোঙানি, কাশি শুনে একজন সৈনিক যখন বদ্ধ কুঠুরির দরজা খুলল, টলতে টলতে বেরিয়ে এলো সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম। দু'-চোখ বেয়ে দরদর করে পানি পড়ছে তার, বেদম কাশছে। তার পরপরই হামাগুড়ি দিয়ে বের হলো কর্নেল মর্গান, কাশতে কাশতে চেহারাটা বাঁদরের পেছন দিকের মতো লাল হয়ে গেছে তার। ফোঁপাতে শুরু করল মুক্তির আনন্দে, তবে সৈনিকদের অবাক হয়ে তাকাতে দেখে সামলেও নিল দ্রুত।

সৈনিকদের টর্চের আলো ছাড়া গোটা করিডর অন্ধকার। মিনিট দশেক আগে বিকট বিস্ফোরণের পর সমস্ত বাতি নিভে গেছে। টিয়ার-গ্যাসের কটু গন্ধ থেকে বাঁচবার জন্য কুঠুরি থেকে খানিকটা সরে দাঁড়াল কর্নেল। চোখ ফুলে গেছে তার, জ্বলছে এখনও; মুখের চামড়ায় এমন একটা অনুভূতি হচ্ছে, যেন পুড়ে

গেছে গোটা মুখ। গলা ও ফুসফুস এতো জ্বলছে যে, সৈনিকদের কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো না তার।

বাইরে থেকে একটার পর একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হচ্ছে। জোরাল শকওয়েভের কারণে থরথর করে কাঁপছে মেঝে ও দেয়াল। একজন সৈনিকের কাছ থেকে টর্চ নিয়ে টলতে টলতে এগোল সে করিডর থেকে বেরিয়ে যাবার দরজার দিকে। আন্দাজ করল, যেরকম গোলাগুলি হচ্ছে, যেভাবে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে, গেরিলাদের বড় কোনও দল দুর্গ আক্রমণ করেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার, যে-লোকটা হঠাৎ এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, সে লড়াই শুরু হবার আগেই করেছিল কাজটা। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে অতি সামান্য সময়ের জন্য ধুলোমাখা লোকটার মুখ দেখতে পেয়েছিল সে। এখন করিডর ধরে এগিয়ে মর্গান বুঝতে পারল, লোকটা বন্দি আফগানদের বের করে নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে বাংলাদেশি বন্দিকেও। তারপর শুরু হয়েছে আক্রমণ। কিন্তু ওই ধুলোমাখা লোকটা দুর্গে ঢুকল কী করে? দলেবলে নিশ্চয়ই ভারী হয়ে এসেছিল সে। তারাই বা কীভাবে গার্ডদের চোখ এড়িয়ে দুর্গে ঢোকে?

সিঁড়ি বেয়ে উঠে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো সে, উঠানের দিকে তাকিয়ে যেরকম ধ্বংসযজ্ঞ দেখল তাতে অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা। সারা উঠান ভাঙাচোরা-পোড়া জিপগাড়ি, ট্রাক, আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার ও ট্যাঙ্কের টুকরো-টাকরায় ভরা। ঘন ধোঁয়ায় শ্বাস আটকে যেতে চাইল কর্নেলের। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বেশ কয়েকজন মৃত মেরিন। সৈনিকরা ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে, কয়েকজন ব্যস্ত হয়ে ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে বের করছে আহত সৈনিকদের, প্যারাপেটে উঠছে সতর্ক সৈনিকরা, দুর্গের প্রকাণ্ড ফটকের দিকে দুটো ভারী মেশিনগান তাক করে রেখেছে দু'জন কর্পোরাল। আক্রমণকারীদের খুঁজছে আরেকটা দল, নিজেদের কাভার দিতে

গিয়ে দেরি হয়ে যাচ্ছে তাদের।

সামনে দিয়ে একজন লেফটেন্যান্টকে দৌড়ে যেতে দেখে খপ করে তার কনুই চেপে ধরে থামাল কর্নেল মর্গান। ধমকের সুরে বলল, 'ওদের বিশৃঙ্খলা থামাও।'

সম্মান দেখাতে গিয়ে আড়ষ্ট চেহারায় অ্যাটেনশন হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

'পিছনের ওদের বলো অস্ত্র নামাতে, নইলে প্যারাপেটে আমাদের সোলজারদেরই গুলি করে বসবে ওরা,' নির্দেশ দিল কর্নেল। 'চারজনকে বলো যাতে ডাক্তারদের সঙ্গে হাত লাগায়। ইঞ্জিনিয়ারদের খুঁজে বের করে এখানে আসতে বলো।' গলার জ্বলুনিতে আবার খকখক করে কাশতে শুরু করল সে। সামলে নিয়ে সার্জেন্ট ট্রিসট্রিমের দিকে ফিরল। 'এক্ষুণি যাও, সব ক'জন অফিসারকে বলবে যত তাড়াতাড়ি পারে আমার কাছে যেন রিপোর্ট করে।' উঠানে একবার চোখ বোলাল সে। 'মেজর ডুরেল কোথায়?' উঠানের মাঝখানে একটা ট্রাকের ধ্বংসাবশেষের কাছে মেজরকে দেখতে পেল সে, পা বাড়াল সেদিকে।

ইস্পাতের ভারী একটা চৌকো পাত সরাতে চেষ্টা করছে মেজর আহত এক সৈনিকের ওপর থেকে। তার সামনে গিয়ে থামল কর্নেল।

'কয়জন আহত হয়েছে?'

টুকরোটা সরাতে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেল মেজর ডুরেলের চেহারা। 'নোড়ো না, আমি ডাক্তার ডেকে আনছি,' আহত সৈনিককে বলল সে।

চোখ জোড়া সরু হয়ে গেল কর্নেল মর্গানের। 'আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছি, মেজর। কতজন আহত হয়েছে?'

আহত সৈনিকের ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত মিশ্রিত লালা বের হলো।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল মেজর ডুরেলের।

থরথর করে কেঁপে উঠল আহত সৈনিক, তারপর স্থির হয়ে গেল।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল মেজর, দূরে তাকাল ফাঁকা দৃষ্টিতে।

'আহত হয়েছে ক'জন, মেজর ডুরেল?' গলা ক্রমেই চড়ছে কর্নেল মর্গানের।

ঘাড় ফেরাল মেজর, চেহারা দেখে মনে হলো এই মাত্র সে কর্নেলের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এতক্ষণে যেন শুনতে পেল সে প্রশ্নটা। 'আহত?' বেসুরো শোনাল তার গলা। 'উনিশজন মারা গেছে। অন্তত এখন পর্যন্ত আমাকে তাই জানানো হয়েছে। আহত হয়েছে কম করেও তার দ্বিগুণ।'

দুঃসংবাদটা শুনে রাগে বিকৃত হয়ে গেল কর্নেল মর্গানের নিষ্ঠুর চেহারা। 'আর গেরিলারা? নিশ্চয়ই বিরাট কোনও দল এসেছিল? আমরা কতগুলোকে খতম করতে পেরেছি?'

'প্যারাপেটের ওপর দু'জন আফগান মারা গেছে। মাইনফিল্ডে মরেছে আরও দু'জন।'

হাঁ হয়ে গেল কর্নেলের মুখ। খেঁকিয়ে উঠল, 'বিরাট বড় দল না হলে আমাদের এতো ক্ষতি করতে পারত না আফগানরা, আর আপনি বলছেন ওদের মাত্র চারজন মারা গেছে? অসম্ভব!'

'আপনি ভুল বুঝছেন,' দীর্ঘশ্বাস চাপল মেজর ডুরেল। 'আফগানরা দুর্গ আক্রমণ করেনি।'

'তা হলে কী করছিল?'

'পালাচ্ছিল। বন্দি আফগানরা পালিয়ে গেছে।'

'আক্রমণকারীদের একজনকেও আমরা খতম করতে পারিনি?'

'একজনকে। কিন্তু সে আফগান নয়।'

অধৈর্য হয়ে উঠল কর্নেল আরও। 'কী বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন!'

'আমাদের একজন সৈন্য ওদের সাহায্য করছিল, মারা গেছে

সে। সে ছাড়া...' কাঁধ ঝাঁকাল মেজর ডুরেল, চারপাশের ধ্বংসযজ্ঞ দেখল। ছুটোছুটি করছে সৈনিকরা, বেশ কয়েক জায়গায় আগুন জ্বলছে এখনও, এখানে ওখানে পড়ে আছে মৃত বা আহত সৈনিক। 'মাত্র দু'জন লোক আক্রমণ করেছিল। দুই আফগান। তাদের একজনকে আমি জানালা থেকে দেখেছি, ব্যাটল-ড্রেস পরে ছিল।'

'দেখেছেন?'

'প্যারাপেটের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল সে, চলে যাবার আগে ওখান থেকে উঠানে গুলি করেছে।'

'তাকে গুলি করেননি কেন?'

'একই সঙ্গে অনেক কিছু ঘটছিল, গুলি করার সময় পাইনি।'

'আপনি আপনার ডিভিশনের স্পীড-শুটিং চ্যাম্পিয়ন, মেজর,' কর্নেল মর্গানের চেহারায় এটা স্পষ্ট যে মেজরের কথা সে বিশ্বাস করেনি। 'কিছু একটা লুকাচ্ছেন আপনি। নিজের স্বার্থে লুকাচ্ছেন কিছু। ভুল ভাবছেন আপনি। মাত্র কয়েকজন লোক এতো ক্ষতি করতে পারে না।'

'কিন্তু...'

'মন দিয়ে শুনুন,' ধমকের সুরে তাকে থামিয়ে দিল কর্নেল। থমথম করছে তার চেহারা। 'দুর্গ আক্রমণ করেছিল অন্তত দুশো গেরিলা। ঝড়ের কারণে দুর্গের দেয়ালের ওপর গার্ডের সংখ্যা দ্বিগুণ করেছিলাম আমি। সতর্ক থাকতে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলাম ওদের। কিন্তু সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও গেরিলারা কারও চোখে ধরা না পড়ে দুর্গে ঢুকে আসে। তাদের হামলা ছিল নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন। অপ্রস্তুত নিরস্ত্র সৈনিকদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় তারা। কিন্তু আমাদের বীর সাহসী যোদ্ধারা দ্রুত নিজেদের সংগঠিত করে পাল্টা আক্রমণে যায়। শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। পালাবার সময় তারা আহত-নিহতদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়।'

'কিন্তু এভাবে ব্যাপারটা ঘটেনি,' আপত্তির সুরে বলল বিস্মিত মেজর। 'আমি স্পষ্ট দেখেছি...'

'কিছুই দেখেননি আপনি!' ধমকে উঠল হেনরি মর্গান। 'জানালা থেকে উঁকি দিয়ে পুরো ব্যাপার দেখা সম্ভব হয়নি আপনার পক্ষে। আপনিই আমাকে বলেছেন একই সঙ্গে অনেক কিছু ঘটছিল। আপনি এতই হতভম্ব হয়ে পড়েন যে চ্যাম্পিয়ন স্পীড শুটার হওয়ার পরেও হামলাকারীদের দিকে একটা গুলিও ছুঁড়তে পারেননি। যা বলছি ঠিক তাই রিপোর্ট করবেন আপনি, নইলে কাপুরুষতা এবং অবাধ্যতার অভিযোগে আপনাকে কোর্ট-মার্শালের সামনে দাঁড় করাব আমি।'

রিযাইন দিচ্ছি আমি, মনে মনে বলল মেজর ডুরেল। তিক্ত মনে ভাবল, কোর্ট-মার্শাল হলে তার পারিবারিক সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। আস্তে করে মাথা দোলাল সে।

খানিকটা সন্তুষ্ট হলো হেনরি মর্গান। 'আপনার অধীনস্থ অফিসারা যেন আপনার রিপোর্ট অনুসরণ করে নিজেদের রিপোর্ট লেখে সেটা আপনি দেখবেন, মেজর ডুরেল। মাত্র কয়েকজন লোক এধরনের আক্রমণ করতে পারে না।'

কর্নেল হেনরি মর্গান বলল না, যদি সত্যিই মাত্র দু'তিনজন এই মাপের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে থাকে, তা হলে তার সুপিরিয়র অফিসাররা উপযুক্ত ব্যাখ্যা দাবী করবে। কোনও ব্যাখ্যা দেবার উপায় নেই তার। ক্যারিয়ার বলতে কিছু থাকবে না তার আসল ঘটনা রিপোর্ট করলে। সেক্ষেত্রে বাকি জীবন হয়তো এই আফগানিস্তান নামের দোজখেই কাটাতে হবে তাকে। সেটা হতে দেয়া যায় না। এমনিতেই তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সুপিরিয়র অফিসাররা। এখন নিশ্চিত ভরাডুবি থেকে রক্ষা পেতে হলে মাত্র একটা উপায়ই খোলা আছে তার সামনে।

মেজরের চোখে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'এতদিন খুব নরম ব্যবহার করেছি আমি শয়তানের দোসর আফগান কুকুরগুলোর

সঙ্গে। জুনিয়র অফিসারদের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ভেবেছি তারা ঠিক মতো কাজ করবে। এরকম ভুল আর করব না আমি, এবার সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় অপারেশন আমি নিজে পরিচালনা করব।'

নির্বিচারে নিরীহ মানুষ খুন করবে পশুটা, মনে মনে বলল মেজর ডুরেল।

'সোলজারদের একত্র করুন,' চড়া গলায় নির্দেশ দিল কর্নেল মর্গান। 'তৈরি হবার নির্দেশ দিন সবাইকে। এক ঘণ্টার মধ্যে অপারেশনের জন্যে তৈরি চাই আমি জ্যান্ত সবাইকে।'

নরম গলায় দ্বিমত পোষণ কর মেজর ডুরেল। 'কিন্তু এই ঝড়ের ভেতর... কিছুই তো দেখা যাবে না!'

হাতের ঝাপটায় তার কথা উড়িয়ে দিল কর্নেল মর্গান। 'শত্রুও কিছু দেখবে না, মনে করবে আমরা এই আবহাওয়ায় দুর্গ ছেড়ে বের হবো না। জানবে না আমরা বেরিয়ে পড়েছি। ওদের কৌশলই ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব আমি। যেরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের ওপর হামলা করেছে, ঠিক তেমনি ভাবেই আক্রান্ত হবে তারাও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্দেশ পালন করতে দুর্গের দিকে রওনা হলো মেজর ডুরেল। অফিসে ফিরে চলল কর্নেল।

আধঘণ্টা পর অফিসের আরামদায়ক চেয়ার ছেড়ে আবার উঠানে বেরিয়ে এলো হেনরি মর্গান। বালি-ঝড়ের মধ্যে তার অপেক্ষায় লাইন দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সৈনিকরা। অফিসাররা জটলা করছে। কর্নেলকে দেখে চুপ করে গেল।

ঝড়ের একটানা শোঁ-শোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে ইঞ্জিনের ভারী, গমগমে আওয়াজ। এদিকেই এগিয়ে আসছে আওয়াজগুলো। ধুলো থেকে বাঁচতে চোখ সরু করে ডানদিকে তাকিয়ে থাকল কর্নেল মর্গান। ওদিক থেকে কী যেন মিটমিটে আলো বিকিরণ করছে। আরেকটা আলো দেখা গেল। ওটার পিছু

নিয়ে আসছে আরও আলো। আগের মতো টিপটিপ করছে না, কাছে চলে আসায় বোঝা যাচ্ছে, একটানা জ্বলছে বাতিগুলো। বালি-ঝড়ের মধ্য দিয়ে আরও কাছিয়ে আসছে, দেখলে মনে হয় হিংস্র একদল দানবের জ্বলজ্বলে চোখ। ঝড়ো বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে ইঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে। উড়ন্ত বালির পর্দা ছেদ করে বেরিয়ে এলো বিরাট আকৃতিগুলো। সারি দিয়ে আসছে ট্যাঙ্ক ও আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার, তাদের পিছনে মেরিন সৈন্যবাহী ট্রাকের সারি। দুর্গের পিছনের সুরক্ষিত উঠান থেকে ওগুলোকে ডেকে পাঠিয়েছে কর্নেল।

থেমে গেল যন্ত্রদানবগুলো। ইঞ্জিনের আওয়াজ কমে গেল। তারপরও থরথর করে কাঁপছে জমিন। চিৎকার করে সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম ও মেজর ডুরেলকে নির্দেশ দিল কর্নেল মর্গান। তার পিছু নিয়ে একটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারে উঠল দু'জন, খোলা টারেট দিয়ে ভিতরে নামল।

একজন গানার হ্যাচ বন্ধ করে লিভার আটকে দিল শক্ত করে। ধাতব আওয়াজটা ভোঁতা শোনাল। ইঞ্জিনের অস্পষ্ট গুঞ্জন ছাড়া ভিতরে আর কোনও আওয়াজ নেই।

যন্ত্রটার নিচু, সরু, লম্বাটে পেটে কয়েকজন সৈনিক বসে আছে। কুঁজো হয়ে এগোতে হলো কর্নেলকে, শেলফে রাখা কামানের গোলা ও মেশিনগানের বুলেটে ভরা বেল্টগুলোকে পাশ কাটাল সে, বসে পড়ল ক্যারিয়ারের পাঁচ ক্রুর পিছনে। তার ইশারায় পিছনের অংশে বসা চার সৈনিকের পাশে বসল মেজর ডুরেল ও সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম। ঘাড় ফিরিয়ে একবার সার্জেন্টকে দেখে নিল কর্নেল মর্গান। লোকটার উপস্থিতি তার মনে স্বস্তি এনে দিল। বাইরে বের হলে সার্জেন্টকে সবসময় সঙ্গে রাখা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল তার মেজর ডুরেলের কথা ভেবে। এখানে তাকে না আনলেও চলত। লোকটা দুর্গে থেকে গিয়ে অন্য অফিসারদের রিপোর্ট সুপারভাইয করতে

পারত। কিন্তু অতিরিক্ত তর্ক করছিল লোকটা, কাজেই শাস্তি হিসাবে তাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বিপদের মুখোমুখি করতে চেয়েছে সে। তার ধারণা মেজর একাধারে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং কাপুরুষ। মনে মনে বলল, এই একবার অন্তত নিরাপদে বসে বসে অভিযোগ না করে যুদ্ধে জড়াতে হবে তোমাকে। গোলাগুলি শুরু হলে তোমাকেই আগে পাঠাব আমি। মেজর ডুরেল, যুদ্ধে হয় নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে হবে তোমাকে, নইলে আগামী বিশ বছর জেলে কাটাতে হবে।'

নিষ্ঠুর চেহারায় কঠোরতার ছাপ পড়ল কর্নেল মর্গানের। ক্যারিয়ারের কমান্ডারের দিকে তাকাল সে। 'রেডিও করো কলামে। রওনা হচ্ছি আমরা।'

নির্দেশ পালন করল কমান্ডার। আর্মার্ড ক্যারিয়ারের ইঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেল কয়েক গুণ। দ্রুত গতি বেড়ে যাওয়ায় কর্নেল মর্গানের পেট চেপে এলো মেরুদণ্ডের দিকে।

সুইচ টিপে হেডলাইট নিভিয়ে দিল এবার কমান্ডার। আলোর কোনও দরকার নেই, সেনসরের কাজে বিঘ্নই ঘটাত বরং আলো। রাতের অন্ধকারে নিরাপদে পথ দেখাতে সেনসরই যথেষ্ট। হেডলাইট শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিতে পারে আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারের অবস্থান।

ক্রু কম্পার্টমেন্টের ছোট একটা টেলিভিশন-স্ক্রিনে উড়ন্ত বালিগুলোকে সবজেটে দেখাচ্ছে। নাইটভিশন ক্যামেরা থেকে ইমেজ আসছে। অন্ধকারে বালি-ঝড়ের মধ্যেও অনেকদূর পর্যন্ত দেখছে ক্যামেরা। ঝড় যখন থামবে, ততক্ষণে গোটা কলাম দুর্গের কাছ থেকে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই পাহাড়ের ওপর থেকে দুর্গের দিকে নজর রাখবে গেরিলারা। ঝড় থামবার পর তারা দেখবে পাল্টা আক্রমণ করতে ট্যাঙ্ক বা আর্মার্ড ক্যারিয়ার বের হচ্ছে না দুর্গ থেকে। নিশ্চিন্ত বোধ করবে তারা। জানবে না তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে আর্মার্ড কলাম আগেই

রওনা হয়ে গেছে। গেরিলারা কল্পনাও করতে পারবে না তাদের কতটা কাছে চলে এসেছে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

ভ্রূ কুঁচকে চিন্তায় ডুবে গেল কর্নেল মর্গান। ভাল করেই জানে, তার পরিকল্পনা সফল হবে না, যদি ঠিক যা ভেবেছে সেভাবে সবকিছু না ঘটে। এই অ্যাটাক ফোর্সকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। তা যদি না হয়, তা হলে আর্মার্ড কলাম অযথাই বালি-ঝড়ের ভিতর মাইলের পর মাইল এগিয়ে যাবে।

কোথায় যেতে হবে সেটা ঠিক করে ফেলেছে কর্নেল। গত পরশু দুর্গের দক্ষিণ-পুবে একটা গ্রামের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে দুটো হেলিকপ্টার গানশিপ। গতকালকে একটা আর্মার্ড কলাম ধ্বংস হয়েছে ওই জায়গা থেকে মাইল দশেক উত্তর-পশ্চিমে একটা উপত্যকায়। আজ রাতে যারা দুর্গ আক্রমণ করেছিল তারা পুব দিকে গেছে। এটা হতেই পারে যে, দুর্গ থেকে বেশ কিছুদূর যাবার পর দিক বদলাবে তারা পাল্টা আক্রমণ এড়াবার জন্য। কিন্তু তাই কি করবে তারা? দরকার কী? অন্ধকার রাতের এই বালি-ঝড় তাদের তো আড়াল করেই রাখবে। কাজেই সরাসরি নিজেদের আস্তানায় ফিরতে চাইবে তারা। এদিক-ওদিক সরতে গিয়ে ঝড়ের মধ্যে পথ হারানোর ঝুঁকি না নেবার সম্ভাবনাই বেশি।

আপন মনে মাথা দোলাল কর্নেল মর্গান। যতবার সে যুক্তি দিয়ে নিজের ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখছে, তত নিশ্চিত হচ্ছে যে তার ধারণায় ভুল নেই। পুব। সবকিছু পুব দিক নির্দেশ করছে। টার্গেট কোনদিকে আছে জানা থাকায় ছড়িয়ে পড়তে হবে না আর্মার্ড কলামকে, পুরো শক্তি নিয়ে আক্রমণে যেতে পারবে তারা। বিস্ময়ের সুযোগটা পুরোপুরিই নেয়া যাবে, ফলে গেরিলাদের খুঁজে বের করে নিশ্চিহ্ন করতেও দেরি হবে না। ...তবে এমনও হতে পারে, হয়তো কোনও ভুল আছে পরিকল্পনায় – দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলছে হেনরি মর্গান। অবশ্য ভুল যদি থেকেই থাকে, তা হলে

সময় নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হবে না তার। কিন্তু যদি তার ধারণা সঠিক হয়, যদি সে ধ্বংস করে দিতে পারে গেরিলাদের ঘাঁটি, তা হলে বিজয়টা হবে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে ইদানীংকালের একের পর এক ব্যর্থতা নিয়ে আর কথা ওঠাবে না সুপিরিয়র অফিসাররা।

ঘাড় ফিরিয়ে মেজর ডুরেলকে দেখল কর্নেল মর্গান। মনে মনে বলল, তোমার-আমার মধ্যে একটা ব্যাপারে মিল আছে। তুমি যেমন এই যুদ্ধ ঘৃণা করো, ঠিক তেমনি আমিও করি। যুদ্ধটা শুরুই হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু মেজর ডুরেল, তুমি যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছ, আমি তখন সফলতার সঙ্গে ক্যারিয়ার গড়বার জন্যে কাজে লাগাচ্ছি যুদ্ধটাকে। প্রমোশনের জন্যে যা করতে হবে, তা-ই করব আমি।

টেলিভিশনের স্ক্রিনের দিকে তাকাল সে। বাইরের ঝড়ের প্রচণ্ডতা দেখাচ্ছে নাইটভিশন ক্যামেরা। পাক খাওয়া উড়ন্ত বালির ঘূর্ণি আগের চেয়ে কমে গেছে, বালির পর্দা আগের চেয়ে হালকা বলে মনে হচ্ছে। বাতাসের জোরও মনে হয় কমে গেছে। বোধহয় আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই থেমে যাবে ঝড়, বাতাস পরিষ্কার হয়ে যাবে। বেশি তাড়াতাড়ি থেমো না ঝড়, মনে মনে বলল কর্নেল। মাঝ-সকাল পর্যন্ত যদি ঝড় বয়ে চলে, তা হলে দুর্গ থেকে অনেকটা সরে যেতে পারব আমরা। তৈরি হয়ে যাব অতর্কিতে হামলা করবার জন্য। এর বেশি কিছু চাই না আমি। সামান্য একটু বাড়তি সময়।

দক্ষিণ-পুবে পাহাড়ের কোলে গা এলিয়ে দেয়া একটা উপত্যকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই আর্মার্ড কলাম। আরেকটা কলাম যাচ্ছে উত্তর-পুবে পাহাড়ের ওপাশের আরেকটা উপত্যকায়। যখন পাহাড়ের দু'পাশে দুটো কলাম অবস্থান নেবে, আক্রমণ শুরু করবার নির্দেশ দেবে সে। কলাম দুটো দু'পাশ থেকে পাহাড়ি এলাকায় ঢুকবে, এগোবে পরস্পরের দিকে।

ওদিকে এমন কিছু জায়গা পড়বে, যেখানে ট্যাঙ্ক বা আর্মার্ড ক্যারিয়ার এগোতে পারবে না। ওসব জায়গায় ট্রাক থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে সার্চ চালাবে সোলজাররা। যদি তাদের চোখে গেরিলাদের কোনও স্ট্রংহোল্ড পড়ে, তা হলে রেডিওতে কোঅর্ডিনেট পাঠাবে তারা, সেই অনুযায়ী কামানের গোলা ও রকেট ছোঁড়া হবে ট্যাঙ্ক-আর্মার্ড ক্যারিয়ার থেকে। শুধু তাই না, খরগোশ শিকার করতে হলে তাড়া করে বেরও করতে হয়, কাজেই সে-ব্যবস্থাও নিয়েছে কর্নেল। ঝড় থামলেই গানশিপগুলো উড়াল দেবে, পাহাড়ের প্রত্যেকটা উপত্যকা, খাঁজ-ভাঁজ সার্চ করতে শুরু করবে আকাশ থেকে। যদি ওসব জায়গায় গেরিলাদের দেখা যায় তা হলে আত্মসমর্পণের সুযোগ না দিয়ে মিসাইল ছুঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

দুর্গ আক্রমণ করে আমার সুবিধে করে দিয়েছ তোমরা, দাঁতে দাঁত চাপল কর্নেল মর্গান। এতো রাগিয়ে দিয়েছ, এতোটাই কোণঠাসা করে দিয়েছ যে, সরল ভাবে গোটা ব্যাপারটাকে দেখছি এখন আমি। পুরো সেক্টরের সবদিকে একসঙ্গে আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব নয়, কাজেই একটা দিক বেছে নিয়েছি আমি। তোমরা যদি ওই পুবের পাহাড়ের দিকে থেকে থাকো, তা হলে তোমরা শেষ। সময় যতই লাগুক, কেয়ার করি না আমি। এবার ঝাড়ে-বংশে খতম করব তোমাদের। মরার আগে আফসোস করবে আর ভাববে, দুর্গে হামলা করা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল।

হঠাৎ কর্নেল মর্গানের মনে পড়ল সেই লোকটার কথা। ওই লোকটাই টিয়ার-গ্যাস ছুঁড়ে সেলের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। প্যারাপেটের ওপর থেকে তাকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছে মেজর ডুরেল। মেজর ডুরেলের রিপোর্ট কতটা বিশ্বাস করা যায় জানে না সে, তবে এটা জানে, কোর্ট-মার্শাল এড়িয়ে নিজের ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্যে কতটা তার চেপে যেতে হবে। সুপিরিয়র

অফিসাররা তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, তাকে অভিযুক্ত করবে, সেটা হতে দেয়া যায় না। আলতো করে নিজের ছেলা গালে হাত বোলাল কর্নেল, জ্বলছে এখনও গাল। ওই লোকটা। ওই লোকটাকে তার চাই। বিড়বিড় করল সে, 'আমি শপথ করছি, আফগান বন্দিদের যতটা ইন্টারোগেট করা হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি করা হবে তোমাকে। তোমার ইন্টারোগেশনটা আমি নিজে উপস্থিত থেকে দেখব, উপভোগ করব। কথা দিচ্ছি, তোমাকে যেরকম টর্চারের মুখোমুখি হতে হবে, তেমনটা সভ্য সমাজে আজ পর্যন্ত হতে হয়নি আর কাউকে।'

এগারো

হাঁটবার গতি বেড়ে গেছে রানার, হালকা চালে দৌড়াচ্ছেও বলা যায়। কাঁধের ওপর সোহেলের শিথিল শরীরের ওজনটা যেন ক্রমেই বাড়ছে। উদ্বেগ বোধ করছে রানা, অন্ধকারে ওই ডোবা খুঁজে পাবে তো? ওখানে পৌঁছলে গুহাটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়। ঘোড়াগুলো ওখানেই থাকবার কথা ছিল। হ্যাঁ, ছিল। দেড় ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করবার কথা নয় আফগানদের। দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে বেশ অনেকক্ষণ আগে। ফিরতি পথে কি রওনা হয়ে গেছে তারা? উইলিয়াম হবসনের কম্পাসের ফসফরেসেন্ট ডায়াল আরেকবার দেখে নিয়ে দিক খানিকটা বদলাল ও। ঈসা আজনবী পিছনেই আছে, তার প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছে রানা। ঈসা আজনবী প্রার্থনা করছে আফগানরা যেন ফিরতি পথে রওনা না হয়ে গিয়ে থাকে।

পায়ের পেশী ও কাঁধ আড়ষ্ট ঠেকছে রানার, ক্র্যাম্প ধরতে শুরু করেছে পেশীতে, দড়ির ঘষায় হাতের তালু থেকে রক্ত পড়ছে এখনও। অসম্ভব ক্লান্তি লাগছে রানার, তারপরও ছুটবার গতি আরও বাড়াল ও।

পায়ের নীচে ঢাল আরও খাড়া হচ্ছে। টের পেল, উপত্যকার কিনারায় চলে এসেছে ওরা, সামনে খানিকটা দূরে শুরু হয়েছে টিলার সারি। থেমে দাঁড়াল রানা, শুকনো দিঘির মতো সেই গর্তের গায়ে গুহাটা খুঁজতে হবে, সেজন্যে ঈসার সাহায্য দরকার। আগে বের করতে হবে গর্তমতো জায়গাটা। কিছুক্ষণ ধরে ঈসা আজনবীর গলার আওয়াজ শুনতে পায়নি ও। ঝড়ের মধ্যে অন্যদিকে চলে যায়নি তো সে?

একটা ছায়ামূর্তি রানার পাশে এসে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে ঈসা আজনবী।

'এই ঢালের কোথাও ডোবাটা আছে,' ঝড়ো বাতাসের আওয়াজের ওপর দিয়ে চিৎকার করে বলল রানা। 'কিন্তু এখান থেকে ওটা ডানদিকে, না বামদিকে? ...আপনি ডানদিকে যান। দু'হাজার ফুট যাবেন। তারপরও যদি জায়গাটা খুঁজে না পান, তা হলে ফিরে এসে আমার সঙ্গে যোগ দেবেন।'

উদ্বিগ্ন ঈসা আজনবী জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনিও যদি জায়াগাটা খুঁজে না পান, তখন কী হবে?'

ক্লান্ত শোনাল রানার গলা। 'পায়ে হেঁটে পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়ব।'

'বেশিদূর যাবার আগেই আমেরিকানদের হাতে ধরা পড়তে হবে তা হলে।'

'ঝড় থামার আগে আমাদের দেখতে পাবে না ওরা।' অধৈর্য বোধ করছে রানা।

'এক ঘণ্টার মধ্যে ভোর হয়ে যাবে। দিনের আলোয় বালি-ঝড়ের মধ্যেও ভালই দেখা যায়।'

'সুবিধেটা আমরাও পাব,' বলল রানা। তাগাদা দিল, 'দেরি করবেন না, রওনা হয়ে যান।'

ঝড়ের ভিতর হারিয়ে গেল ঈসা আজনবী।

কাঁধের ওপর সোহেলকে আরও আরামে রাখতে দাঁড়ানোর ভঙ্গি সামান্য পাল্টাল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা, দোস্ত?'

'রিকশায় চড়ে কখনও এতো আরাম পাইনি!' ফিসফিস করল সোহেল।

খানিকটা স্বস্তি অনুভব করল রানা। সোহেল যখন কৌতুক করতে পারছে, তা হলে দেখে যতটা মনে হয়েছে, ততটা খারাপ অবস্থা নয় ওর। হাসতে যাচ্ছিল ও. চমকে উঠল শরীরের পাশ দিয়ে উষ্ণ, আঠালো রক্ত নামছে টের পেয়ে। তাড়াহুড়ো-ব্যস্ততার মাঝে আগে ব্যাপারটা খেয়াল করেনি।

নিজেকে রানা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, রক্তটা আসলে ওর বাহু চিরে যাওয়া বুলেটের ক্ষত থেকে বের হচ্ছে। ধারণাটা নিজেরই বিশ্বাস হলো না ওর। 'গুলি কোথায় লেগেছে, দোস্ত?' জিজ্ঞেস করল ও। ধকধক করছে বুকের ভিতর।

'ডান কাঁধে।'

'খারাপ?'

'মনে হয়। একটু নড়লেও রক্ত পড়ে। দুর্বল হয়ে গেছি।'

সোহেলকে সাবধানে নামাল রানা, গায়ের শার্ট ছিঁড়ে ক্ষতটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল, তারপর আবার ওকে তুলে নিল কাঁধে, বামদিকে হাঁটতে শুরু করল দ্রুত পায়ে। কয় পা এগোচ্ছে সেটা গুনছে। 'আর কিছুক্ষণ কষ্ট কর্, দোস্ত।'

'তুই কী করে এলি, রে?' সোহেলের দুর্বল গলা শুনতে পেল রানা। 'আমি তো ভেবেছিলাম তোরা কেউ জানিসই না আমি এখানে...' ওর বাকি কথা হারিয়ে গেল বাতাসের গর্জনে।

'পরে বলব, চুপ করে বিশ্রাম নে,' এগিয়ে চলল পরিশ্রান্ত, উদ্বিগ্ন রানা। ওর দেহের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে এখনও।

পাঁচশো ফুট এগিয়েছে ও। গর্ত মতো জায়গাটা কোথায়? উপত্যকার কিনারা ধরে বাঁক নিয়েছে টিলার নীচের ঢাল।

একটা পাথরে হোঁচট খেল রানা, পড়ে যাচ্ছে, ওর হাত থেকে ছুটে গেল সোহেল।

ডিগবাজি খেয়ে ধুপ করে ছয় ফুট নীচের শক্ত, জমাট বাঁধা বালির ওপর পড়ল রানা, গড়াতে শুরু করল, থামাতে পারছে না শরীরটা। ডোবা, ব্যথা অগ্রাহ্য করে ভাবল ও। একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে থামল ওর শরীর। উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে সোহেলকে খুঁজতে শুরু করল রানা। একটা ঘোড়ার নাক ঝাড়বার আওয়াজ শুনতে পেল। ওপর থেকে এসেছে আওয়াজটা।

সোহেল কোথায়?

কার যেন হাত শক্ত করে ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরল। এক ঝটকায় খাপ থেকে ছোরাটা বের করে ফেলল রানা, ওটা চালাতে গিয়েও থমকে গেল। আফগান লোকটা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে উঠেছে। ভাষা না বুঝলেও বক্তব্য কী হতে পারে আন্দাজ করতে পারল ও।

আপনারা দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও চলে যাননি, ভাবল কৃতজ্ঞ রানা। ঝড়ের মধ্যেও নিশ্চয়ই দুর্গের দিক থেকে একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছেন। আতঙ্কিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল, তারপরও যাননি।

বুযকাশি খেলার পর আহম্মদ আলী ওর সঙ্গে করমর্দন করেছিল, মনে পড়ল রানার। করমর্দনের চেয়ে বড় সম্মান আফগানরা আর কিছুকে মনে করে না। ওটা নীরবে কথা দেয়া: সারাজীবন তোমাকে মনে রাখব আমি। বিপদে আমাকে পাশে পাবে।

দ্রুত আফগানের সঙ্গে করমর্দন করল ও, হাতটা না ছেড়েই লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে সোহেলকে খুঁজতে শুরু করল।

কোথায় ও?

দু'মিনিট পর একটা বোল্ডারের পাশে সোহেলকে পড়ে থাকতে দেখল ওরা।

ঝুঁকল রানা, সোহেলের গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে ওর। সোহেলকে আস্তে করে কাঁধে তুলে নিল রানা। গোঙাল সোহেল, অস্ফুট স্বরে প্রলাপ বলছে: 'পালা, রানা! পালিয়ে যা! আমার জন্যে পিছিয়ে পড়বি! ধরা পড়ে যাবি! পালা! ওরা খুব...' থেমে গেল সোহেল। জ্ঞান হারিয়েছে।

'আসুন!' তাগাদার সুরে বলল রানা আফগানকে।

লোকটা ভাষা না বুঝলেও ও কী চায় সেটা বুঝল, পথ দেখাল, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

পিছু নিল রানা, ঢাল বেয়ে উঠে এলো। ঈসা! ঈসা কোথায়? ওর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। বিপদের ঝুঁকি বাড়বে তাতে। তবুও।

'ডানদিকে খাদ, কানের কাছে ঈসা আজনবীর গলা চমকে দিল ওকে। 'বেশিদূর যেতে পারিনি।' রানার পাশে চলে এলো সে।

বামপাশে ফুট দশেক দূরেই দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াগুলো। গেরিলারা রাশ ধরে রেখেছে শক্ত হাতে, নইলে ঝড়ের প্রকোপে ভয় পেয়ে ছুটে চলে যেতে পারে ভীত জন্তুগুলো।

'একটু সাহায্য করুন,' ঈসাকে বলল রানা।

সোহেলের অচেতন দেহের ওজন অনেকটাই নিয়ে নিল ঈসা আজনবী, রানাকে সাহায্য করল ঘোড়ায় উঠতে। জিনের ওপর বসে কোলে রাখল রানা সোহেলের দেহ। শক্ত করে ধরল দু'হাতে।

আফগানরা কেউ ঘোড়ায় চড়ছে না, দড়ি ধরে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল। একটা ঢাল বেয়ে ওপরে, পাহাড়ের দিকে চলেছে তারা।

ভোর হতে বেশি বাকি নেই, কিন্তু এখনও চারপাশ ঘুটঘুটে

অন্ধকার। আধঘণ্টা পর পাহাড়ি এলাকার অনেকটা ওপরে উঠে এলো ওরা। ঝড় এখনও আছে, কিন্তু উড়ন্ত বালি পিছনের নিচু উপত্যকা ছাড়িয়ে এদিকে আসছে না। ঝড়ো বাতাসের দাপটে বারবার এদিক-ওদিক মাথা দোলাচ্ছে গাছগুলো। ওগুলোর শাখা খসখস আওয়াজ করে ঘষা খাচ্ছে।

দু'পা দিয়ে ঘোড়াটার পেট আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রানা, দু'হাতে ধরে আছে সোহেলকে। দড়ি ধরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে একজন আফগান গাইড।

'সোহেল?' ডাকল রানা।

কোনও সাড়া দিল না সোহেল।

'সোহেল?' ঝুঁকে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল রানা। অনিয়মিত শ্বাস নিচ্ছে সোহেল। পালস দেখল। বেতালা ছন্দে চলছে হৃৎপিণ্ড। শক্ত করে বাঁধবার পরেও নড়াচড়া হওয়ায় বুলেটের ক্ষতটা থেকে সরু একটা ধারায় বেরিয়ে আসছে রক্ত। আরও শক্ত করে বেঁধে রক্তপাত বন্ধ করবার অদম্য ইচ্ছেটা গলা টিপে মারল রানা। শিরা যদি পেশীতে রক্ত সরবরাহ না করতে পারে, তা হলে এই আবহাওয়ায় খুব দ্রুত গ্যাংগ্রিন শুরু হবে মাংসে, রক্তক্ষরণে না মরলে চিকিৎসার অভাবে সারাশরীর পচে অসহ্য কষ্ট পেয়ে মারা যাবে সোহেল। কিন্তু রক্ত এভাবে পড়লেও ধীরে ধীরে মরতেই হবে ওকে। ব্যান্ডেজটা আরও খানিকটা টাইট করে বাঁধল রানা, রক্তপাত কমে গেল তাতে অনেকখানি আপাতত এর বেশি কিছু করবার নেই ওর, হতাশ হয়ে ভাবল রানা। জানেও না, কখন যেন ওর দু'চোখের কোণ ভিজে উঠেছে।

ধীর গতিতে অন্ধকারে একটানা পথ চলা, এর যেন কোনও শেষ নেই। তারপর আস্তে আস্তে ভোর হলো, তারও অনেক পরে হিন্দুকুশ পর্বতমালার ওপার থেকে মুখ তুলল তরুণ সূর্য। অনেকক্ষণ হলো ঝড়ো বাতাস থেমে গেছে, সেই ভোরের পরপরই।

পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আফগান

পথপ্রদর্শকরা। ঘোড়া হাঁটিয়ে নিতে হচ্ছে সোহেলের কারণে।

দুপুরের দিকে রানা যেখানে বুযকাশি খেলেছিল, সেই মাঠে পৌঁছল সবাই। চারপাশে পাইন বন, ছায়া পড়েছে তলায়। বনের ভিতর দিয়ে ঢাল বেয়ে উঠছে এখন ওরা। উৎসুক চোখে সামনে তাকিয়ে আছে রানা বসতিটা দেখবার জন্য। জঙ্গলের ভিতর ঢুকবার পর থেকেই কেমন একটা অস্বস্তির বোধ পেয়ে বসেছে ওকে। ক্রমেই বাড়ছে অস্বস্তি।

কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এতক্ষণে তাঁবুগুলো দেখতে পাবার কথা। পিছনে ফেলে আসা মাঠে ঘোড়সওয়ার ছিল না কেন? বসতির কাছে চলে এসেছে ওরা, গ্রামবাসীদের একজনকেও তো দেখা যাচ্ছে না।

তারপর গাছের ফাঁকে তাঁবু দেখতে পেল রানা। নিজেকে ধমক দিল, তুমি এত বেশি পরিশ্রান্ত যে প্যারানইয়া পেয়ে বসেছে তোমাকে।

কিন্তু বসতির কাছাকাছি এসেই আবার উৎকণ্ঠা পেয়ে বসল ওকে। বেশিরভাগ তাঁবু নেই। যেগুলো আছে, সেগুলোও খুলে ফেলা হচ্ছে, ভাঁজ করে তোলা হচ্ছে খচ্চরের পিঠে। মহিলা ও বাচ্চারা রান্নার সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, সুতো কাটবার চরকা, কম্বল – এসব জড় করছে। যোদ্ধারা পরীক্ষা করে দেখছে তাদের অস্ত্র।

হঠাৎ চিল-চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়াল রানা। দেখল, এক বৃদ্ধা এলোমেলো পা ফেলে উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক তরুণের বুকে। পাগলের মত চুমো দিচ্ছে ওর গালে। সন্তান ফিরে পেয়েছে তার মা।

সচকিত সবাই। রানা ও ঈসাকে সদলে ফিরতে দেখে হই-চই পড়ে গেল সবার মধ্যে। বাচ্চারা ছুটে এসে ঘিরে ধরল দলটাকে, আন্তরিক হাসছে। তাদের সরিয়ে এগিয়ে এলো গেরিলারা, আঞ্চলিক ভাষায় গাইডদের একের পর এক প্রশ্ন করতে শুরু করল ব্যস্ত হয়ে, সেইসঙ্গে কোলাকুলি করছে বন্দি আফগানদের

সঙ্গে। ওদের জীবিত ফিরতে দেখে স্বজনদের মধ্যে খুশির হুল্লোড় পড়ে গেল। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরছে তারা। তাদের হাঁক-ডাকে সর্দারের তাঁবু থেকে বের হলো ইউনূস মোসাদ্দেক, আলফাজ কুশে ও আহম্মদ আলী, রানা ফিরে এসেছে দেখে হাঁটবার গতি বেড়ে গেল তাদের।

ঘোড়া থেকে রানাকে নামতে সাহায্য করল ঈসা আজনবী।

কারও দিকে মনোযোগ নেই রানার, সোহেলকে পাঁজাকোলা করে অস্থায়ী ক্লিনিকের দিকে পা বাড়াল ও, চলার ওপরেই ঘাড় ফিরিয়ে ঈসা আজনবীকে বলল, 'ঈসা, দেখুন কী ব্যাপার। জেনে আমাকে জানান।'

গুহা-মুখের কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে ফারা রাইনার, রানা ও আহত সোহেলকে দেখে সিগারেট ফেলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো।

পিছনে ঈসা আজনবীর গলা শুনতে পেল রানা, কয়েকজন যোদ্ধার সঙ্গে কথা বলছে। সর্দারদের কী যেন বলল দ্রুত। আধ মিনিট পরেই রানাকে ধরে ফেলল সে। 'সবাই ভয় পাচ্ছিল আপনি আর ফিরে আসবেন না। আমেরিকানরা আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

'একটু পরে শুনব, আগে আমার বন্ধুকে ভেতরে নিয়ে যাই,' বলল রানা।

'আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করছে সবাই।'

ফারা রাইনার এগিয়ে এসে অচেতন সোহেলের পা দুটো ধরল।

পিছু নিল ঈসা আজনবী। 'সবাই খুশি যে আপনি বেঁচে আছেন। আরও খুশি যে বন্ধুকে নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন।'

বিরক্ত হলেও শান্ত গলায় বলল রানা, 'ওদের জানান সবার আন্তরিক সহানুভূতি পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।'

ফারা রাইনারের সাহায্য নিয়ে রোদের মধ্য থেকে গুহার শীতলতায় সোহেলকে বয়ে নিল গেল রানা, পুরু করে বিছানো

খড়ের ওপর আস্তে করে শুইয়ে দিল।

চিৎ হয়ে পড়ে আছে সোহেল, চেতনা নেই ওর। গুহার ছায়ার ভিতরেও ওর ফোলা, ক্ষতবিক্ষত চেহারা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

'ওর ডান কাঁধ,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'ওখানে গুলি খেয়েছে সোহেল।'

'দেখেছি,' ডাক্তারি ব্যাগ কাছে টেনে নিল ফারা রাইনার, খুলে ভিতরে তাকাল। হতাশার কারণে রাগের ছাপ পড়ল তার সুন্দর চেহারায়।

জ্বরের ঘোরে গুঙিয়ে উঠল অচেতন সোহেল।

'কথাটা আপনার শোনা দরকার,' তাগাদার সুরে রানাকে বলল ঈসা আজনবী।

'পরে শুনব,' বিরক্তি চেপে বলল উদ্বিগ্ন রানা।

'শুনতেই হবে,' জোর দিয়ে বলল ঈসা। 'এখনই। চলে যাচ্ছে ওরা সবাই। ওরা দুঃখিত। কিন্তু যেতেই হবে ওদের।'

ঝট করে ঈসা আজনবীর দিকে তাকাল রানা, কী বলবে ভেবে পেল না।

'এটাই বলতে চাইছিলাম,' বলল গম্ভীর আফগান। 'আপনি শুনতে চাইছিলেন না।'

ফারা রাইনারের দিকে তাকাল রানা। 'কোনও সাহায্য লাগবে তোমার? থাকতে হবে আমাকে এখানে? ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার আমার। ব্যাপারটা জরুরি।'

'বন্ধুর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, এ ছাড়া বলার আর কিছু নেই,' বলল ফারা রাইনার। 'আর কোনও সাহায্যে আসবে না তুমি।'

দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়াল রানা, ঈসা আজনবীর পাশে হেঁটে বেরিয়ে এলো গুহা থেকে।

পুকুরের পাড়ে জড় হয়েছে আফগান পুরুষরা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তিন সর্দার – ইউনূস মোসাদ্দেক, আলফাজ কুশে

ও আহম্মদ আলী। তাদের ঘিরে বসেছে একদল যোদ্ধা। রানা তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই আলফাজ কুশে বলল, 'বিদেশি যোদ্ধা, আমাদের চলে যেতে হচ্ছে।'

মুহূর্তের জন্য অসহায় বোধ করল রানা। 'কেন?' কর্কশ শোনাল ওর কণ্ঠ।

'কারণ আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম,' বলল আহম্মদ আলী।

'বুঝলাম না।'

'আপনি দুর্গ আক্রমণ করে ভয়ঙ্কর রাগিয়ে দিয়েছেন আমেরিকানদের,' মুখ খুলল ইউনূস মোসাদ্দেক।

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। 'আপনারা মনে করছেন গতকালকের আক্রমণে যে আর্মার্ড কলাম ধ্বংস হলো, তাতে রাগেনি ওরা?'

'ওটা ছিল যুদ্ধ,' বলল আলফাজ কুশে। 'দুর্গ আক্রমণটা ব্যক্তিগত অপমান। সিংহের গুহায় ঢুকে সিংহের কান মুচড়ে একটা চড় দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন আপনি।'

'খুব কাছাকাছি সময়ে পরপর কয়েকটা হামলা হয়েছে আমেরিকানদের ওপর,' বলল আহম্মদ আলী। 'পাগল হয়ে উঠবে ওরা, সমস্ত লোকবল কাজে লাগাবে এখন আমাদের খুঁজে বের করতে। ক্ষান্ত দেবে না কিছুতেই। এই এলাকা তছনছ করে ফেলবে।'

'এটাই ছিল আপনাকে সাহায্য করার সময় সবার চিন্তা,' বলল ঈসা আজনবী। 'সর্দাররা শুধু বন্ধুকে উদ্ধার করে আনতে আপনাকে যেতেই দেননি, সাহায্য করেছেন। ওঁরা সবাই জানতেন, আপনি একবার দুর্গ আক্রমণ করলে এই এলাকা থেকে সরে যেতে হবে তাঁদের, দূরে কোথাও নতুন করে বসতি গড়তে হবে।'

মুখ নিচু করে মাটির দিকে তাকাল রানা। এখন সব বুঝতে পারছে ও স্পষ্ট। সোহেলের চিন্তায় এতো অস্থির ছিল যে ব্যাপারটা মাথায় আসেনি ওর, বোঝেনি কত বড় ত্যাগ স্বীকার

করতে বাধ্য করেছে ও এই দুঃসাহসী, দেশপ্রেমিক মানুষগুলোকে। কতগুলো ভিটে ফেলে সরে যেতে হচ্ছে আফগানদের? আরও কত ভিটে পরিত্যক্ত হবে দেশটা সত্যিকার ভাবে স্বাধীন হবার আগে? শেষ পর্যন্ত সত্যি স্বাধীন হতে পারবে আফগানিস্তান, না এতো মানুষের রক্ত বিফলে যাবে?

'আমি সত্যি দুঃখিত,' সর্দারদের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল রানা।

'আপনি আপনার বন্ধুকে উদ্ধার করেছেন, তাই আপনি আমাদের বন্ধু,' দৃঢ় স্বরে বলল আহম্মদ আলী। 'যে-লোক বন্ধুকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে না, সে কিছুতেই আমাদের বন্ধু হতে পারবে না। সে একটা কাপুরুষ।' গেরিলারদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল আহম্মদ আলী। 'আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি। ওদিকে যেতে পারি সেটা আমেরিকানরা ভাবতেও পারবে না। ওখানে নতুন করে যুদ্ধ করব আমরা।'

মাথা নাড়ল আলফাজ কুশে। 'সেটা ঠিক হবে না। উত্তরে যাওয়া উচিত আমাদের। ওদিকের পাহাড়ে সহজেই হারিয়ে যেতে পারব আমরা।'

'যাওয়া দরকার আসলে দক্ষিণে,' মুখ খুলল ইউনূস মোসাদ্দেক। 'দরকার হলে হেলমান্দ বা কান্দাহারে লড়াই করব আমরা।'

পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে তিন সর্দার। প্রত্যেকের চেহারা গম্ভীর। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে একে অপরের মতামত মেনে নিতে পারছে না।

'আপনারা যদি পুবে, পাকিস্তানে যেতেন, তা হলে ভাল হতো না?' নীরবতা ভাঙল রানা। 'ওখানে বিশ্রাম নিতে পারতেন কিছুদিন, নতুন করে অস্ত্র ও লোক সংগ্রহ করে ফিরে আসতে পারতেন।'

'সেটা হয় না, বিদেশি যোদ্ধা,' বলল আহম্মদ আলী।

'পাকিস্তানে যাওয়া মানে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া। আমরা কাপুরুষ নই। লড়ব আমরা।'

'তা হলে একসঙ্গে থেকে লড়াই করুন,' বলল রানা। 'তাতে সফলতার সম্ভাবনা অনেক বেশি।'

'মতের মিল হচ্ছে না আমাদের, কাজেই আলাদা হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই,' গম্ভীর গলায় বলল আহম্মদ আলী।

'আসলেই নেই,' সায় দিল ইউনূস মোসাদ্দেক।

মাথা দোলাল আলফাজ্ কুশে।

রানার কানের কাছে ঈসা আজনবী নিচু গলায় বলল, 'আমি বলেছিলাম না দেশটা অনেকগুলো গোত্রের দেশ? কেউ কারও কথা শুনবে না। সর্দাররা প্রত্যেকেই মনে করেন তাঁর পরিকল্পনাই সেরা, তাঁকেই সঠিক পথ দেখাচ্ছেন আল্লাহ্।'

মানতে পারল না রানা। 'কিন্তু গতকালকের আক্রমণই প্রমাণ করে দিয়েছে যে সবাই একসঙ্গে লড়লে ফলাফল অনেক ভাল হয়।'

'ঠিক,' সায় দিল ঈসা আজনবী। 'কিন্তু এটা আফগানদের নিয়ম নয়। হাজার বছর ধরে আফগানরা যা করে আসছে তাই করবেন সর্দাররা। নিজেদের আলাদা লড়াই নিজেরা লড়বেন।'

'আপনি কি করবেন ভাবছেন, বিদেশি যোদ্ধা?' জিজ্ঞেস করল ইউনূস মোসাদ্দেক।

'আমার বন্ধু সুস্থ হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'পথ চলার মতো সুস্থ হলে ওকে নিয়ে পাকিস্তানে চলে যাব।'

'এই জায়গাটা আমেরিকান বিধর্মীরা খুঁজে বের করে ফেলবে,' বলল আহম্মদ আলী। 'আপনি বরং আমার সঙ্গে আমাদের নতুন বসতিতে চলুন। যদিও এখনও জানি না ঠিক কোথায় ঘাঁটি গাড়ব আমরা।'

'আমার বন্ধুকে এখন নড়ানো যাবে না, সে-তুলনায় অনেক

বেশি দুর্বল ও,' বলল রানা। 'যদি তারপরও আমাকে রওনা হতে হয়, তা হলে আমি বরং পাকিস্তানের দিকেই যাবার চেষ্টা করব। সঙ্গে আসতে বলার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল আহম্মদ আলী। 'সত্যিকারের আফগান সর্দারের মতোই কথা বলেছেন আপনি। যা ভাল বোঝেন তাই করবেন।'

তারপরেও আলফাজ কুশে ও ইউনূস মোসাদ্দেক রানাকে তাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল।

বিনয়ের সঙ্গে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল রানা, বলল, 'আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের কখনও ভুলব না আমি। তবে আমাকে নিজের পথ বেছে নিতে হবে, যেমনটা নিতে হচ্ছে আপনাদেরও।'

নীরবতা নামল চারপাশে। তারপর আহম্মদ আলী মৃদু গলায় বলল, 'আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে থাকুন।'

রানার সঙ্গে হাত মেলাল তিন সর্দার, তারপর নিজেদের গোত্রের গেরিলাদের নিয়ে পাইন বনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। একটু পরেই রওনা হয়ে যাবে সবাই।

ঘাড় ফিরিয়ে সোহেল যে-গুহায় আছে, সেটার কালো গহ্বরের দিকে তাকাল রানা। ঈসা আজনবী বলল, 'এবার আমরা অপেক্ষা করব, সেই সঙ্গে প্রার্থনা করব, যাতে কোনও বিপদ না হয়।'

'আমরা?' ঈসা আজনবীর দিকে ফিরে তাকাল রানা। 'আপনি যাচ্ছেন না? আপনাকে থাকতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা তো নেই। যে-কোনও একটা গোত্রের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কমবে আপনার। আমি আপনাকে কাপুরুষ ভাবব না, বরং বুদ্ধিমান মানুষ বলেই মনে করব।'

মাথা নাড়ল ঈসা আজনবী। 'আপনার সঙ্গে এসেছিলাম, আপনার সঙ্গেই ফিরব। সেরকম কথাই আমি দিয়েছি জনাব আসাদ রেযাকে।'

'তবুও...'

ঈসা আজনবীর চেহারা অপমানে কালচে হয়ে যাচ্ছে দেখে থেমে গেল রানা।

'আপনাকে আমি বন্ধু হিসেবে নিয়েছি,' বলল দুঃসাহসী আফগান। 'থাকছি আমি। আমাকে ছাড়া পথ চিনে পাকিস্তানে ফিরতে পারবেন না আপনি।'

ঈসা আজনবীর চওড়া কাঁধে হাত রাখল রানা, আন্তরিক স্বরে বলল, 'আপনি চলে গেলে খারাপ লাগত আমার।' ঘুরে দাঁড়াল ও, গুহার দিকে পা বাড়াল। ওর পাশে চলল ঈসা।

আকাশে হালকা মেঘ করেছে বলে গুহার ভিতরে আঁধার একটা ভাব। কেরোসিনের লণ্ঠনটা জ্বালানো হয়েছে। তবে বরাবরের মতোই অতি সামান্য আলো ছড়াচ্ছে ওটা। আবছা আলোয় চোখ সইয়ে নিয়ে সোহেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। সোহেলের মার খাওয়া চেহারাটা দেখে দাঁতে দাঁত চেপে বসল ওর। আফসোস হলো, দুর্গের করিডরে সেলের জানালা দিয়ে গুলি করে ভেতরের লোকগুলোকে খুন করলেই বোধহয় ভাল হতো।

'কী অবস্থা ওর?' সোহেলের পাশে বসা ফারাকে জিজ্ঞেস করল ও।

সোহেলের জোব্বা কেটে নামিয়েছে ফারা রাইনার, ক্ষতটাতে ডিসইনফেকট্যান্ট লাগাচ্ছে। মুখ না তুলেই বলল, 'কাঁধ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। কোনও হাড় ভাঙেনি। আপাতত এটাই একমাত্র সুসংবাদ।'

অজান্তেই ঢোক গিলল রানা। 'আর খারাপ? খারাপ সংবাদটা কী?'

'এতো নির্যাতন করা হয়েছে যে প্রচুর রক্ত হারিয়েছে পেশেন্ট। ইন্টারনাল কোনও ড্যামেজ হয়েছে কি না জানি না। এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ফিরবে কি না তা-ও বলা মুশকিল।'

'তা হলে ওকে রক্ত দাও।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফারা রাইনার। 'থাকলে নিশ্চয়ই দিতাম।'

'আমার কাছ থেকে নিয়ে দাও।' ফারার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল মেয়েটা। 'আমার কাছে এমন কোনও ইকুইপমেন্ট নেই যে টেস্ট করে দেখব তোমাদের রক্তের গ্রুপ এক কি না।'

'আমি ও-নেগেটিভ,' বলল রানা। 'যে কোনও গ্রুপকে রক্ত দিতে পারি।'

'ঠিক জানো তো, ও-নেগেটিভ?'

'হ্যাঁ।'

গভীর মনোযোগে রানাকে দেখল ফারা রাইনার, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'সম্ভব না। তোমার নিজেরই অবস্থা খারাপ। ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমাওনি তুমি, শেষ কখন খেয়েছ জানি না। হাতের চেরা থেকে অনেক রক্ত হারিয়েছ। ট্র্যান্সফিউশন দেবার অবস্থায় নেই তুমি।'

কঠোরতার ছাপ পড়ল রানার চেহারায়। 'ব্লাড ট্র্যান্সফিউশনের ব্যবস্থা করো। হয় তুমি করবে, না হয় আমার নিজেকেই ব্যবস্থা করতে হবে।'

রানার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ফারা, তারপর বলল, 'আসলেই কাজটা করবে তুমি। কিন্তু রক্ত দিলে বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে।'

'হোক। রক্ত নাও।' তাগাদা দিল রানা। 'দেরি কোরো না।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ফারা রাইনার। 'শার্ট খুলে ফেলো। ভাল করে হাত ধোবে, তারপর বাম হাতে ডিসইনফেকট্যান্ট মাখবে। বিষাক্ত রক্ত দিয়ে রোগী মারতে চাই না আমি।' সোহেলের বাহুর ভিতরের অংশ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

বিনা প্রতিবাদে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল রানা।

'ওই পাশের টেবিলটার ওপর শোও,' আদেশের সুরে বলল

ফারা রাইনার। 'ওপরে থাকতে হবে তোমাকে। গ্র্যাভিটি ফিড ছাড়া এখানে ট্র্যান্সফিউশনের কোনও উপায় নেই।'

টেবিলের ওপর চিৎ হয়ে শুলো রানা।

প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে স্টেরিলাইয্ড্ সুই ও টিউব বের করল ফারা, সুইয়ের সঙ্গে টিউব জোড়া দিল, ক্ল্যাম্প আটকাল টিউবে, তারপর সুইটা ঢুকিয়ে দিল রানার বাহুতে, কনুইয়ের ভাঁজের শিরায়। অন্য সুইটা ঢোকাল এবার সোহেলের বাহুতে। ক্ল্যাম্পটা খুলল।

রানার শরীর থেকে রক্ত যেতে শুরু করল সোহেলের শরীরে।

থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকা ঈসা আজনবীর দিকে তাকাল ফারা। 'রানার জন্যে পানি নিয়ে আসুন। খাবারও আনবেন। শক্তি হারানো চলবে না ওর। আরেকজন গুরুতর অসুস্থ রোগী চাই না আমি।'

দ্রুত পায়ে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ঈসা আজনবী।

টেবিলের ওপর শুয়ে ঘাড় কাত করে ফারা রাইনারকে দেখছে রানা। 'বাঁচবে তো ও?' উৎকণ্ঠিত শোনাল ওর গলা।

'চুপ করে থাকো, কাজ করছি।' ধমক খেতে হলো ওকে।

সোহেলের কাঁধের ক্ষতটা আরেকবার পরিষ্কার করল ফারা, তারপর ড্রেসিং শেষে ব্যান্ডেজ বাঁধল। এবার একটা অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিল সে সোহেলকে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার আর করার কিছু নেই। যে-ইঞ্জেকশনটা দিলাম, ওটাই ছিল আমার কাছে থাকা শেষ ওষুধ। বাকিটা এখন নির্ভর করে তোমার বন্ধুর ওপর। ঈশ্বর যা করেন।' রানার দিকে তাকাল সে। 'এবার আইভিটা যদি না খুলে ফেলি তা হলে তোমাকেই রক্ত দিতে হবে।' ক্ল্যাম্প আটকাল ফারা, সুইটা বের করে নিল আস্তে করে। 'হাতটা ভাঁজ করো। কাঁধের দিকে নিয়ে চাপ দিয়ে রাখো।'

রানার বাহুর ক্ষতটা দ্রুত হাতে ড্রেসিং করে দিল সে এবার,

তারপর অজ্ঞান সোহেলের হাতটা ভাঁজ করল, বন্ধ করে দিল সুইয়ের ফুটো।

ঈসার বাড়িয়ে দেয়া ক্যান্টিন থেকে কয়েক ঢোক পানি গিলল রানা, তারপর একটা পিচ ও এক থালা ভাত খেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। পেটে খিদে, তারপরেও টের পেল, মাংসটা বাসি হয়ে গেছে।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে আসবার পর ওকে ফারা বলল, 'আমার একটা উপকার করবে?'

'নিশ্চয়ই,' চোখে প্রশ্ন নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল রানা।

'শুনে খুশি হলাম,' গম্ভীর চেহারায় রানাকে দেখল ফারা। 'তোমার দিকে তাকালে আমার বমি আসছে। ওই গ্রিজ আর ধুলো-বালিগুলো মুখ থেকে পরিষ্কার করে এসো।' একটা শার্ট বাড়িয়ে দিল সে রানার দিকে। 'এটাই আমার সংগ্রহের শেষ পরিষ্কার শার্ট। এটা নোংরা হলে আর কিছু করার নেই।'

মেয়েটার শুকনো কৌতুকবোধ রানার মন খানিকটা হলেও ভাল করে দিল। মৃদু হাসল ও।

'আমার বোধহয় দেশে ফেরার সময় হয়ে গেছে,' উদাস গলায় বলল ফারা রাইনার। 'অনেকদিন হলো এখানে আছি।'

গেরিলারা গুহায় এসে ঢুকল, রোগীদের দাঁড়াতে সাহায্য করছে তারা।

'সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা,' বলল ফারা। 'যারা নড়াচড়া করলে মরবে, তাদেরও।'

'কেন?' জিজ্ঞেস না করে পারল না রানা। 'আমেরিকানরা যদি এখানে আসেও, অসুস্থ একদল রোগীকে নিশ্চয়ই খুন করবে না?'

'হয়তো করবে,' শান্ত গলায় বলল ফারা। 'সর্দাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওদের সরিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের ধারণা, সরিয়ে নিলে বাঁচলেও বাঁচতে পারে ওরা, কিন্তু এখানে থাকলে ওদের মরতেই হবে।'

'তোমার নিজের কী ধারণা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফারা। 'সত্যি কি ঘটবে? জানি না। এখানে আসার পর থেকে এতো মৃত্যু আমাকে দেখতে হয়েছে যে, কে কী করবে তা নিশ্চিত ভাবে বলার মতো দৃঢ় মানসিকতা হারিয়েছি।' একটা সিগারেট দিল সে রানাকে, নিজেও একটা ধরাল। রানা খেয়াল করল, মৃদু মৃদু কাঁপছে মেয়েটার হাত। প্রসঙ্গ পাল্টাল ফারা। 'মাথা ঘুরছে তোমার?'

'না,' মিথ্যে বলল রানা। সোহেলের দিকে তাকাল। সোহেলের বিবর্ণ, ফ্যাকাসে মুখটা যেন মোম দিয়ে তৈরি। খুঁবই আস্তে ওঠা-নামা করছে ওর বুক। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'ও কি বাঁচবে?'

জবাব দিল না ফারা রাইনার।

'আমাকে সত্যি করে বলো ওর বাঁচার সম্ভাবনা...'

বাইরে থেকে উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত গলার আওয়াজ রানাকে থামিয়ে দিল। একসঙ্গে দ্রুত কথা বলছে কয়েকজন।

গুহা থেকে বেরিয়ে এলো রানা কথা শেষ না করেই, আন্দাজ করতে পারছে কী ঘটেছে।

গেরিলারা তাদের ঘোড়াগুলোর দিকে ছুটছে। শেষমুহূর্তে কিছু ফেলে যাচ্ছে কি না দেখছে মহিলারা। বাচ্চারা ছাগল ও ভেড়ার পাল জঙ্গলের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে কথা বলছে সবাই।

ডানদিকে, একটা উঁচু ঢালে ঘন হয়ে জন্মেছে পাইন গাছ। ওখান থেকে টিলাসারি ও উপত্যকার দিকে নজর রাখছে আট-দশজন গেরিলা। চারপাশে নানান শব্দ, তারপরও যে-আওয়াজটা সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, সেটা শুনতে কোনও অসুবিধে হলো না রানার। অনেক দূর থেকে আসছে আওয়াজটা, কিন্তু চিনতে ভুল হয় না। ঢালের ওপর উঠে দূরের টিলাগুলোর দিকে তাকাল রানা। অনেকটা ঢাকের গর্জনের মতো শোনাচ্ছে অগ্রসরমান শব্দ।

ধিক্‌ধিক্‌ধিক্‌ধিক্‌ ধিক্‌ধিক্‌ধিক্‌ধিক্‌।

আসছে কয়েক রকমের আমেরিকান হেলিকপ্টার গানশিপ। একসঙ্গে এতগুলোকে আগে কখনও দেখেনি রানা। গুনতে শুরু করল ও।

দশ ...পনেরো ...বিশ। ক্ষান্ত দিল গোনায়।

প্রকাণ্ড একটা ভি আকৃতি তৈরি করে টিলাগুলোর দিকে ছুটে আসছে দানবগুলো, তারপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ডান ও বাম দিকে।

পাহাড়-টিলার প্রতিটা খাঁজ-ভাঁজ, খাদ, ফাঁকা জায়গা, জঙ্গল – সবকিছু কাভার করবে ওগুলো। নিয়ম ধরে আগু-পিছু করে নির্দিষ্ট একটা এলাকায় সার্চ চালাবে প্রতিটা গানশিপ, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসবে টিলার ওপর দিয়ে। যদি কোনকিছু দেখে সন্দেহ জাগে তা হলে দ্বিতীয়বার জায়গাটা সার্চ করবে। যদি কিছু নড়তে দেখে তো রকেট ছুঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে সেটা।

একটা গানশিপের নাকের কাছে সাদা ঝিলিক দেখতে পেল রানা, তার পরপরই শুনতে পেল মেশিনগানের কর্কশ ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট আওয়াজ। দূরের একটা গাছে ছাওয়া ঢাল থেকে ধুলো উড়তে শুরু করল।

দৌড়ে উঁচু ঢাল থেকে নেমে পরিত্যক্ত বসতির দিকে ছুটল রানা। গেরিলাদের মাত্র কয়েকজন এখনও রয়ে গেছে ফাঁকা জায়গায়। ইউনূস মোসাদ্দেক ও আলফাজ কুশের গোত্র ভিন্ন দিকে রওনা হলো। আহম্মদ আলী তার গোত্রের পুরুষদের শেষবারের মতো জরুরি কিছু নির্দেশ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল। রানাকে দেখতে পেল সে, গুহার দিক দেখিয়ে চিৎকার করে বলল, 'সবকিছু লক্ষ্য করে গুলি করছে ওরা। গুহা দেখলে সন্দেহ করবে, আর সন্দেহ করলেই মিসাইল ছুঁড়বে। যদি থাকেন তো মারা পড়বেন নির্ঘাত। আমার সঙ্গে আসুন, ভাই!'

উপত্যকায় কয়েকটা মেশিনগান একটানা গর্জাচ্ছে। দূরে

একটা রকেট বিস্ফোরিত হলো।

'সম্ভব নয়,' পাল্টা চিৎকার করল রানা।

উত্তেজনায় রানার প্রতি ভদ্রতা দেখাতে ভুলে গেল আহম্মদ আলী, দ্রুত নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কী যেন বলতে শুরু করল।

রানার পাশ থেকে অনুবাদ করল ঈসা আজনবী। 'উনি বলছেন কপ্টারগুলো পশ্চিম থেকে আসছে। উনি এখন আর পশ্চিমে যেতে পারবেন না। পুবে যাবেন উনি, পাকিস্তানের দিকে। আপনাকে সঙ্গে যেতে বলছেন। আপনার নিরাপত্তার দিকে সাধ্যমতো খেয়াল রাখবেন উনি।'

'আমার বন্ধুকে ফেলে যেতে পারব না আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

ঈসা আজনবী কথাটা চিৎকার করে আহম্মদ আলীকে জানাল, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি বলছেন বন্ধুকে আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

আহত রোগীদের দিকে একবার তাকাল রানা। গেরিলারা বয়ে নিয়ে আসছে তাদের কয়েকজনকে, তুলে দিচ্ছে ঘোড়ার পিঠে। কেউ কেউ নিজেই জিনের ওপর বসে থাকতে পারছে, তবে এমনও রোগী আছে, যাদের জিনের ওপর বসিয়ে পিছন থেকে শক্ত করে ধরে রাখতে হচ্ছে।

ঠিক ওভাবেই দুর্গ থেকে ফেরবার পথে সোহেলকে ধরে রেখেছিল ও। রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলেই হয়তো জ্ঞান হারিয়েছিল সোহেল, এখনও জ্ঞান ফিরে পায়নি। হাঁটছিল ঘোড়াটা, তারপরও ঝাঁকি খেয়ে ক্ষত খুলে গিয়েছিল, নতুন করে রক্ত পড়ছিল। আবার যদি ওকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যেতে হয়, তা হলে ক্ষতের মুখটা খুলে যাবে, দ্রুত চিন্তা করছে রানা, রক্তক্ষরণে মারাই যাবে সোহেল।

'আমার বন্ধুকে ঘোড়ায় করে নেয়া যাবে না,' সে-কথাই সংক্ষেপে বলল ও। 'অনেক বেশি অসুস্থ ও।'

দূরে আছে এখনও গানশিপগুলো। তবে ইঞ্জিনের আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। এখনও একটানা গুলি-বর্ষণ করছে মেশিনগান। আরেকটা রকেট বিস্ফোরিত হলো।

'তারপরেও,' বলল আহম্মদ আলী। 'আপনাদের না নিয়ে গেলে নিজের মনকে কী বুঝ দেব আমি? বন্ধুকে ফেলে...'

'আমি যদি আমার বন্ধুকে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে যাই, তা হলে পিছিয়ে পড়তে হবে আপনাদের,' আন্তরিকতার সঙ্গে বলল রানা, তবে ওর গলায় দৃঢ়তাও থাকল। 'না পারবেন আমাদের ফেলে যেতে, না পারবেন দ্রুত এগোতে। আমার আর আমার বন্ধুর কারণে অযথা মরতে হবে আপনাদের। আমি সেটা হতে দিতে পারি না। বন্ধু হিসেবেই আ' নাকে অনুরোধ করছি, রওনা হয়ে যান। অনেকে আপনার ওপর নির্ভর করছে, ভরসা করছে। আর দেরি করবেন না।'

সর্দার আহম্মদ আলীর চোখে রাগ-ক্ষোভ-দ্বিধার ছায়া দেখল রানা। তর্ক করতেই বোধহয় হাঁ করল সে। ঠিক তখনই পাইন বনের ওপাশে বিস্ফোরিত হলো একটা রকেট। চট্ করে নিজের গোত্রের মহিলা ও বাচ্চাদের দিকে একবার তাকাল আহম্মদ আলী, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'বিদায়, বিদেশি বন্ধু!' ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল সে, টিলার ডানদিক ধরে এগোল।

ইউনূস মোসাদ্দেকের গোত্র বেশ কিছুক্ষণ আগে ওদিকেই গেছে, দক্ষিণে যাবে সে। একই পথে চলেছে এখন আহম্মদ আলীও, তবে প্রথম সুযোগেই ইউনূস মোসাদ্দেকের ফেলে যাওয়া পথ থেকে সরে যাবে সে, দলের সবাইকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করবে, দূরে চলে যাবে এই বসতি এবং অগ্রসরমান গানশিপগুলোর কাছ থেকে। পশ্চিমে আর যাচ্ছে না সে, পুবে রওনা হবে, পাকিস্তানের দিকে। টিলার বামদিক দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে আলফাজ কুশের গোত্র, উত্তরে যাচ্ছে সে

গোত্রের শিশু-কিশোর ও মহিলাদের নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দেবার আশায়।

খোলা জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে। চারপাশে কেউ নেই, কোনও ব্যস্ততা নেই। রানার মনে হলো কয়েক ঘণ্টা গল্প-গুজবের পর ওর বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে বন্ধু-বান্ধব, কেমন যেন একা লাগল, বুকের ভিতরটা ফাঁকা ঠেকল ওর। দূর থেকে ভেসে আসছে গুলির আওয়াজ। একের পর এক কামানের গোলা দাগছে হেলিকপ্টার গানশিপ; ভোঁতা, ভারী শোনাচ্ছে আওয়াজগুলো।

গুহার মুখে ফারাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। দ্রুত পায়ে মেয়েটার সামনে চলে গেল ও, স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এখানে থেকো না, রওনা হয়ে যাও। আমার ঘোড়াটা নাও। এখনও আহম্মদ আলী বেশিদূরে চলে যায়নি, ওদের সঙ্গে গেলে বিপদের ঝুঁকি কমবে।'

'রোগীকে ফেলে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' রানার চোখে তাকাল ফারা রাইনার। 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি ডাক্তার।'

'অনেক করেছ তুমি,' বলল রানা। 'প্যারামেডিক ট্রেইনিং আছে আমার, সোহেলের দেখাশোনা আমিই করতে পারব।'

ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল ফারা রাইনার। 'আর তুমিই যদি আহত হও? কে তোমার দেখভাল করবে তখন? লড়াই করতে হলে? তখন বন্ধুকে দেখবে কে? আমি থাকছি।'

'কিন্তু...'

'অসুস্থ পেশেন্ট ফেলে কোথাও যাব না, ব্যস।' বেগুনী চোখে রাগ নিয়ে রানাকে দেখল ফারা রাইনার। গলাটা তীক্ষ্ণ শোনাল: 'ভয় পেয়ে ভিতুর মতো আফগানিস্তান ছেড়ে দেশে ফেরার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।'

বাতাসে অদ্ভুত একটা কাঁপন অনুভব করা যাচ্ছে। কাছে চলে

আসছে গানশিপগুলো। টিলাগুলোর ওপর কামান দাগছে ওগুলোর গানার।

'আহম্মদ আলী ঠিকই বলেছিলেন, কোনকিছু দেখে সন্দেহ হলেই গোলা ছুঁড়ছে ওরা,' বলল ঈসা আজনবী।

ফাঁকা প্রান্তরে চোখ বোলাল রানা। মানুষ বসবাসের কারণে বহু জায়গায় চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ঘাস, মরে হলুদ হয়ে গেছে। মাটি-পাথর ফেলে সমস্ত চুলো ঢেকে দিয়ে গেছে গেরিলারা, তারপরও স্তূপগুলো ঠিক স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না।

'আরেকটা ব্যাপারে ঠিক বলেছেন আহম্মদ আলী,' বলল গম্ভীর রানা, 'আমেরিকান পাইলটরা যখন গুহাটা দেখবে তখন ভাববে ভেতরে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। গুহার মুখে মিসাইল ছুঁড়বেই তারা।'

'তা হলে কী করব আমরা?' অস্থির দেখাল ঈসা আজনবীকে। 'জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে থাকব? আমরা মাত্র কয়েকজন, ওরা হয়তো আমাদের দেখতে পাবে না।'

'খাবার ফুরিয়ে যাবে আমাদের, কাজেই একসময় না একসময় কোনও না কোনও দিকে রওনা হতেই হবে,' বলল রানা। 'ওই গানশিপগুলো দেখে মনে হচ্ছে ফুলস্কেল অপারেশনে নেমেছে ইউএস আর্মি। তার মানে সৈন্যরা শীঘ্রি এদিকে খুঁজতে আসবে।'

'আপনি আমেরিকানদের যেরকম খেপিয়ে দিয়েছেন তেমনটা খেপতে ওদের আগে কখনও দেখিনি আমি,' মন্তব্য বলল ঈসা।

'সরে যেতে হবে আমাদের,' মৃদু গলায় বলল রানা, কী যেন ভাবছে।

ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ঈসা আজনবী, তারপর বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনি সর্দার আহম্মদ আলীকে বলেছেন আপনাকে ছাড়াই যেন তিনি রওনা হয়ে যান!'

'বলেছি আমার বন্ধুর কারণে,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা, শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চাইল হয়তো। 'ঘোড়ায় ওঠালে রক্তক্ষরণে মারা যেত ও। আমাদের জন্যে দেরি করলে হয়তো মারা পড়ত আহম্মদ আলীর গোত্রের অনেকে। একই কারণে আমি ফারাকে চলে যেতে বলেছিলাম। এখনও বলছি। সেই একই কারণে আপনাকেও আবার বলছি, ঈসা, এখনও চলে যাবার সুযোগ আছে আপনার। আহম্মদ আলীর দল বেশি দূরে চলে যায়নি। ওদেরকে ধরতে বেশি সময় লাগবে না আপনাদের দু'জনের।'

'আপনাকে ফেলে চলে যাব?' আহত স্বরে বলল ঈসা আজনবী। জোরে জোরে মাথা নাড়ল। 'আবার যদি এ-কথা বলেন, তা হলে মনে করব আমাকে আপনি বিনা কারণে অপমান করছেন।'

ফারা রাইনার জিজ্ঞেস করল, 'ধরো আমরা চলে গেলাম, রানা, তারপর কী করবে তুমি? তোমার বন্ধুকে এখান থেকে সরাবে কী করে?'

'উপায় একটা আছে, তবে এখন ব্যাখ্যা করার সময় নেই,' কমান্ডো নাইফটা বের করে পাইন বনের দিকে পা বাড়াল রানা। ওখানে ওদের জন্য ঘোড়া রেখে গেছে গেরিলারা।

'যাচ্ছি না আমরা,' দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করল ফারা রাইনার।

'তা হলে তোমরা দু'জন সোহেলকে গুহা থেকে বের করে আনো।' চলার উপরেই ঘাড় ফেরাল রানা। 'ঈসা, পরে বলতে পারবেন না যে আপনাদের আমি সতর্ক করিনি। কাজটা সেরেই ঝটপট আমার কাছে চলে আসুন। আপনাকে দরকার হবে আমার।'

ইঞ্জিনের জোরাল আওয়াজের সঙ্গে কাছে চলে আসছে রকেট বিস্ফোরণের বিকট শব্দ। মেশিনগানের একটানা গর্জন এখন অনেক স্পষ্ট।

এদিকেই আসছে হেলিকপ্টার গানশিপগুলো।

বারো

একদিকে আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার, আরেকদিকে পাথরের পুরু দেয়াল, মাঝখানের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল হেনরি মর্গান। আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারের নিরাপত্তা থেকে বের হতে অনিচ্ছু ছিল সে, কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়ায় ব্যাটারি খরচ না করে ভেন্টিলেশনের আর কোনও উপায় নেই। ভিতরের বাতাসে একটু পরেই অক্সিজেনের অভাবটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। তা ছাড়া, রোদের তাপে ক্রু কম্পার্টমেন্টটা স্রেফ দোজখে পরিণত হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই কর্নেল মর্গানকে নিরাপত্তার ওপরে আরামকে স্থান দিতে হয়েছে। তবে ভাল মতো বুঝে নিয়েছে সে, খুব একটা ঝুঁকি নিচ্ছে না। ক্যারিয়ার ও দেয়ালের মাঝখানে কোনও স্নাইপার তাকে লক্ষ্য করে গুলি করতে পারবে না। তা না পারুক, আগে কখনও লড়াইয়ের এতো কাছাকাছি আসেনি সে। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তার। দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

তবে চেহারায় মনোভাবের কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই তার। থাকতেই পারে না। ওই কাপুরুষ মেজর ডুরেল একটু দূরেই ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে। নির্দেশের অপেক্ষায় সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম অ্যাটেনশন হয়ে নীরবে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। কমান্ডিং অফিসারকে তো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেই হয়, কাজেই সমস্ত ভয় অত্যন্ত সচেতন ভাবে চেহারা থেকে লুকিয়ে রেখেছে কর্নেল মর্গান।

ব্যাপারটা সহজ নয়, ভাবল সে। আত্মবিশ্বাসী একটা ভাব ধরে রাখতে হচ্ছে তাকে সর্বক্ষণ। সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে আছে সেরকম একটা ভঙ্গি নিতে হচ্ছে। ঝুঁকিটাও হেলা করবার মতো নয়। তবুও, আফগানিস্তান নামের এই দোজখ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য এটুকু তাকে মেনে নিতেই হবে।

ঝড়ের আড়াল নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে একটা গিরিপথ ধরে পুবের পাহাড়গুলোর দক্ষিণ দিকের এই উপত্যকায় পৌঁছেছে তারা। দুপুরের আগেই থেমে গেছে ঝড়ো বাতাস। ধুলো-বালি থিতিয়ে গেছে। বাতাস পরিষ্কার। আকাশছোঁয়া তুষারধবল চুড়োগুলো সোনালী রোদ গায়ে মেখে ঝিকমিক করছে।

দুপুরের দিকে আক্রমণ শুরু করেছে গানশিপগুলো। নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে মৃদু হাসল কর্নেল হেনরি মর্গান। দূর থেকে ভেসে আসছে ওগুলোর ইঞ্জিনের অস্পষ্ট শব্দ। মেশিনগানের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আগুনে চড়চড় করে কাঠ পুড়ছে। গেরিলারা এতো বড় আক্রমণের মুখে নিশ্চয়ই দিশে হারিয়ে ফেলেছে। কী করবার আছে তাদের? আসলে কিচ্ছু করবার নেই। ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে নিরাপদ কোনও জায়গায় পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে লোকগুলো বড়জোর।

হাসিটা আরও চওড়া হলো কর্নেলের। গেরিলারা যদি এদিকে আসে তা হলে টিলা থেকে যেসব ওয়াচাররা নজর রাখছে তারা সহজেই দেখতে পাবে, যোগাযোগ করবে তার সঙ্গে। গানশিপগুলোকে সে নির্দেশ দেবে গেরিলাদের তাড়িয়ে এই উপত্যকার দিকে নিয়ে আসতে। কুকুরগুলো যখন উপত্যকা পার হতে চেষ্টা করবে, তখন লুকানো এই আর্মার্ড কলাম ছিন্নভিন্ন করে দেবে ওদেরকে। কাউকে বন্দি করবার দরকার নেই। সব ক'জন সন্ত্রাসীকে মরতে হবে।

আর গেরিলারা যদি উল্টোদিকে, অর্থাৎ উত্তরে পালাতে চেষ্টা করে, তা হলে ওদিকে লুকিয়ে থাকা দ্বিতীয় আর্মার্ড কলামের

সামনে পড়বে তারা। উত্তরের টিলাগুলো থেকেও নজর রাখছে সার্ভেইলান্স টিম। একই ব্যাপার ঘটবে ওখানেও, গানশিপের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে দ্বিতীয় কলামের আক্রমণে খতম হয়ে যাবে হারামজাদারা।

তবে আমার কলামটা গেরিলাদের খতম করলেই ভাল হয়, ভাবল হেনরি মর্গান। অবশ্য, সবাই জানবে প্ল্যানটা আমার, এবং সে-কারণে সুপিরিয়র অফিসাররা আমাকেই প্রশংসা করবে, যুদ্ধের সম্মান যে-কলামই পাক।

চকিতে তার মাথায় খেলে গেল, সম্মানটা তার আর্মার্ড কলাম না পেলেই ভাল হয়। এমনিতেই ই কলামটাকে নেতৃত্ব দিয়ে এখানে এনেছে সে, লড়াই হলে তাকেই আগে থাকতে হবে। অন্তত কাছাকাছি তো থাকতেই হবে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতাটা লাভের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার।

দক্ষিণ, না উত্তর? কোনদিকে যাবে গেরিলারা? নিশ্চিত হবার উপায় নেই।

বিকল্প কোনও পথ কি আছে শয়তানগুলোর সামনে? পশ্চিমে যেতে পারবে না, ওদিক থেকেই আসছে গানশিপগুলো। তা হলে একটা দিকই বাকি থাকে। পুব। ওদিকে পাকিস্তান। কিন্তু এদিকের বিদ্রোহীরা এখন পর্যন্ত ঘাড়-ত্যাড়ামি ছাড়েনি, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, সুযোগ যখন ছিল তখনও পাকিস্তানে পালিয়ে যায়নি। তাদের কাছে পাকিস্তানে যাওয়া মানে পালানো। গেরিলারা বরং মরবে, তবু পালাবে না।

তারপরও, অচিন্ত্যনীয় কাজটাই করে বসতে পারে তারা। যদি পুবে পাকিস্তানের দিকে যায়, তা হলে ফাঁদটা পাতা কঠিন হবে। ওদিকের উপত্যকাগুলো পুব-পশ্চিমমুখী। ওসব উপত্যকায় উত্তরে ও দক্ষিণের আর্মার্ড কলামগুলোর যাওয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে পর্বতমালা। গেরিলারা ভাববে সহজেই উপত্যকা ধরে এগিয়ে যেতে পারবে তারা নিরাপদে।

না। প্রকাণ্ড ডাবল রোটর হেভি হেলিকপ্টার গানশিপগুলো তা হতে দেবে না। ইউএস আর্মির এপিসিগুলোর কোনওটারই ওজন দশ টনের বেশি নয়। ওগুলোকে বয়ে নিয়ে পাহাড় পার করে দিতে পারবে ডাবল রোটর গানশিপ। আর্মার্ড কলাম পুবদিকে যাবার পথগুলো কাভার করতে পারবে সহজেই। সত্যিই যদি আফগানরা অপ্রত্যাশিত ভাবে পাকিস্তানের দিকে পালিয়ে যেতে চায়, তা হলেও রেহাই নেই তাদের।

পালানো... চট করে মেজর ডুরেলের দিকে তাকাল কর্নেল মর্গান। সন্দেহ নেই, সুযোগ পেলে পালাত কাপুরুষটা। মেজর ডুরেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'কী ব্যাপার, মেজর, এতো গম্ভীর কেন? শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে আর বেশি দেরি নেই, জানেন নিশ্চয়ই?'

কর্নেলের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল মেজর ডুরেল। 'শত্রু, সার? কাদের...'

কথা শেষ করতে দিল না কর্নেল, 'আমাদের মাতৃভূমির শত্রু অবশ্যই।'

'কিন্তু আফগানিস্তান তো আমেরিকা আক্রমণ করেনি, সার!'

'অবশ্যই না। বর্বরগুলো আমেরিকাকে আক্রমণ করবে কী! ভুলে গেলেন নাকি, আমরা দুনিয়ার একমাত্র পরাশক্তি?'

দীর্ঘশ্বাস চাপল মেজর ডুরেল। 'বলতে পারেন, কর্নেল, আমরা তা হলে এখানে কেন এসেছি?'

'ভাল করেই জানেন, কেন,' কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল। 'আফগানিস্তান দেশটা ইরানের পাশেই। তেলের সাগরে ভাসছে গোটা আফগানিস্তান। ওই তেল আমাদের মাতৃভূমির দরকার।'

'সে-কারণেই নির্বিচারে মানুষ খুন করব আমরা?'

'দু'-দশ হাজার বা দু'-চার লাখ পিঁপড়ের জীবনের কী মূল্য, মেজর?'

'ঠিক, যদি তারা আফগান পিঁপড়ে হয়,' শুকনো শোনাল

মেজর ডুরেলের গলা।

কড়া চোখে মেজরকে দেখল কর্নেল মর্গান। 'মেজর, আপনি ইউএস আর্মির কমিশন্ড অফিসার, কোনও মানবতাবাদী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নন, কথাটা ভুলে যাবেন না।' সার্জেন্ট ট্রিসট্রিমের দিকে তাকাল সে। চুপচাপ দুই অফিসারের কথা শুনছে সার্জেন্ট নির্বিকার চেহারায়। হেনরি মর্গান বলল, 'শীঘ্রি হানাদারদের খতম করার সুযোগ পাবে তুমি, সার্জেন্ট ট্রিসট্রিম।'

ঠোঁট টিপে হাসল সার্জেন্ট। 'ইয়েস, সার!'

কাছেই গলার আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল কর্নেল মর্গান। একটা ট্যাঙ্কের হ্যাচের গর্ত থেকে মাথা তুলেছে একজন কমিউনিকেশন অফিসার। 'কর্নেল, দ্য গানশিপ্‌স্ রিকোয়েস্ট পারমিশন টু কমেন্স রিলে প্রোসিডিউর্‌স্।'

'পারমিশন গ্র্যান্টেড।'

কর্নেল মর্গানের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হতে হলে গানশিপগুলোকে বিরতিহীন ভাবে সার্চ করতে হবে, যতক্ষণ না তাদের ফিউয়েল ফুরিয়ে যায়। সার্চে যাতে কোনও বাধা না পড়ে সেজন্য মর্গান ঠিক করেছে, গানশিপগুলোর তিনভাগের একভাগ তেল নিতে দুর্গে ফিরে যাবে, সেই সঙ্গে নতুন করে অস্ত্রে সজ্জিত হবে। আবার যখন ওগুলো হামলায় অংশ নেবে, আরও তিনভাগের একভাগ ফিরে যাবে দুর্গে। এভাবেই চলতে থাকবে পরবর্তী নির্দেশ দেবার আগে পর্যন্ত। এর ফলে নিশ্চিত হওয়া যাবে, গানশিপগুলোর বেশিরভাগই সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় অপারেশনে উপস্থিত থাকছে।

সবদিকই চিন্তা করে দেখেছি আমি, সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল কর্নেল মর্গান। শত্রুদের ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

তেরো

ঈসা আজনবী ফিরে এসে দেখল কমান্ডো নাইফ দিয়ে দু' ইঞ্চি ব্যাসের একটা চারা-গাছ গোড়া থেকে কাটছে রানা। আরও তিন-চারবার কোপ দিতেই কেটে গেল গাছ। ওটা ঈসার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'আপনার ছুরি দিয়ে ডালপালাগুলো ছেঁটে ফেলুন। ডগাও কাটবেন। তবে বারো ফুটের চেয়ে লম্বায় যেন কম না হয় খুঁটি।'

আবার খুঁজতে শুরু করল রানা। আরেকটা দু' ইঞ্চি ব্যাসের গাছ পেয়ে কাটতে শুরু করল। কাজটা শেষে বলল, 'এটা নিন। দুটো খুঁটি যেন সমান হয় সেটা দেখবেন।' এবার ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল এক ইঞ্চি গোলাকার ডাল কাটতে। ওগুলো থেকে বেরোনো শাখা ডাল কেটে ফেলছে ও, লাঠিগুলোকে চার ফুট লম্বা করে কাটছে। ওরকম দশটা ডাল হয়ে যেতেই ঈসার পাশে চলে এলো রানা।

ও কী চায় তা বুঝতে পেরেছে ঈসা আজনবী, পৌনে চারফুট দূরত্বে বারো ফুটি ডাল দুটো পাশাপাশি রাখল সে, সেগুলোর ওপর চারফুটি ডালগুলো আড়াআড়ি ভাবে রাখতে আরম্ভ করল।

লম্বা একটা দড়ি দু'ফুট পরপর কাটল রানা, বিশটা টুকরো হয়ে যেতেই আড়াআড়ি রাখা ডালগুলো লম্বা ডাল দুটোর সঙ্গে শক্ত করে বাঁধতে শুরু করল। ওকে সাহায্য করল ঈসা।

'আট ইঞ্চির বেশি দূরে যেন না থাকে মাঝখানের ডালগুলো,' কাজ থেকে মুখ না তুলেই বলল রানা। 'ঠিক আপনার ছুরির

ফলার সমান দূরত্বে রাখুন, তা হলে অন্তত ছ'ফুট লম্বা একটা স্ট্রেচার পাবো। একদিকে চার ফুট খুঁটি বাদ রাখবেন, অন্যদিকে দু' ফুট।'

চুপচাপ দ্রুত হাতে কাজ করছে ঈসা আজনবী, কোনও প্রশ্ন করল না।

প্রত্যেকটা ডালে চাপ দিয়ে পরখ করে দেখল রানা, দরদর করে ঘামছে। ভাঙল না বা বেঁকে গেল না একটা ডালও। এবার ঘন পাতাওয়ালা সিডার গাছের অনেকগুলো সরু ডাল কেটে এনে রাখল ও স্ট্রেচারের ওপর।

আরও কাছে চলে এসেছে গানশিপগুলোর ইঞ্জিনের গুঞ্জন।

'স্ট্রেচারটা এতো লম্বা না হলেই ভাল,' বলল ঈসা। 'কেটে ছোট করে ফেলি আসুন। স্ট্রেচার লম্বায় ছোট হলেও জনাব সোহেলকে বয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না আমাদের দু'জনের।'

'আমরা যদি স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যাই তা হলে তাড়াতাড়ি যেতে পারব না,' বলল রানা। 'আমি...'

'তা হলে?' ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল ঈসা আজনবী। 'আর কী উপায়ে...'

জবাব দিল না রানা, 'আপনি স্ট্রেচার নিয়ে গুহার কাছে যান, গুহা থেকে যতটা পারেন খড় বের করবেন,' বলে ঘোড়াটার কাছে চলে গেল, ওটার বাঁধন খুলে ঈসারটা সহ বের করে আনল ফাঁকা জায়গায়।

ঈসা আজনবী গুহার কাছে চলে গেছে। পিছু নিল ও, গুহার কাছে এসে ঘোড়া দুটো দাঁড় করাল। নিজেরটার মোটা চামড়ার তৈরি জিনের দু'পাশে ছোরা দিয়ে দুটো জায়গা চিরল ও। স্ট্রেচারের একদিকের বাড়তি চার ফুটী দণ্ড দুটোর মাথা ঢুকিয়ে দিল চেরা দুটো গর্তের ভিতর। পরখ করে দেখল খুলে যাবে কি না, তারপর খুলে যাবে না নিশ্চিত হয়ে এবার জিনের ওপর দিয়ে

দণ্ড দুটো শক্ত করে বাঁধল।

স্ট্রেচারের দু' ফুটী দণ্ড দুটো এখন মাটিতে ঠেকে আছে। 'খড় বিছান,' ঈসাকে বলল রানা। 'খড় বিছানো শেষে সোহেলকে স্ট্রেচারে শুইয়ে দেব আমরা।'

গানশিপগুলো টিলার ওপর দিয়ে সার্চ করতে করতে অনেক কাছে চলে এসেছে। মেশিনগানের অবিরাম গুলি-বর্ষণের আওয়াজ বুকের ভিতর কাঁপ ধরিয়ে দেয়।

ঈসা আজনবীর খড় বিছানো শেষ। স্ট্রেচারে শুলে এখন ডালের খোঁচা লাগবে না। সিদ্ধান্ত পাল্টে রানা নির্দেশ দিল, 'আপনি বরং ঢালের ওপর উঠে দেখুন মেশিনগানের ফ্ল্যাশ আর গুলির শব্দে কয় সেকেন্ড তফাৎ। দেখে এসে জলদি আমাকে জানান।'

ছুটল ঈসা ঢাল লক্ষ্য করে। শীঘ্রি জানা যাবে সত্যি আর কতটা দূরে আছে মারণাস্ত্রগুলো।

গুহা-মুখের কাছে চলে এলো রানা, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ফারাকে জিজ্ঞেস করল, 'ও কি রওনা হবার জন্যে তৈরি?'

'রক্ত পড়ছে না আর,' জানাল ফারা রাইনার। 'হার্টবিট দুর্বল, তবে নিয়মিত। প্রেশার অবশ্য লো। তবে অবস্থা এর চেয়ে অনেক খারাপও হতে পারত।'

গুহার ভিতর থেকে ন্যাপস্যাকটা কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরে এল রানা, ফারাকে বলল, 'ওর পা দুটো ধরে তোলো, আমি ওর কাঁধ ধরছি।' সাবধানে ক্ষত এড়িয়ে সোহেলের কাঁধের তলায় দু'হাত রাখল ও, ফারা ইশারা করতেই আস্তে করে তুলল সোহেলের দেহের ঊর্ধ্বাংশ।

দু'জন ওরা স্ট্রেচারে খড়ের বিছানায় শুইয়ে দিল অচেতন সোহেলকে। মাঝখানের ডালগুলো সামান্য বেঁকে গেল, তবে ভাঙবে না।

গুঙিয়ে উঠল সোহেল। চোখের পাতা কেঁপে উঠল ওর,

তারপর চোখ মেলল। দুর্বল স্বরে ডাকল, 'রানা!' কিছু দেখছে বলে মনে হলো না।

'তোর পাশেই আছি, দোস্ত,' বলল রানা। দড়ি দিয়ে বুকের কাছে স্ট্রেচারের সঙ্গে শক্ত করে সোহেলকে বাঁধল ও, রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চারটা স্ট্রেচারের এক পাশে শুইয়ে রাখল।

'সোহানা খুব কেঁদেছে,' ফিসফিস করল সোহেল। 'বিয়ে কর্ ওকে, রানা।'

'করব, করব – তুই বিশ্রাম নে,' পিছনে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল রানা।

দৌড়ে এসে ওর সামনে থামল ঈসা আজনবী, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আগুনের ঝিলিকের পাঁচ সেকেন্ড পর গুলির আওয়াজ পেলাম।'

'এক সেকেন্ডে এক মাইল যায় শব্দ, তার মানে গানশিপগুলো আর মাত্র পাঁচ মাইল দূরে আছে,' ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। 'ভাল মতো সার্চ করতে গিয়ে আগুপিছু করতে হবে ওদের, তারপরও... আস্তে আস্তে ওপরে উঠবে ওরা...' টিলায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে থেমে গেল ও, হাঁটু মুড়ে বসে স্ট্রেচারের এদিকের প্রান্ত আস্তে করে তুলে নিল কাঁধে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। কাঁধের ওজন বইতে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল ওর হাঁটু জোড়া। ঘাড়ের পেশীগুলো আড়ষ্ট ঠেকল।

'ঈসা, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে আগে বাড়ুন,' চাপা গলায় নির্দেশ দিল রানা। 'জোরে হাঁটবেন। ...ফারা, ঈসার ঘোড়ায় ওঠো! জলদি!'

গানশিপগুলো টিলার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে ক্রমেই।

আহত সোহেলকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা তিনজন, ডানদিকে চলেছে, টিলার পা ঘেঁষে জঙ্গলের দিকে।

আধঘণ্টা পর রানার মনে হলো অনন্তকাল ধরে হাঁটছে। সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও স্ট্রেচারটার কারণে। দু'হাতে

শক্ত করে ধরেছে স্ট্রেচারের হ্যান্ডেল দুটো। হাত কাঁপছে ওর। পেশীগুলো ব্যথা করছে। মাথা ঘোরাটা আরও বেড়েছে। মাঝে মাঝেই ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি।

পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল রানা, টালমাটাল হয়েও সামলে নিল।

আওয়াজটা পেয়ে ঘাড় ফেরাল ঈসা আজনবী, থেমে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিত চেহারায় রানার দিকে তাকাল।

'এগোন,' চাপা গলায় নির্দেশ দিল রানা।

ওর পিছনে ঈসার ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছে ফারা রাইনার, উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'রক্ত দেবার পর দুর্বল হয়ে পড়ার কথা তোমার। তার ওপর ঘুমাওনি, খাওনি ঠিক মতো। দুর্গে হামলা করতে গিয়ে আহতও হয়েছ। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। বেশিক্ষণ আর এরকম পরিশ্রম সইতে পারবে না তোমার শরীর।'

'পারতে হবে,' জেদ প্রকাশ পেল রানার গলায়। আরও শক্ত করে ধরল ও খুঁটি দুটো, তারপর 'এগোন, ঈসা,' বলে সামনে বাড়ল আবার। ঢাল বেয়ে উঠতে হচ্ছে বলে ওর কাফ মাসলে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে।

'জ্ঞান হারাবে শেষে তুমি,' পিছন থেকে বলল ফারা।

'জ্ঞান হারালে চলবে না,' দাঁতে দাঁত চাপল রানা। ওর চোখের সামনে স্ট্রেচারের ওপর নিথর পড়ে আছে সোহেল। স্ট্রেচার একটু কাত হলেই মাথা হেলে পড়ছে ওর। ...স্ট্রেচারটা সোজা করে রাখতে হবে।

'এই ঘোড়াটার ওপর স্ট্রেচারের এদিকটা রাখতে পারো,' বলল ফারা।

'একটা ঘোড়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, এটাই চাইনি,' বলল রানা। 'যদি ভয় পেয়ে ঘোড়া দুটো ছুট দেয়, তা হলে?'

'শক্ত করে রাশ ধরে রাখব আমরা, ছুটতে দেব না।'

'তারপরও কাজ হবে না। দুটো ঘোড়ার পিঠে স্ট্রেচার চাপালে

গাছের ফাঁক দিয়ে নেব কী করে? নিতে যদি পারিও, গতি কমে যাবে, বাড়তি ঝুঁকি নেয়া হবে তাতে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

ঢালের ওপর উঠে এসেছে ওরা। এতক্ষণ দক্ষিণে এগিয়েছে তিনজন। এদিকেই গেছে ইউনূস মোসাদ্দেক।

বামদিকে একটা খাদ দেখতে পেয়ে থামল ঈসা আজনবী। রানার দিকে ফিরে তাকাল। 'ওই খাদটা পুবের পাহাড়ের দিকে গেছে। মাটিতে অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকেই সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেকের পথ থেকে আলাদা হয়ে গেছেন সর্দার আহম্মদ আলী।'

ওদিকে পাকিস্তান। একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে কোনও না কোনও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সোহেলের চিকিৎসা দরকার। মাথা কাত করে ইশারা করল রানা ঈসা আজনবীকে।

ঘোড়াটাকে নিয়ে খাদের ভিতর নামল ঈসা, পিছনে স্ট্রেচার বয়ে হাঁটছে রানা, আচ্ছন্ন লাগছে ওর, চিন্তাগুলো কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। সত্যিই কি জ্ঞান হারাবে ও?

এরমধ্যে বেশ কয়েকবার স্ট্রেচার বহন করতে চেয়েছে ঈসা আজনবী, রাজি হয়নি রানা। সুস্থ-সবল থাকুক ঈসা, বিপদে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবার ক্ষমতা অন্তত থাকুক। দুর্বল হয়ে পড়লে হয়তো সে-চেষ্টাও করতে পারবে না। ওর কারণে এমনিতেই অনেক বড় বড় ঝুঁকি নিয়েছে মানুষটা, কৃতজ্ঞতার বোঝা আরও বাড়াতে চায়নি রানা।

ওদের পিছনে টিলার রাজ্যে কামানের গোলা দাগছে গানশিপগুলো।

ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরেছে ও আমেরিকানদের দুর্গে হামলা করে। কতটা খেপেছে আগ্রাসী আমেরিকান আর্মি? এভাবে যদি গোলাগুলি খরচ করতে থাকে তা হলে অ্যামিউনিশন শেষ হতে বেশি দেরি হবে না তাদের।

চিন্তাটা রানার মনে আশার জন্ম দিল। পরক্ষণে দপ করে নিভে গেল আশার প্রদীপ। ক্রোধান্ধ হবে না একদল ট্রেইন্ড অফিসার। এতোবড় বোকামি করবে না যে মিশন ব্যর্থ হবেই। গানশিপগুলোতে হয়তো সৈনিক নেই, সেই জায়গায় তোলা হয়েছে বাড়তি অ্যামিউনিশন, নইলে এভাবে গোলাগুলি খরচ করত না তারা। রকেট বা মিসাইল তোলেনি, ওগুলো বাইরে থেকে লোড করতে হয়। তবে কামান বা মেশিনগান ভিতর থেকেই রিলোড করা যায়। রানার মনে পড়ল, খুব কম রকেট বা মিসাইল বিস্ফোরণের আওয়াজই পেয়েছে ও। মেশিনগান ব্যবহার করছে গানশিপগুলো, রকেট ও মিসাইল রেখে দিয়েছে শত্রুদের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে ব্যবহার করবার জন্য।

আরেকটা চিন্তা মাথায় আসতেই আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। গানশিপগুলো এতো গুলি খরচ করছে কেন? এতো সন্দেহজনক জায়গা খুঁজে পাচ্ছে পাইলট বা গানাররা? ব্যাপারটা সন্দেহজনক নয়?

একটাই মাত্র ব্যাখ্যা থাকতে পারে এর। যদি...

মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশিরে একটা অনুভূতি নেমে গেল রানার। এমন হতেই পারে যে, গানশিপগুলো টিলার ভিতরে লুকিয়ে থাকা গেরিলাদের খুন করতে পারবে ভেবে গুলি করছে না, গুলি করছে তাদের ভয় দেখিয়ে দিশেহারা করবার জন্য। বনমুরগি বা খরগোশ শিকারের কথা মনে পড়ল ওর। শিকারী সাধারণত নানরকম আওয়াজ করতে থাকে। অপেক্ষা করে কখন শিকার দিশে হারিয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। আমেরিকান আর্মিও বোধহয় তাই করছে। এবং ভীত খরগোশের মতো ছুটছে ওরা। কিন্তু উপায়ও তো নেই এ ছাড়া। গুহায় কিছুতেই থাকা যেত না। মিসাইল বিস্ফোরণে মরতে হতো। না, গানশিপগুলোর চোখ এড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে ওদের।

'ঈসা, গতি বাড়ান!' দীর্ঘ পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করল রানা।

সামনে গাছের সারি পাতলা হয়ে আসছে। জঙ্গলের সীমানা থেকে শুরু হয়েছে খোলামেলা ঘাসজমি। ওপারে আবার উঁচু ঢালের গায়ে জঙ্গল আছে। তবে সেই জঙ্গলও তেমন ঘন নয়। দূরে দেখা যাচ্ছে ধূসর পাথুরে জমি, ওপরে উঠে ধবধবে সাদা তুষারের রাজ্যে গিয়ে মিশেছে।

'খোলা জায়গায় বের হওয়া যাবে না, ঈসা,' বলল রানা। 'ঘুরে গাছের ভিতর দিয়েই যেতে হবে।'

কাঁধ দুটো ব্যথা করছে রানার, মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে অবশ হয়ে যাচ্ছে পেশীগুলো। গাছের ফাঁক দিয়ে এগোল ঈসা, অনুসরণ করল ও।

আবার ওর মনে পড়ল শিকারের কথা। কখনও কখনও অন্য ভাবেও বনমুরগি আর খরগোশ শিকার করা হয়। একজন শিকারী আওয়াজ করে বের করে আনে শিকারকে, সেদিকে আগে থেকেই অপেক্ষায় থাকে আরেকজন শিকারী, শিকার বের হলেই গুলি করে। নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা, আমরাও কি ভয় পাওয়া খরগোশের মতোই করছি? পালিয়ে দূরে যাচ্ছি, না চলে যাচ্ছি অপেক্ষমাণ শিকারীর আওতার মধ্যে?

আবার হোঁচট খেল রানা। পড়ে যাবে টের পেয়ে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। আরও শক্ত করে ধরল স্ট্রেচারের হ্যান্ডেল। কাঁধের ব্যথা সামলাতে দাঁতে দাঁত চাপল।

'বিশ্রাম নিতে হবে তোমাকে,' বলল ফারা রাইনার।

'আঁধার নামলে।' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকাল। পশ্চিমের পাহাড়ের মাথায় ঝুলে আছে বিশাল সূর্য, এতোই লাল, দেখে মনে হয় তাজা রক্তে ভরা ওটার মস্ত পেট।

এক পায়ে ভর দিয়ে আধবসা হলো রানা, তারপর আরেক হাঁটুর জোরে উঠে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে কাঁধের জয়েন্ট থেকে খুলে আসবে হাত দুটো। কনুই, কব্জিতে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়েছে

অনেকক্ষণ হলো। মনের ওপর সারাক্ষণ চাপ ফেলছে গানশিপগুলোর ইঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

'এগোন, ঈসা।'

পথচলা কি কোনদিনও শেষ হবে? ঘুরপথে খোলা ঘাসজমি এড়িয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। তারপর শুরু হলো উঁচু, খাড়া একটা চড়াই। গাছের সংখ্যা আশঙ্কাজনক ভাবে কমছে। পাথরের রাজ্যে ঢুকছে ওরা। পায়ের তলায় মাটির পুরুত্ব কমছে, জমি হয়ে যাচ্ছে রুক্ষ, পাথুরে।

একটা টিলার ওপর উঠে ঈসা ও ফারাকে সতর্ক করল রানা, পাথরের স্তূপের আড়াল নিয়ে এগোল ওরা, যাতে ওপর বা পাশ থেকে ওদের দেখা না যায়। একবার পিছনে তাকাল রানা, দেখতে পেল দূরে নীচের টিলাগুলোর ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে জনবসতির চিহ্ন খুঁজছে মৃত্যুবাহী হিংস্র যান্ত্রিক ফড়িংগুলো। তাদের খোঁজায় কোনও তাড়াহুড়ো নেই, এক ফুট জায়গাও বাদ দিচ্ছে না সার্চ করবার সময়। আস্তে আস্তে টিলার সঙ্গে ওপরে উঠছে; ঝোপঝাড়, খাদ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ডুবন্ত সূর্যের লালচে আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে ওগুলোর ঘুরন্ত রোটর। সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ায় রোটরে রোদের চমক অদৃশ্য হলো। একটা গানশিপের উইং থেকে হুউউশ্ আওয়াজ করে ধোঁয়া পিছনে নিয়ে ছুটল রকেট। গাছের ওপারে একটা টিলার গোড়া থেকে আগুনের একটা লাল গোলক লাফ দিয়ে ওপরে উঠল।

দূরত্বের কারণে নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই, তবে রানার মন বলল, ওই রকেটটা এইমাত্র ধ্বংস করে দিল পিছনে ফেলে আসা ওদের বসতি এবং সেই গুহাটা। জঙ্গলের ভিতর আগুনটা বড় বেশি উজ্জ্বল দেখাল ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার আঁধারে।

পুরোপুরি ডুবে গেছে সূর্য, তারপরও একটা গানশিপের পেট থেকে হলুদ মেঘ বের হতে দেখল ওরা। খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল

সেই মেঘ, নামতে শুরু করল একটা খাদের দিকে। তিক্ত অনুভূতি হলো রানার। বিষাক্ত কেমিকেলের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে আমেরিকান আর্মি। ওই এলাকার একটা পিঁপড়েও বাঁচতে পারবে না।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হচ্ছে আরও। নীচের টিলার এখানে ওখানে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। গানশিপগুলোর জোরাল সার্চলাইট জ্বলে উঠেছে, নীচে চোখ বুলাচ্ছে ওগুলো।

'এবার বিশ্রাম নেবেন?' ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল ঈসা।

সার্চলাইটের দিকে একবার তাকাল রানা, তারপর মাথা নাড়ল। 'আরেকটু পর। আরেকটা ঢাল পেরিয়ে।'

কী যেন বলল ফারা বিড়বিড় করে। সুরটা অসন্তুষ্টির।

'কী বললে?' ঘাড় না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এভাবে পরিশ্রম করলে মারা পড়বে তুমি।'

সামনে তাকাল রানা। গাছ আর প্রায় নেই বললেই চলে, সে-জায়গা দখল করেছে বড় বড় পাথরের খণ্ড। পাথরের একটা ন্যাড়া তাকের ওপর উঠে এসেছে ওরা। আবার হোঁচট খেল রানা। এবার থামতে বাধ্য হলো।

থরথর করে কাঁপছে ওর দু'হাত, খুব আস্তে আস্তে স্ট্রেচারটার খুঁটি জমিতে নামাল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে টের পেল, অত শক্তি নেই শরীরে। হাঁটু দুটো আর শরীরের ভর রাখতে পারল না, চিত হয়ে পড়ে গেল পাথরের ওপর।

ঈসার ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল ফারা, ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

রানা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'সোহেল... সোহেলের কী অবস্থা সেটা একটু দেখো।'

'কিন্তু...

কার ওপর যেন রেগে গেল রানা। বোধহয় মেনে নিতে পারছে

না নিজের সীমাবদ্ধতা। 'যা বলছি করো!'

'গাধা একটা তুমি!' ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে স্ট্রেচারে পড়ে থাকা সোহেলের কাছে চলে গেল ফারা।

চুপ করে পড়ে থাকল রানা, আকাশে চোখ। অজস্র নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। চোখ বুজল ও, শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে ধ্যান করতে চেষ্টা করল। পেশীগুলোকে শিথিল করতে হবে। কাজটা জরুরি। কিন্তু মনোসংযোগ করা যাচ্ছে না। বিচ্ছিন্ন সব টুকরো চিন্তা আসছে মাথায়।

ওর পাশে এসে আবার বসল ফারা। মৃদু গলায় বলল, 'এখনও জ্ঞান ফেরেনি। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিচ্ছে তবে পালস আরও দুর্বল হয়ে গেছে।'

উঠে বসল রানা। 'তার মানে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে?'

সরাসরি জবাব দিল না ফারা। 'দুঃখিত, আবার ওর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।'

দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

ফারা বলল, 'জ্বরটা বেড়েছে। ওকে পানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে ডিহাইড্রেশনেই মারা যাবে।'

দাঁড়াল রানা, কয়েক মুহূর্ত টলল, তারপর স্ট্রেচারের পাশে গিয়ে ঝুঁকে তাকাল।

ঈসা আজনবী একটা ক্যান্টিনের মুখ খুলে সোহেলের ঠোঁটের ফাঁকে ধীরে ধীরে পানি ঢালছে। অন্ধকারেও রানা দেখতে পেল, পানির বেশিরভাগটাই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

'একটু পানি খা, দোস্ত,' গলা ভেঙে গেল রানার কথা বলতে গিয়ে। বসে পড়ে সোহেলের দিকে ঝুঁকল ও। 'সোহেল! ওঠ্, দোস্ত! সোহেল!'

কোনও সাড়া দিল না অচেতন সোহেল।

'সোহেল!' ওর চুলে আলতো করে বিলি কাটতে শুরু করল

রানা। ঝাপসা দেখছে চোখে। ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে লোনাপানি। 'ওঠ্, সোহেল!'

গোঙাল সোহেল, হাতটা তুলতে চেষ্টা করল। সামান্য নড়ল শুধু কব্জির কাছটা।

'সোহেল! আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? পানি খেতে হবে তোকে!'

সামান্য নড়ল সোহেলের ঠোঁট। 'যা... যা ভাল বুঝিস।'

ঈসার কাছ থেকে ক্যান্টিনটা নিল রানা, আস্তে আস্তে পানি ঢালতে শুরু করল সোহেলের ঠোঁটের কোণে।

'আরেকটু, দোস্ত... আরেকটু...

আরও দু'-ঢোক পানি গিলে মাথাটা কাত করল সোহেল। ওর কথা শুনতে গিয়ে ঝুঁকতে হলো রানাকে।

'জানিস, আমি স্বপ্নে দেখলাম স্যান্ডহার্স্ট-এ তুই আর আমি...' হাসবার চেষ্টা করল সোহেল। 'দু'জনের মধ্যে লেগে গেছে, কে সেরা ক্যাডেট হবে... শেষে দু'জন দু'জনকে ছাড় দিতে গিয়ে তুই আর আমি যৌথ ভাবে প্রথম হলাম! অথচ তুই সেরা ক্যাডেট হতে পারতি। আর...

'আসলে তুই সেরা ক্যাডেট হতি, সব মনে আছে আমার,' বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগল রানার। ঢোক গিলে বলল, 'এবার তুই একটু বিশ্রাম নে। দেখবি তরতাজা লাগবে।'

'দুঃখিত, দোস্ত... আমার জন্যে এখানে এসে তুই... কথা শেষ করতে পারল না সোহেল, চুপ হয়ে গেল।

ফারা একটা রুমাল ভিজিয়ে ওর মুখ মুছে দিল, কপালে রাখল ভেজা রুমালটা।

'ঘোড়াগুলোকে খাওয়া দিতে হবে, পানিও,' ঘুরে দাঁড়াল ঈসা আজনবী।

'তোমারও বিশ্রাম দরকার,' রানার বাহুতে হাত রাখল ফারা

'পরে।'

'না, এখন।' কঠোর শোনাল ফারার গলা। অবাধ্য রোগীর প্রতি যেরকম আচরণ করে ডাক্তার, তার এখনকার আচরণটা ঠিক তেমন। 'তোমার হাতের তালু ফেটে যা-তা অবস্থা হয়ে গেছে, ডিসইনফেক্ট করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'খেলে বমি হয়ে যাবে।'

রেগে গেল ফারা। রানার হাত চেপে ধরে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, এই একবারের মতো আমি যা বলছি তাই করো।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা, ঈসার ক্যান্টিন থেকে কয়েক ঢোক পানি গিলল। ফারার জোরাজুরিতে গলে যাওয়া রাবারের মতো চটচটে, বাসি এক টুকরো পাউরুটিও খেতে হলো ওকে।

সামান্য কিছু খেয়ে নিল ঈসা ও ফারা রাইনার।

অনেক নীচে, অন্ধকারে ভুতুড়ে মনে হচ্ছে সার্চলাইটের আলোগুলোকে, যেন কোথাও থেকে শুরু হয়নি ওই আলোর রেখা, কোথাও গিয়ে পড়ছেও না। মেশিনগানের নল থেকে ছিটকে বের হওয়া আগুনের ঝিলিকও যেন নিঃসীম শূন্য থেকে তৈরি হচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে।

ঘাড় ফিরিয়ে বরফ-মোড়া পর্বত-চূড়াগুলোর দিকে তাকাল রানা। রাতেও ঘোলাটে আভা ছড়াচ্ছে বরফের ওই হিম-শীতল রাজ্য।

ঈসা আজনবী পাশে এসে দাঁড়ানোয় রানা জিজ্ঞেস করল, 'পাহাড় ডিঙাতে কীরকম সময় লাগতে পারে?'

'আগামীকাল পুরো দিন তো লেগে যাবেই,' চিন্তিত গলায় বলল ঈসা, 'ভাগ্য ভাল হলে ওপারের উপত্যকায় পৌঁছতে পারব সন্ধ্যার আগে।'

'তার মানে ভোরে রওনা হবার কথা ভাবছেন আপনি?'

'উপায় কী, বিপদ-আপদ এড়িয়ে যেতে হলে আলো দরকার।'

'কিন্তু গানশিপগুলো এগিয়ে আসছে,' দৃঢ় শোনাল রানার গলা, 'আমরা আজ রাতেই রওনা হবো।'

আপত্তি করল ফারা। 'কিন্তু ঘুম দরকার তোমার! যথেষ্ট বিশ্রাম না নিলে যখন-তখন কোলাপ্‌স্‌ করবে তুমি।'

'হয়তো,' আপত্তি করল না রানা, পরক্ষণেই যোগ করল, 'কিন্তু ওই গানশিপগুলো যদি আমাদের নাগাল পেয়ে যায়, তা হলে মারা পড়ব, কোনদিনই আর ঘুমাতে পারব না। মরবে তোমরাও।' তারার আবছায়ায় ফারার চোখে তাকাল রানা। 'রওনা হচ্ছি আমরা, তৈরি হয়ে নাও।'

ফারা ঘুরে দাঁড়াতেই পর্বতের দিকটায় চোখ বুলাল রানা। আহম্মদ আলীর গোত্র অনেক দ্রুত পথ চলতে পারবে। তারা বোধহয় চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এতক্ষণে। বিশ্রাম নিতে বোধহয় থামবে না তারাও। আচ্ছা, ইউনূস মোসাদ্দেক বা আলফাজ কুশের কী হলো? গোত্র দুটো উত্তর ও দক্ষিণে যাচ্ছে। গানশিপগুলো কি এড়াতে পেরেছে তারা?

চোদ্দো

অতি ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে অন্ধকার ঢাল বেয়ে নামছে ইউনূস মোসাদ্দেক। গাছগুলো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না রাতের আঁধারে। এদিকের দক্ষিণ ঢালে খানিকটা ওপরে গাছে ছাওয়া একটা খাদের ভিতরে লুকিয়ে আছে তার গোত্রের সবাই।

সন্ধ্যার একটু পরে এখানে পৌঁছেছে তারা। পশ্চিমে, তার হাতের ডানদিকে হেলিকপ্টার গানশিপের ইঞ্জিনের আওয়াজ

শুনতে পাচ্ছে ইউনূস মোসাদ্দেক। সার্চলাইটগুলোও দেখা যাচ্ছে ওদিকে তাকালে। মাঝে মাঝে ফ্লেয়ার ছুঁড়ছে গানশিপ। মেশিনগানগুলো প্রায় এক নাগাড়ে আগুনের ঝলকানি ওগরাচ্ছে। একটু আগে বেশ কয়েকটা সার্চলাইট ফিরে গেছে। ওগুলোর জায়গায় এসেছে নতুন কয়েকটা।

তেল ভরতে ফিরে গেছে, ভেবেছে ইউনূস মোসাদ্দেক। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে নামছে সে এখন, সতর্ক।

একসঙ্গে এতোগুলো গানশিপ দেখলে ভয় ধরে যায় মনে, কাঁপুনি ওঠে বুকের ভিতর, আপন মনে ভাবল ইউনূস মোসাদ্দেক। হয়তো ভয় দেখানোটাই ওগুলোর উদ্দেশ্য। আগে কখনও এতো বড় আকারের মিলিটারি অপারেশনে নামেনি এদিকে ইউএস ফোর্স। এটা ভাবা কি ঠিক হবে যে, গানশিপগুলোকে এড়াতে ওগুলোর সার্চ এরিয়ার আওতার বাইরে গিয়ে একপাশ দিয়ে এগোলেই চলবে? আমেরিকান অফিসাররা কি এটা চিন্তা করে দেখেনি? চিন্তা করাটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে গানশিপগুলোর ডানে-বামে নিশ্চয়ই ফাঁদ পাতবে তারা?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

আল্লাহ্‌র কাছে অন্তর থেকে সাহায্য প্রার্থনা করল ইউনূস মোসাদ্দেক। তার গোত্রের একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। কিন্তু সে যদি সেই আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে সাবধানতা অবলম্বন না করে, যদি সামনে কী আছে সেটা নিজে আগে থেকে দেখে না নেয়, তা হলে কী রকমের নেতা হলো সে? কাজেই সামনে কী আছে দেখতে হবে তাকে।

সেই দুঃসাহসী বাংলাদেশির কথা মনে পড়ল তার, মনটা ছোট হয়ে গেল। মানুষটা তার মেয়েটার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। অথচ তার জন্য প্রায় কিছুই করতে পারেনি সে। তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে আসতে হয়েছে বলে নিজেকে এখনও ক্ষমা করতে পারছে না ইউনূস মোসাদ্দেক। বারবার বলবার পরও তো এলো

না মাসুদ রানা। বন্ধুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে রাজি হয়নি মানুষটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি বাঁচাতে পারবে তাকে? নিজে বাঁচতে পারবে? বন্ধুত্বকে সম্মান করে ইউনূস মোসাদ্দেক, কিন্তু গোত্রের প্রতি বিরাট একটা দায়িত্ব আছে তার। মন যা-ই বলুক, বিদেশি বন্ধুর জীবনের গুরুত্ব তার গোত্রের নিরাপত্তার চেয়ে অবশ্যই বেশি নয়।

নিজেকে শাসাল ইউনূস মোসাদ্দেক, মাসুদ রানার চিন্তা এখন মাথা থেকে দূর করে দাও, যা করছ সেটা মন দিয়ে করো।

রাতের অন্ধকারে আরও গাঢ় কালো ঝোপ-ঝাড় ও গাছের পাশ দিয়ে টিলার শেষে চলে এলো ইউনূস মোসাদ্দেক, নীচের খাদের দিকে তাকাল। আকাশে প্রচুর তারার মেলা বসেছে, কিন্তু খাদের ভিতরটা যেন কালো কালিতে চোবানো। চাঁদ উঠলে কাটবে ওই তমসা। তার আগে পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষায় থাকবে, বিশ্রাম নেবে, ঠিক করল ইউনূস মোসাদ্দেক।

নীচ থেকে ভেসে আসা একটা শব্দে পেটের ভিতর অদ্ভুত একটা মোচড়ানো অনুভূতি হলো তার। আওয়াজটা খাদের পাড়ে টলটলায়মান কোনও নুড়িরও হতে পারে, এতদিনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে যেটা পড়ে গেছে খাদের ভিতর।

অথবা আওয়াজটা হতে পারে কোনও মরা গাছের ডালে-ডালে ঘষা খাবার কারণে। কিন্তু রাত তো নিস্তব্ধ, বাতাস বইছে না একটুও।

এটাও হতে পারে যে, পাথরে ঘষা খেয়েছে কোনও রাইফেলের বাঁট। অথবা কোনও ক্যান্টিন। অথবা সুইচ অন করা হয়েছে কোনও টু-ওয়ে রেডিওর।

সমস্ত অনুভূতি সজাগ রেখে অপেক্ষায় থাকল ইউনূস মোসাদ্দেক। দৃষ্টি, স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, শ্রবণ – সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল সে।

রাতটা শীতল,.তবুও ঘামছে ইউনূস মোসাদ্দেক।

'ওই যে! আবার হলো আওয়াজটা!'

ধাতু ঘষা খাবার আওয়াজ!

ফিসফিস করছে কে যেন!

কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না! ইংরেজি ভাষা!

রাতের স্থির নীরবতায় ওই ফিসফিস আওয়াজটাই যেন কষে চড় মারল ইউনূস মোসাদ্দেকের কানে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল তার।

তার মানে এদিকে আমেরিকান আর্মির লোক নজর রাখছে! সাদা পশুগুলো আশা করছে গানশিপের ভয়ে পশ্চিম দিক থেকে পালিয়ে উত্তর অথবা দক্ষিণে যাব আমরা। পুবে যাব সেটা ভাববে না কিছুতেই, কারণ পুবে যাওয়া মানে পরাজয় মেনে নেয়া।

নীচে নিশ্চয়ই কোনও ফাঁদ পাতা হয়েছে।

খাদের কিনারা থেকে পিছিয়ে সরে যেতে হবে তাকে, দলের সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে যেতে হবে দেরি না করে। এখন মাত্র একদিকে যাওয়ার পথ খোলা আছে – পুবে, পাকিস্তান-সীমান্তের দিকে।

কিন্তু সেদিকেও যদি ফাঁদ পেতে রাখে আমেরিকান আর্মি? তাদের কমান্ডিং অফিসার কি ধরে নেবে, আমরা কখনও ওদিকে যাইনি বলে বাধ্য হলেও যাব না?

নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুত বড় বড় পাথরখণ্ডের মাঝ দিয়ে ক্রল করে ফিরে চলল ইউনূস মোসাদ্দেক। নতুন ওঠা ভরা যৌবনা চাঁদের রূপালী আলো তাকে পথ দেখাল।

চাঁদ ডুবে গেছে। নক্ষত্রে আবছা আলোয় গোত্রের ঘোড়সওয়ার যোদ্ধাদের আগে আগে পুবের সরু, লম্বাটে উপত্যকা ধরে এগিয়ে চলেছে আহম্মদ আলী। উপত্যকার দু' ধারে ঢালু হয়ে ওপরে উঠে গেছে জমিন। ওখানে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছ, জঙ্গল তৈরি করেছে। তবে উপত্যকার বেশিরভাগ জায়গাতেই জমি সমতল, ঘাসে ছাওয়া। রাতের বেলাতেও নিজেদের অরক্ষিত মনে হচ্ছে

আহম্মদ আলীর। উদ্বিগ্ন বোধ করছে সে। গোত্রের সবাইকে আরও দ্রুত এগোতে তাগিদ দিল।

সাইমুমের মতো ঝড়ো গতিতে এগিয়েছে তারা সবাই। সেই দুপুরে বসতি থেকে বেরিয়ে একবারের জন্যও থামেনি, একটানা উঠে গেছে পাহাড়ের আরও উঁচুতে, নামাজ পড়বার জন্যও কাউকে থামতে দেয়নি। *আল্লাহ্ আমাদের অসহায়তা বুঝে ক্ষমা করুন*, প্রার্থনা করেছে আহম্মদ আলী। *মনে মনে আমরা প্রার্থনা করছি, কিন্তু বাহ্যিক ভাবে তা দেখানোর মতো অনুকূল পরিবেশ নেই এখন। গানশিপগুলোর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে যতটা পারা যায়। জিহাদ করতে হলে আগে বেঁচে থাকতে হবে।*

তারপর একসময় তাদের পথ দেখাতেই যেন আকাশ আলো করে দেখা দিয়েছে মস্ত একটা চাঁদ। বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে তাড়াতাড়ি এগোতে সুবিধে হয়েছে তাদের।

বাচ্চারা তাদের বাবাদের সঙ্গে জিনের ওপর সওয়ার হয়েছে। আহতরা তাদের আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় জিনে টিকে থেকেছে। মহিলারা তাদের কষ্টসহিষ্ণুতার প্রমাণ দিয়ে বরাবরের মতোই পুরুষদের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে।

খাওয়া-বিশ্রাম-প্রাত্যহিক অন্যান্য কাজ সেরে স্বাভাবিক ভাবে যে-পথ অতিক্রম করতে দু'দিন লাগত, তা পার হয়েছে তারা অর্ধেক দিন এক রাতে।

উপত্যকার মেঝে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। গাছের সারির কাছে পৌঁছে গেল আহম্মদ আলী, একটা বুনোপথ দেখে খুশি হয়ে উঠল। একজন একজন করে ওই পথ ধরে সবাইকে এগোতে নির্দেশ দিল সে। দূরে, পর্বতমালার মাথায় অস্পষ্ট একটা আলোর আভা নতুন সূর্যের আগমনী বার্তা জানাচ্ছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ক্রমেই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে আহম্মদ আলীর গোত্রের সবাই। বেশ কিছুক্ষণ পর জঙ্গল শেষ হতে সামনে একটা ঘাসজমি দেখতে পেল আহম্মদ আলী।

তলদেশে নুড়িপাথর ছাওয়া অগভীর একটা ঝর্না পার হলো তারা, আবার ঢুকল বনের ভিতর। ঢাল আরও খাড়া হচ্ছে। পুবাকাশ ফর্সা হচ্ছে বলে ওপরের চুড়োগুলো এখন আগের চেয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবে চারপাশ এখনও আঁধার। ঢালের ওপরের জঙ্গলটা শেষ হবার পর পাথুরে একটা খাদ দেখতে পেল আহম্মদ আলী, স্বস্তি বোধ করল। জানা আছে, ওই খাদটা চলে গেছে পাকিস্তানের দিকে।

আরও ওপরের দিকে উঠছে সবাই। পুবে চলেছে, পাকিস্তানের দিকে।

দূরে একটা আওয়াজ শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল আহম্মদ আলী। মেঘের গুড়গুড় ধ্বনির মতো আওয়াজটা কাছে চলে আসছে। গানশিপ! দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবল সে। দ্রুত সরে যেতে না পারলে আমাদের দেখে ফেলবে!

দলের সবাইকে আরও জোরে ঘোড়া ছোটাতে নির্দেশ দিল সে।

কিন্তু গুঞ্জনটা তাদের দিকে আসছে না। এক জায়গায় যেন স্থির হয়ে গেছে দানব ফড়িংগুলো। পিছনে ফেলে আসা নীচের ওই উপত্যকার দিকে তাকাল আহম্মদ আলী। ওদিকে মাঝে মাঝে সার্চলাইটের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। একেকবারে দশ সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হচ্ছে না উজ্জ্বল আলোর রেখা, তারপর চারপাশ আঁধার হয়ে যাচ্ছে আবার। মাটি থেকে প্রতিফলিত আভায় বিরাট গানশিপগুলো দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে। ওগুলোর পেটের নীচে একটা করে কী যেন ঝুলছে।

কী ওগুলো? আকৃতিটা ভীতিকর এবং পরিচিত। খুব বেশি পরিচিত। ঘোড়ার পাঁজরে পায়ের চাপ বাড়াল আহম্মদ আলী। আরও দ্রুত ওপরে উঠে যেতে হবে তাদের।

অনেকটা উঠে আসবার পর আহম্মদ আলীর বুকে স্বস্তির একটা অনুভূতি হলো। সূর্য উঠছে দূর পাহাড়ের ওপার থেকে।

আলো ফেলছে ওটা পাকিস্তানের ওপর। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল তার ঘোড়াটা।

নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবে সে গোত্রের নারী-শিশুদের।

আবার ফিরবে তারপর।

গানশিপগুলোর কথা মন থেকে সরাতে পারল না সে। মাটিতে আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার নামাচ্ছিল গানশিপগুলো।

কেন?

দুর্দান্ত সাহসী, বীর যোদ্ধা বাংলাদেশি মানুষটার কথা মনে পড়ল তার। বুযকাশির ওই নতুন বিজয়ীকে পিছনে ফেলে এসেছে সে। মাসুদ রানা তার বন্ধুর কথা চিন্তা করে তাদের সঙ্গে আসেনি। বন্ধুর জন্য ওই ভয়ঙ্কর গানশিপগুলোর হামলাকেও তোয়াক্কা করেনি মানুষটা।

যার যার দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হয়, দীর্ঘশ্বাস চাপল আহম্মদ আলী। আমি আমার গোত্রকে পৌঁছে দেব নিরাপদ জায়গায়। যা ভাল মনে করেছে তাই করেছে মাসুদ রানা। আমাকেও যা ভাল মনে করি তাই করতে হবে।

কিন্তু যদি...

আহম্মদ আলী উপলব্ধি করল, আল্লাহ্ যেন তার মনে অনুভূতির সৃষ্টি করছেন, দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। তার নিয়তি, তাদের নিয়তি যেন নির্ধারণ হয়ে গেছে।

বাচ্চাদের তাদের বাবার ঘোড়া থেকে নামাতে নির্দেশ দিল আহম্মদ আলী, তাদের উঠিয়ে দিতে বলল মহিলাদের সঙ্গে, তারপর কাজটা হয়ে যেতেই দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য মহিলাদের তাড়া দিল সে।

তার চড়া কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল: 'যাও তোমরা। পাকিস্তানে চলে যাও।'

কয়েকজন গেরিলাকে তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃদ্ধ ও অসুস্থদের

নিয়ে পাকিস্তানের পথে রওনা হয়ে যাবার নির্দেশ দিল সে, তারপর তাকে অনুসরণ করবার জন্য আদেশ দিল অবশিষ্ট যুবকদের।

ফিরে চলল আহম্মদ আলী ফেলে আসা পথ ধরে। ঈসা আজনবী এদিকের লোক নয়, দুর্গম কিন্তু নিরাপদ পথ চেনে না সে পাকিস্তানে যাবার, কাজেই সহজ ও ব্যবহৃত পথেই মাসুদ রানাকে নিয়ে পাকিস্তানে ফিরতে চাইবে সে। এবং তার মানে, জঙ্গলের মাঝখানের ওই লম্বাটে উপত্যকায় গিয়ে ঠিক আমেরিকানদের ফাঁদে পড়বে। বাংলাদেশি বন্ধুকে চিনতে যদি তার ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে মরণপণ লড়বে মানুষটা। সেই লড়াইয়ে যোগ দিতে ঘোড়ার গতি আরও বাড়াল আহম্মদ আলী।

আহম্মদ আলীর নির্দেশে লড়াই করবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিল দুঃসাহসী, বেপরোয়া একদল আফগান যুবক। ছুটে চলল তারা তাদের দুর্ধর্ষ সর্দারের পিছন পিছন।

দূর দিগন্তে গানশিপগুলোকে হারিয়ে যেতে দেখল আলফাজ কুশে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সে, তারপর গোত্রের সবাইকে গাছের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিল। উত্তরে যেতে গিয়েও মত পাল্টাতে হয়েছে তাকে। পশ্চিম থেকে আসা গানশিপগুলোকে এড়াতে গিয়ে একটা উপত্যকা ধরে নেমে যাবার কথা ভেবেছিল সে, তারপর মনে আসা হঠাৎ সন্দেহের কারণে টিলার নীচের দিকটা ঘুরে দেখতে যায়। তখনই দেখতে পায় ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার ও ট্রাকগুলোকে, ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় আছে। এরপর আলফাজ কুশের বুঝতে দেরি হয়নি, গানশিপগুলো তাদের খেদিয়ে জড় করবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে মাত্র। ইউএস আর্মি আশা করছে ওগুলোকে এড়িয়ে দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে তারা।

আলফাজ কুশের মনে সন্দেহ রইল না, উল্টোদিকে ইউনুস

মাসাদ্দেকের জন্যও একই রকম ফাঁদ পাতা হয়েছে। ওখানেও অপেক্ষায় আছে আর্মার্ড কলাম। ইউনূস মোসাদ্দেকের জন্য দোয়া করল সে আল্লাহ্‌র দরবারে, দোয়া করল অত্যাচারিত সমস্ত মানুষের জন্য। পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণে যাবার আর কোনও উপায় যেহেতু নেই, সেহেতু একটা দিকেই যেতে পারবে সে – পাকিস্তানের দিকে, পুবে।

গোত্র-প্রধানের কথার ওপর দিয়ে কথা বলল না কেউ। একটু পর রওনা হলো তারা পুবদিক লক্ষ্য করে। সন্ধ্যার দিকে অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ দেখতে পেল আলফাজ কুশে, আন্দাজ করল, এদিক দিয়েই গেছে আহম্মদ আলীর গোত্র। তারও খানিক পরে সামনের জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছে গেল সে গোটা দল নিয়ে, থামল ওখানে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য। ঠিক তখনই গাছের ভিতরে নড়াচড়া দেখল আলফাজ কুশে। রাইফেল কাঁধে তুলে সেদিকে তাক করল সে, ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াল, তারপর ট্রিগারের ওপর থেকে আঙুল সরিয়ে নামিয়ে নিল অস্ত্রটা।

জঙ্গল থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এসেছে সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'দক্ষিণে ফাঁদ পেতেছে আমেরিকানরা।'

'উত্তরেও,' জানাল আলফাজ কুশে।

আস্তে করে মাথা দোলাল ইউনূস মোসাদ্দেক, তারপর ভারী গলায় বলল, 'দেখা যাচ্ছে একই সঙ্গে যাওয়া শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাগ্যে লেখা ছিল।'

'রওনা কি রাতেই হবেন?' জিজ্ঞেস করল আলফাজ কুশে।

'সেটাই তো ভাল মনে হচ্ছে, আপনি কী বলেন?'

'আমারও রাতে রওনা হবার ইচ্ছে।'

পনেরো

টকটকে লাল ডুবন্ত সূর্যটা যেমন বিশাল ছিল, থালার মতো রূপালী চাঁদটাকেও তেমনি মস্ত বড় মনে হলো রানার। দূষণমুক্ত আকাশ-বাতাস, সেই সঙ্গে আফগানিস্তানের অক্ষাংশের কারণে আলোর কারসাজি – দুটো মিলিয়ে মনে হলো ধরার বুকে নেমে আসবে চাঁদমামা। ঝকঝকে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ভেসে গেল চারপাশ।

যে-পাথরগুলোর মধ্য দিয়ে স্ট্রেচার বয়ে চলেছে রানা, সেগুলোর রং সাদা, কিন্তু মলিন। ঈসা আজনবী আর স্ট্রেচারের ওদিকটা নিয়ে এগিয়ে চলা ঘোড়াটাকে ভুতুড়ে লাগছে। বেঁচে আছে সোহেল, কিন্তু ওর দিকে তাকালে মনে হচ্ছে পড়ে আছে ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য লাশ। ঘাড় ফিরিয়ে আবছা ভাবে ফারাকে দেখতে পেল রানা, ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে মরণ-পাখিগুলোর সার্চলাইট।

ফোস্কা পড়া হাত দুটো দিয়ে স্ট্রেচারের খুঁটি ধরে আছে রানা। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। রাতটা শীতল, তারপরও ঘামে ভিজে গেছে ও। বাতাস নেই বলে প্রতিবার পাথরে ওর বুট ঘষা খেলে সে-আওয়াজটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে মাঝেই মাঝেই নীচে গড়িয়ে পড়ছে আলগা পাথর। বেশ আওয়াজ হচ্ছে তাতে।

অনেকক্ষণ পর গাছের সারি পেরিয়ে আরও ওপরে উঠে এলো ওরা। উচ্চতার কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঘন ঘন ওঠা-নামা

করছে রানার বুক, তবুও ফুসফুস যেন পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাচ্ছে না। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে রানা, একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে। পাক খাচ্ছে পেটের ভিতর, বমি বমি লাগছে।

'তিরিশ মিনিট,' ওর পিছন থেকে বলল ফারা।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ফারা বলেছে প্রতি আধঘণ্টা পর পর সোহেলকে পানি খাওয়াতে হবে। আস্তে করে স্ট্রেচারের খুঁটি মাটিতে নামাল রানা, বসে পড়ে কাঁধ ও হাতের আড়ষ্ট পেশীগুলো ম্যাসাজ করতে শুরু করল।

ঈসা আজনবী ক্যান্টিন কাত করল সোহেলের ঠোঁটের কোণে। থুতনি বেয়ে গড়িয়ে নামল খানিকটা পানি। তবে কণ্ঠা নড়ছে সোহেলের, পানি গিলছে আস্তে আস্তে।

ওকে পানি খাওয়ানো শেষ হতেই ঈসার কাছ থেকে ক্যান্টিনটা নিয়ে রানার পাশে চলে এলো ফারা। 'তোমাকেও পানি খেতে হবে।'

'তৃষ্ণা নেই,' অসুস্থ বোধ করছে রানা।

ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল ফারা। 'যা বলছি করো।'

তর্ক করল না রানা, ক্যান্টিন থেকে গলায় পানি ঢালল। ক্যান্টিনটা নামাতেই ওর হাতে রুটির একটা টুকরো ধরিয়ে দিল ফারা। রুটিতে কামড় দিয়ে রানা ভাবল, এই বাসি-হামলা কি আমার পেট সহ্য করতে পারবে?

পরক্ষণেই বুঝতে পারল, এই একই মাল খাচ্ছে ঈসা আজনবী ও ফারা।

খাওয়া শেষ হতেই আবার রওনা হলো ওরা। ওজন বইতে গিয়ে রানার কাঁধ ও হাতের সমস্ত পেশী তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আস্তে আস্তে পর্বতের আরও ওপরে উঠছে ওরা।

এক সময় তুষার-রাজ্যের প্রান্তে পৌঁছে গেল ওরা সোহেলকে নিয়ে। বাতাস এতো শীতল যে, সোহেলের ওপর কম্বল চাপাল ফারা। রানার গলায় বাঁধল আরেকটা কম্বলের এক মাথা, দড়ি

দিয়ে কোমরের কাছেও বাঁধল, যাতে পিছন থেকে রানার গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে থাকে কম্বলটা। এবার ফারা ও ঈসা আজনবীও কম্বল জড়িয়ে নিল গায়ে।

আবার এগোল ওরা।

হিম-ঠাণ্ডা কামড় বসাচ্ছে রানার মুখ ও হাতে। মুখ দিয়ে ঘন সাদা ধোঁয়ার মতো বের হচ্ছে নিঃশ্বাস। পায়ের তলায় তুষার শক্ত, শুকনো। বুটের চাপে ভাঙছে কুচুরমুচুর আওয়াজ তুলে। গোড়ালি ছাড়িয়ে যাচ্ছে চূর্ণ তুষার, কখনও ছাড়িয়ে যাচ্ছে কাফ মাসল। রানা চেষ্টা করল ঘোড়াটার তৈরি গর্তের মধ্যে পা দিয়ে এগোতে।

সামনের বরফে চওড়া, অল্প গভীর একটা খাদ মতো দেখতে পেল রানা। বামদিক থেকে ক্রমশ ডানদিকে উঠেছে। অস্বাভাবিক লাগল রানার, বুঝে পেল না কীভাবে এমনটা হলো। খাদের ভিতরে পা রেখে দেখল অসংখ্য ঘোড়ার ক্ষুরের চিহ্ন। এবার বুঝতে পারল, এদিক দিয়েই গেছে আহম্মদ আলীর গোত্র। অনেক দ্রুত যেতে পেরেছে তারা, তার মানে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে আছে। সম্ভবত পাহাড়ের চুড়ো পেরিয়ে নেমে গেছে, ওদিকের তুষারের লাইন ছাড়িয়ে গাছপালার মধ্যে ঢুকে পড়েছে এতক্ষণে।

দ্রুততা এখন খুবই জরুরি, অন্তরের অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করল রানা। এ-পথে এগোলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত এগোতে পারবে ওরা।

গানশিপের আওয়াজ ওর মনে আরেকটা চিন্তার জন্ম দিল। এদিকের এই ব্যবহৃত পথ ধরে গেলে সুবিধে যেমন আছে, তেমনি অসুবিধেও আছে। গানশিপগুলো যখন এই উচ্চতায় পৌঁছে যাবে তখন সার্চলাইটের আলোয় তুষারের ভিতর এই চওড়া খাদ দেখতে কোনও অসুবিধে হবে না পাইলটদের। সেক্ষেত্রে যাদের পথচলায় খাদ তৈরি হয়েছে তাদের ধাওয়া করে

ধরতে এগিয়ে যাবে তারা।

সামনে তাকাল রানা। চাঁদের আলোয় দূরে অনেক ওপরে প্যাশাপাশি দুটো বরফে মোড়া চূড়া দেখতে পেল। ওগুলোর মাঝখানে তুষারে ছাওয়া একটা গিরিপথ আছে। ঈসাকে জিজ্ঞেস করল ও, 'আমরা যদি ওদিক দিয়ে যাই তা হলে বর্ডারে পৌঁছুতে পারব?'

একটু দ্বিধা করল ঈসা আজনবী, তারপর বলল, 'পারব, তবে কঠিন হবে অনেক। সহজ হবে এদিক দিয়ে যাওয়া। সর্দার আহম্মদ আলীও এদিক দিয়ে গেছেন।'

'এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না, গানশিপগুলো ধাওয়া করে আসবে,' বলল রানা।

আপত্তি করল ঈসা আজনবী, 'কিন্তু আমাদের তৈরি চিহ্নও তো দেখতে পাবে ওগুলো।'

'পাবে, কিন্তু যে-পথে অনেকে গেছে সে-পথটাই বেশি গুরুত্ব পাবে তাদের কাছে,' বলল রানা। 'সেদিকেই মনোযোগ বেশি থাকবে তাদের। তারপরও যদি গানশিপগুলো আমাদের খুঁজে বের করেই ফেলে তা হলে আর কিছু করার নেই, দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হবে।'

আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহ নিয়ে ব্যবহৃত পথের দিকে তাকাল ঈসা আজনবী, তারপর ঘোড়া নিয়ে সরতে শুরু করল পর্বতশৃঙ্গ দুটোর দিকে। তুষারে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে তার। হাঁটতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো। স্ট্রেচার বয়ে তার পিছু নিল রানা। আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে ওরা।

তীব্র শীতে কাঁপছে মেরিন। উলের হ্যাট, গ্লাভ্‌স্‌, ওভারকোট পরেও নিয়ন্ত্রণহীন কাঁপুনি থামাতে পারছে না। এখন যদি গরম কিছু পান করা যেত, বা হাঁটাচলা করে রক্ত গরম করা যেত, তা হলে তার কাজটা অনেক সহজ হতো। কিন্তু তা হবার নয়। চূড়ার

অর্ধেক উচ্চতায় পাথুরে একটা তাকের ওপর প্যাকেট করা রেশন দিয়ে তাকে ডিউটিতে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

পাশের মেরিনের কথা ভেবে হিংসে হচ্ছে তার। ব্যাটা স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকে আরামে ঘুমাচ্ছে, মাথাটা গুঁজে দিয়েছে ফ্ল্যাপের তলায়। আরও এক ঘণ্টা, তিক্ত মনে ভাবল শীতার্ত সৈনিক, তারপর আমার ঘুমাবার পালা আসবে, মরবে তখন ওই শালা।

গতকাল দুপুর থেকে এখানে বসে আছে তারা দু'জন। উইঞ্চের সাহায্যে তাদের নামিয়ে দিয়ে গেছে একটা গানশিপ। চূড়া দুটো রেকি করে দেখেছে তারা, তারপর ডানদিকের চূড়ার মাঝামাঝি উচ্চতায় এই পাথুরে তাকটা পছন্দ করেছে ঘাঁটি গাড়বার জন্য। আড়ালে আছে এই তাক, সহজে কারও চোখে পড়বে না। অথচ এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে। পাহাড় টপকে পালাতে চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবে গেরিলারা।

কিন্তু সন্ধ্যা নামবার পর তারা টের পেল, হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় ত্রুটি দেখা দিয়েছে তাদের নাইটভিশন টেলিস্কোপে। ওটার ভিতর দিয়ে তাকালে সবুজ আকৃতিগুলোকে বিকৃত লাগছে। বারবার বরফ জমে যাচ্ছে লেন্সে। একবার তো তীব্র শীতে তার চোখের চারপাশের চামড়া আটকে গিয়েছিল ভিউফাইন্ডারের ধাতুর সঙ্গে। চোখ ছাড়াতে গিয়ে খানিকটা চামড়া রেখে আসতে হয়েছে তাকে ভিউফাইন্ডারের গায়ে। ব্যথাটা অকল্পনীয় ছিল।

কোনও কাজেই আসবে না টেলিস্কোপ।

ডিউটি থেকে বাঁচবার জন্য রেডিও করেছিল সে হেডকোয়ার্টারে, জানিয়েছিল স্কোপ ছাড়া বেশিদূর দেখতে পারবে না তারা পূর্ণ চাঁদের আলোতেও।

'ওখানেই থাকো,' নির্দেশ এসেছে।

কাজেই এখন শীতে থরথর করে কাঁপতে হচ্ছে তাকে। অযথা তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে দুই চূড়ার মাঝখানের তুষারে ছাওয়া

গিরিপথটার দিকে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, কখন ওই স্লিপিং ব্যাগ দখল করে রাখা হারামজাদাকে উঠিয়ে সে ঢুকতে পারবে ওটার গরম ওমের ভিতর।

বিরক্ত মেরিনের উপলব্ধি করতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল যে, নীচের গিরিপথে নড়াচড়া চোখে পড়েছে তার।

সতর্ক হয়ে উঠল সে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল।

একটা লোক। একটা ঘোড়া। একটা স্ট্রেচার। কেউ আছে ওটার ওপর। স্ট্রেচারের পিছনের দিক বয়ে আনছে আরেকটা লোক। তার পিছনে আরেকজন। আরেকটা ঘোড়া।

ঝট করে হাত বাড়াল সে তার টু-ওয়ে রেডিওর দিকে, হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টাল পরক্ষণে। ফিসফিস করে কথা বললেও নিস্তব্ধ রাতের স্থিরতায় তার গলা শুনে ফেলতে পারে শত্রু। সেক্ষেত্রে তাদেরকে বিস্মিত অবস্থায় পাবার সুযোগটা হারাবে সে।

তিনজন মানুষ, আরেকজন আহত। হেডকোয়ার্টার যে বিরাট দলটাকে আশা করেছিল, তারা নয় এরা।

তবে টার্গেট তো অবশ্যই!

স্লিপিং ব্যাগ খুলে সঙ্গী মেরিনের মুখের ওপর গ্লাভস পরা হাতটা চেপে ধরল সে।

চোখ খুলল দ্বিতীয় মেরিন চমকে উঠে বড় বড় চোখ করে তাকাল।

নীরব থাকবার জন্য তাকে ইশারা করল প্রথম মেরিন, তারপর নীচের গিরিখাদের দিকে আঙুল তাক করল।

আস্তে করে মাথা দোলাল দ্বিতীয় মেরিন, বুঝেছে সে।

সতর্কতার সঙ্গে নীচের মানুষগুলোর দিকে তাকাল তারা দু'জন।

প্রথম মেরিন পাশে শোওয়ানো রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল।

*

এরপর কষ্ট কমবে, বড় করে শ্বাস নিল রানা। এরপর তো শুধু নেমে যাওয়া। কিন্তু যদি আবারও কোনও ঢাল বেয়ে উঠতে হয়? আর কতক্ষণ শরীরটা ওর নির্দেশ মানবে জানে না ও। জ্ঞান হারালে সোহেলের কী হবে?

না, জ্ঞান হারানো যাবে না।

হাতল দুটো শক্ত মুঠোয় ধরল রানা, ফারা ব্যান্ডেজ করে দেয়ায় তালুতে এখন আগের চেয়ে ব্যথা কম লাগছে। তুষারের মধ্য দিয়ে পা বাড়িয়ে ভাবল, আর একটু, রানা, তারপরই খাড়া ঢাল শেষ হয়ে যাবে। নীচে নামলে তুষারও থাকবে না, পাথর-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোতে পারবে তখন। ওখানে শীত অনেক কম।

হাঁটো, রানা! খবরদার, হাত থেকে স্ট্রেচারের হাতল দুটো ছেড়ে দিয়ো না।

'ঈসা, আমরা আর কতক্ষণ...'

কথা শুনতে ঘাড় ফিরিয়েছিল ঈসা আজনবী, কাটা কলাগাছের মতো ধড়াস করে পড়ে গেল।

প্রথমে রানা ভাবল পিছলে পড়ে গেছে ঈসা।

তারপরেই শুনতে পেল ও অটোমেটিক রাইফেলের গুলির আওয়াজ। ডানদিকের চূড়ার মাঝামাঝি জায়গা থেকে আগুনের ঝিলিক দেখতে পেল।

দ্রুত স্ট্রেচারটা তুষারের ওপর নামাল রানা। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল সোহেল।

'পালাও, ফারা!' চিৎকার করল রানা, সোহেলের পাশ থেকে রাইফেল- গ্রেনেড লঞ্চারটা তুলে নিল এক ঝটকায়।

ঘোড়া নিয়ে এক পাশে দৌড় দিল ফারা।

দ্বিতীয় স্নাইপার গুলি করল। স্ট্রেচারের কাছ থেকে দ্রুত সরে গেল রানা, আশা করল, ওকে সরতে দেখে স্ট্রেচারের প্রতি স্নাইপারদের আগ্রহ কমবে। ও জানে, যতক্ষণ লোকগুলো

একনাগাড়ে ব্রাশ ফায়ার করছে ততক্ষণ একটা সুযোগ আছে ওর। অটোমেটিক রাইফেলের রিকয়েল অস্ত্রের নলটাকে ওপরে ঠেলে দেবে, লক্ষ্য নষ্ট হবে তাতে। বুলেটগুলো ওর পিছনে গিয়ে তুষারে নাক গুঁজছে। স্নাইপার দু'জন যদি সুইচ সিঙ্গেল-ফায়ারে নিয়ে লক্ষ্যস্থির করে গুলি ছোঁড়ে, তা হলে...

প্রায় কুঁজো হয়ে বসে পড়ল রানা, নিজেকে যতটা পারে ছোট টার্গেট হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইছে। কাঁধে তুলে নিল রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চার। ওর পাশে তুষার ভাঙল বুলেটের আঘাতে।

লক্ষ্যস্থির করল রানা।

স্ট্রেচার সহ ভয় পেয়ে ছুট দিল ঘোড়াটা।

ট্রিগারে চাপ বাড়াল রানা, দাঁতে দাঁত চেপে কাঁধে রিকয়েলের ব্যথা সহ্য করল। চূড়ার মাঝামাঝি উচ্চতায় গিয়ে আঘাত হানল গ্রেনেড, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। আলোর উজ্জ্বল ঝলকানি যেন চোখ ঝলসে দেবে। স্নাইপারদের মাযল ফ্ল্যাশ দেখেছে ও, কিন্তু তাক করতে হয়েছে ওকে তাড়াহুড়োর মধ্যে, উদ্দেশ্য ছিল বিরুদ্ধ পক্ষকে চমকে দেয়া, যেন খানিকক্ষণের জন্য গুলি বন্ধ করে তারা। উদ্দেশ্য সফল হলো ওর, গুলি করছে না কেউ আর ওপর থেকে। কারণটা কী জানে না রানা। গ্রেনেড কাছাকাছি বিস্ফোরিত হয়েছে বলে আড়াল নিতে হয়েছে লোকগুলোকে, না গুলি ছুঁড়ে রাইফেল খালি করে ফেলে এখন রিলোড করছে?

এতটা আশা রানা করতে পারল না যে, লোকগুলোকে শেষ করে দিতে পেরেছে ও।

সোহেলের স্ট্রেচার ছেঁচড়ে নিয়ে এখনও ছুটছে ঘোড়াটা।

গুঙিয়ে উঠল ঈসা আজনবী।

লঞ্চার রিলোড করে চূড়ার মাঝামাঝি জায়গায় তাক করল রানা। ওপর থেকে আগুনের ঝিলিক দেখতে পেয়েই ট্রিগারে চাপ বাড়াল। মাযল ফ্ল্যাশ যেখানে দেখেছে ও, তার ঠিক নীচেই

আঘাত হানল গ্রেনেড। চূড়ার ওপর থেকে খসে পড়তে শুরু করল আলগা তুষার।

কী ঘটছে চট্ করে বুঝে ফেলল রানা। স্নাইপারদের মনোযোগ ধরে রাখতে ডানদিকে ডাইভ দিল ও। কয়েক গড়ান দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসেই দ্রুত হাতে আবার রিলোড করে ফেলল তৃতীয় গ্রেনেড। তাক করেই প্রজেক্টাইলটা ছুঁড়ল।

মাযল ফ্ল্যাশের দিকে গ্রেনেড ছোঁড়েনি ও, ওর লক্ষ্য ছিল আরও ওপরে, তুষারের পুরু দেয়াল।

পরিণতি দেখতে গিয়ে বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় করল না রানা, ঝেড়ে দৌড় দিল গিরিপথের দিকে। সামনে এখনও সোহেলের স্ট্রেচার টেনে নিয়ে ছুটছে ঘোড়াটা। ফারা চলে গেছে গিরিপথের শেষে। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে নাড়ল মেয়েটা ছুটন্ত জন্তুটাকে থামানোর চেষ্টায়। এক পাশে সরে যেতে চাইল ভীত ঘোড়া, ফারা ওটার রাশ ধরতে চেষ্টা করায় পাশ থেকে ধাক্কা দিল। বুকে জোর আঘাত পেয়ে হাঁ হয়ে গেল ফারার মুখ, এক পাক ঘুরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তুষারের ওপর।

ফাটল গ্রেনেডটা। গম্ভীর একটা গর্জন শুরু হলো পাহাড়ে। তুষারের বিরাট একটা উঁচু দেয়াল খসে পড়তে শুরু করেছে। পড়ছে আরেকটা বড় স্তূপের ওপর। দুটো মিলে বিশাল একটা স্রোত তৈরি হলো। নেমে আসছে। সঙ্গে করে নিয়ে আসছে নীচের সমস্ত তুষার।

ছুটছে রানা, দেখতে পেল, গিরিপথের শেষ মাথা ছাড়িয়ে স্ট্রেচার টেনে নীচের দিকে দৌড়াচ্ছে ঘোড়াটা।

সোহেল!

রানা বলতে পারবে না ও মনে মনে চিৎকার করেছে, না মুখে। সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করলেও শুনতে পেত না কেউ। তুষারপ্রপাতের গুরুগম্ভীর মেঘগর্জনের মতো আওয়াজ অন্য সব শব্দ তলিয়ে দিয়েছে।

ঈসা আজনবীর কাছে পৌঁছে গেছে রানা। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে আফগান, ঘাড় থেকে রক্ত নামছে তার।

এক হাতে ঈসা আজনবীর কোমর জড়িয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল রানা, টান দিল কোমর ধরে। টলতে টলতে এগোল ঈসা। ওপর থেকে নেমে আসা তুষারপ্রপাত বিকট আওয়াজ করছে।

তৃতীয় গ্রেনেডটা ফাটবার পর স্নাইপারদের রাইফেলের মাযল ফ্ল্যাশ থেমে গেছে। আর কোনও বুলেট ছুটে আসছে না। জীবনের শেষ মুহূর্তে লোকগুলো নিশ্চয়ই তীব্র আতঙ্ক নিয়ে ওপরে তাকিয়েছিল, দেখছিল কীভাবে নিশ্চিত, বরফ-শীতল মৃত্যু ধেয়ে আসছে তাদের দিকে।

পাথুরে কার্নিশ ছাপিয়ে অনেকটা নেমে এসেছে তুষারের ঢেউ। পাথর তলিয়ে দিয়ে নামছে এখনও, গ্র্যানিট ভেঙে চুরচুর করে দিচ্ছে, সব সহ ছুটছে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো।

ঈসা নিজেকে সামলে নিয়েছে, ছুটবার গতি বাড়ল তার। কিন্তু তারপরও দেরি হয়ে গেছে ওদের, গিরিপথ ছেয়ে ফেলল তুষারের ঢেউ, পাশ থেকে ভয়ঙ্কর জোরে ধাক্কা মেরে প্রায় তলিয়ে দিল দু'জনকে। ওদিকের চুড়োর গায়ে আঘাত হেনে তুষারের কুয়াশা উঠল চারপাশে। ডুবে গেল রানা ও ঈসা।

কতক্ষণ পার হয়েছে কে জানে, গর্জনটা দূরে সরে যেতে শুনছে এখনও রানা। আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আওয়াজ। থেমে গেল। মুখের ওপর জমে থাকা তুষার খামচি মেরে সরাল রানা, উঠে বসতে চেষ্টা করল, এখনও ঈসা আজনবীকে ছাড়েনি। উঠে বসতে পেরে অবাক হলো ও, তারপর বুঝতে পারল, তুষারের ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে গেছে ওরা ডুবে যাবার বদলে। সাত ইঞ্চি তুষারের নীচে চাপা পড়েছিল দু'জন। 'সোহেল!' শ্বাসের ফাঁকে বলল রানা। এক টানে ঈসাকে তুলে বসিয়ে দিল। দেখল, ঘাড়ের পেশীতে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে স্নাইপারের বুলেট, একটুর জন্য বেঁচে গেছে আফগান। ওদের পাশে এসে দাঁড়াল ফারা

রাইনার। পাঁজরের ব্যথায় মুখ কুঁচকে আছে। 'কী অবস্থা?' রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'মরিনি আমরা,' শুকনো গলায় জবাবটা দিল ঈসা আঙ্গনবী। 'আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত।'

ক্ষতটা দেখল ফারা। 'ভাগ্যটা সত্যিই ভাল আপনার। শিরা ছিঁড়লে এখানে চিকিৎসার অভাবে রক্তক্ষরণে মরতেন। ব্যান্ডেজ করে দিলে কয়েকদিনের মধ্যে শুকিয়ে যেত চেরা জায়গাটা। কিন্তু আমার ব্যাগটা...'

'আমি আসছি,' উঠে দাঁড়াল রানা। মাথা ঘুরে ওঠায় তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, দু'-সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিল, রাইফেল-গ্রেনেড রঞ্চারটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ছুটল গিরিপথের ওপাশের উপত্যকার দিকে। একটু পরেই স্ট্রেচারের দাগ খুঁজে পেল। বুকের ভিতর শঙ্কা দানা বাঁধছে ওর। ভয় পেয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে ছুটে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়েনি তো ঘোড়াটা? তা হলে...

ঢালের পঞ্চাশ গজ নীচে স্ট্রেচারটা খুঁজে পেল রানা। প্রাণপণে দৌড়ে চলে গেল ওটার কাছে। স্যাডলের গর্ত দুটো থেকে বের হয়ে গেছে স্ট্রেচারের ওপাশের খুঁটি, ঘোড়াটাকে কোথাও দেখা গেল না।

পড়বার সময় উল্টে গেছে স্ট্রেচার। তার মানে ওটার নীচে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সোহেল। তুষারে নাক গুঁজে গিয়ে যদি শ্বাস আটকে...

দু'হাতে স্ট্রেচারটা সোজা করল রানা, অজান্তেই শ্বাস চেপে রেখেছে। সোহেলকে স্ট্রেচারের সঙ্গে বেঁধে রাখা দড়িটা ছেঁড়েনি। জমাট বাঁধতে শুরু করা তুষারকণায় মুখ-বুক প্রায় ঢেকে গেছে সোহেলের। ডান কাঁধের ওপর তুষারকণাগুলো লাল রং ধরেছে! রানা আতঙ্কের সঙ্গে চিন্তা করল, আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে ওর!

সোহেলের চোখের পাতা বার কয়েক কেঁপে খুলে যেতেই

তুষারের কণা ঝরে পড়ল। ওর নাক-মুখের ওপর থেকে তুষার সরাল রানা ব্যস্ত হাতে। 'সোহেল! জেগে থাক্! আর একটু! নীচে আবহওয়া গরম, ওখানে ভাল লাগবে তোর।'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ফিরতি পথে ছুটল রানা। বামে একটা ছায়া নড়তে দেখল। একটা ঘোড়া! ঈসা আজনবীরটা। খুব ধীরে, শান্ত পায়ে ওটার দিকে এগোল রানা, দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ভয় পেয়ে ছুট না দেয় ওটা। দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখল ঘোড়া, চিনতে পেরেছে মনে হয়, সরল না। ওটার রাশ ধরে ফেলে ফিরে এলো রানা স্ট্রেচারের পাশে। স্যাডলের দু'পাশে ফুটো করতে মিনিট তিনেক লাগল ও । ততক্ষণে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ঈসা আজনবী ও ফারা।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ডাক্তারি ব্যাগ নামিয়ে গজ বের করে ঈসার ঘাড়ে ব্যান্ডেজ করে দিল ফারা।

এরপর ঈসার সাহায্য নিয়ে স্ট্রেচারটা তুলে আবার ঘোড়ার পিছনে আটকাল রানা, স্ট্রেচারে লম্বালম্বি করে রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চারটা রেখে কাঁধে তুলে নিল এদিকের দু' ফুট লম্বা খুঁটি দুটো।

রওনা হলো ওরা।

টর্চের আলো মুখের ওপর পড়ায় চোখ মেলল কর্নেল হেনরি মর্গান। কে যেন তার কাঁধ ধরে জোরে জোরে নাড়ছে। ঘুমের ঘোরে মনে মনে লোকটার বাপ-মা তুলে গালি দিল সে।

'ক্বী!' খেঁকিয়ে উঠল। 'কী হয়েছে?'

'সার, আপনি অর্ডার দিয়েছিলেন: আমাদের সার্ভেইলেন্স টিম কোনও অ্যাক্টিভিটি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানাতে হবে।'

আড়মোড়া ভেঙে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে বসল কর্নেল মর্গান, হাই চাপল। একটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারের ট্রুপ কম্পার্টমেন্টে নিরাপদ আর্মারের ভিতরে ঘুমিয়েছিল সে। 'কালা কুত্তাগুলোকে দেখা গেছে?'

'না, ঠিক তা নয়, সার,' একটু দ্বিধা করে বলল কমিউনিকেশন্স অফিসার।

চিড়িক করে মেজাজটা আরও কয়েক ডিগ্রি চড়ে গেল হেনরি মর্গানের। 'তা হলে? এর মানে কী? এভাবে আমাকে ঘুম থেকে তুলে...'

'একটা সার্ভেইলেন্স টিম নিয়ম মতো প্রতিঘণ্টার রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে, সার। রেডিওতে চেষ্টা করেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি আমি। পুবের পাহাড়ে পোস্ট ছিল তাদের। গানশিপগুলো রিপোর্ট করেছে ওদিকে ঘোড়ার তৈরি বড় একটা ট্রেইল দেখা গেছে। তুষারের ওপর দিয়ে একটা গিরিপথের দিকে গেছে ওই ট্রেইল।'

'আচ্ছা!' বড় করে দম নিল কর্নেল। 'জায়গাটা ম্যাপে দেখাও আমাকে।'

ক্রু-কম্পার্টমেন্ট থেকে ম্যাপ নিয়ে ট্রুপ-কম্পার্টমেন্টে ফিরল কমিউনিকেশন্স অফিসার, ম্যাপটার ভাঁজ খুলে মেঝেতে রেখে এক জায়গায় তর্জনী ঠুকল। 'এই যে, এখানে। এই পাসটায় সার্ভেইলেন্স টিম ওয়াচ রাখছিল। এদিকে, আধ কিলোমিটার ডানে এই পাসটায় তুষারের ওপরে ঘোড়ার ট্র্যাক দেখেছে আমাদের পাইলট।'

গভীর মনোযোগে ম্যাপ দেখল কর্নেল মর্গান। 'দুটো পাস একই উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে।' সরু, লম্বাটে উপত্যকায় আঙুল বোলাল সে। 'পুবে গেছে উপত্যকা। ওটার ওপারে জঙ্গল পেরোলেই তো পাকিস্তান।' আপন মনে নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল সে, '...কিন্তু তা হলে কুত্তাগুলো যাচ্ছে কোথায়?'

'পাকিস্তান, সার,' সাহস করে বলল কমিউনিকেশন্স অফিসার।

আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার থেকে বের হবার জন্য কুঁজো হয়ে দাঁড়াল হেনরি মর্গান। 'গানশিপগুলোকে রেডিও করো।

তিনভাগের একভাগ গানশিপ যেন এক্ষুনি এখানে চলে আসে। আর্মার্ড ক্যারিয়ারের ক্রুদের জানাও এয়ারলিফটের জন্যে যেন জলদি তৈরি হয়ে নেয় তারা। ওই উপত্যকা। ওই জঙ্গল। ওখানে যদি সময় মতো পৌঁছতে পারি, তা হলে পিষে মারতে পারব আমি আফগান কুত্তাগুলোকে!'

ঠিক করে ফেলল সে, মেজর ডুরেলকে সঙ্গে নেবে না, এই নিশ্চিত বিজয়ের গৌরবের ভাগীদার হতে দেবে না সে কাপুরুষটাকে কিছুতেই। ডুরেল যেরকম বাড়াবাড়ি করছে, তাতে পরে রিপোর্ট করা যাবে: অর্ডার দিয়েও তাকে সঙ্গে নিতে পারেনি সে। কোর্ট-মার্শাল হবে হারামিটার।

ষোলো

উপত্যকা সরু হয়ে গেছে দু'পাশের টিলার কারণে। টিলার ওপরে জন্মেছে ঘন জঙ্গল, উপত্যকার মেঝেতেও থাবা বিস্তার করেছে। আবহাওয়া এখানে আরামদায়ক। রানার আড়ষ্ট পেশীগুলো আগের চেয়ে কম ব্যথা করছে। তার কারণও আছে, ওর কোনও আপত্তি কানে তোলেনি ঈসা আজনবী, সোহেলের স্ট্রেচার কেড়ে নিয়েছে ওর কাছ থেকে। সে-ই বহন করছে এখন এদিকের প্রান্ত।

'আর কতদূর?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

আন্তরিক হাসি দেখা দিল ঈসা আজনবীর চেহারায়। 'মাইল দুয়েক। পথ হারানোর আর কোনও সম্ভাবনা নেই। সামনে আরও চেপে আসবে জঙ্গল, মাঝখানের পথটা বাঁক নিয়ে মিশবে উপত্যকায়। সরু উপত্যকাটা পার হলে সিকি মাইল চওড়া জঙ্গল –

ওটার পরেই পাকিস্তান। ওখানে সড়ক আছে, যানবাহনের ব্যবস্থা করা যাবে। জনাব সোহেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেও অসুবিধে হবে না। সীমান্তের কাছেই আমার পরিচিত এক আফগান ডাক্তার আছেন।'

সকালটা সত্যি চমৎকার। পরিষ্কার আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। ফুরফুরে তাজা হাওয়া বইছে। পিছনের পাহাড়ের দিক থেকে অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে গানশিপের ইঞ্জিনের গুঞ্জন। অনেক দূরে আছে ওগুলো। জঙ্গলের গাছে গাছে মিষ্টি সুরে ডাকছে হাজারো পাখি। একটা কাঠবিড়ালিকে দু'হাতে ধরে বাদাম ভেঙে খেতে দেখল রানা। ওর দিকে একবার তাকিয়ে লেজ দুলিয়ে পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওটা। চারপাশে সবকিছু যেন মুড়ে রেখেছে প্রশান্তির একটা মখমল চাদর। ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। তা হলে ওর মনের ভেতরটা এরকম খচখচ করছে কেন? বারবার কেন মনে হচ্ছে আমেরিকান আর্মি এতো সহজে হাল ছেড়ে দেবে না? পাকিস্তানের দিকে আফগানরা আসবে না তার নিশ্চয়তা কী? নিশ্চয়ই এদিকেও চোখ রেখেছে ইউএস ফোর্স। না রেখেই পারে না।

ঈসাকে থামতে বলল ও, কিছু খেয়ে নিক মানুষটা, দরকারী কিছু প্রশ্নেরও জবাব জানা দরকার ওর।

স্ট্রেচার নামাল ঈসা, পানি খাবার ফাঁকে রানার প্রশ্নের জবাবে তাকে বিস্তারিত জানাতে হলো সামনের পথের বর্ণনা।

'তা হলে আর দুশো গজ দূরের ওই বাঁকের পর থেকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে সরু পথ, মিশেছে উপত্যকায়, এই তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা দোলাল ঈসা।

'ওই পথ ছাড়া আর কোনও পথ নেই এদিকে পাকিস্তানে যাবার?'

রুটিতে কামড় দিল ঈসা। 'কেন?'

তার প্রশ্নের জবাব দিল না রানা। 'আছে?'

'আছে। অনেক ঘুরপথ, যেতে হবে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। কয়েকদিন লাগবে যেতে। পথে বড় কয়েকটা টিলাও পড়বে, ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে... আমি অনেক সহজ পথে নিয়ে এসেছি আপনাকে।'

স্ট্রেচারের ওপর থেকে ন্যাপস্যাকটা তুলে নিল রানা, কাঁধে ঝোলাল রাইফেল-গ্রেনেড লঞ্চার। 'যে-পথটার কথা বললেন, সেই ঘুরপথে যেতে পারলেই ভাল হতো। কিন্তু হাতে সময় নেই, চিকিৎসা দরকার ওর। আমার বন্ধুকে নিয়ে পেছনে আসবেন আপনি। জঙ্গলে ঢুকে অপেক্ষা করবেন, আমি না বললে জঙ্গল থেকে বের হবেন না।'

ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে গেল ঈসা আজনবী, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কেন?'

'কারণ, আমার ধারণা, সামনে ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় থাকবে আমেরিকান আর্মি,' ন্যাপস্যাক পিঠে ঝুলিয়ে নিল রানা। 'আমি যাচ্ছি আমার ধারণা সত্যি কি না সেটা যাচাই করতে। যদি সত্যি হয়, সাধ্যমতো চেষ্টা করব আমি ওদের দেরি করিয়ে দিতে। আপনি সেই সুযোগে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরে যাবেন, যত কষ্টই হোক, ঘুরপথে চলে যাবেন পাকিস্তানে। আমি যদি পাকিস্তানে পৌঁছুতে পারি তা হলে আপনার পরিচিত সেই আফগান ডাক্তারকে খুঁজে বের করে দেখা করব আপনাদের সঙ্গে। ওষুধ হাতের কাছে পেলে ফারাও সাহায্য করতে পারবে তখন।'

'কিন্তু... আপনি একা...' উঠে দাঁড়িয়েছে ঈসা আজনবী, চেহারায় দ্বিধা ও উদ্বেগ।

ফারা বলল, 'ধরো তোমার কথাই সত্যি, রানা। কিন্তু একা তুমি কী করতে পারবে আমেরিকান আর্মির বিরুদ্ধে?'

'দেরি করিয়ে দিতে পারব,' বলল রানা।

'তারপর তো মারা যাবে, রানা!' বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওকে ফারা। মানুষটাকে বোঝা যায় না কেন! 'তোমার বন্ধুর

জীবন তোমার কাছে এতই দামি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। তোমাদের দুজনের জীবনও।' নির্মল হাসি হাসল ফারার চোখে চেয়ে। হাঁ হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ। বুঝতে পেরেছে, একবিন্দু মিথ্যে নেই রানার কথায়। একটুও বাড়িয়ে বলছে না বাংলাদেশের এই দুর্দান্ত, দুঃসাহসী মানুষটা।

এখন রানার মন জোর দিয়ে বলছে, সামনে অপেক্ষায় আছে ইউএস ফোর্স। নিজেকে তাদের কমান্ডার হিসেবে কল্পনা করল ও। ঈসা জায়গাটার যেরকম বর্ণনা দিয়েছে, তাতে উপত্যকার ওপাশের জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়ত ও, উপত্যকায়, খোলা জায়গায় গেরিলাদের বেরিয়ে আসতে দিত, তারপর চালাত ঝটিকা আক্রমণ। অতি সাধারণ কিন্তু কার্যকর প্ল্যান, এই পরিস্থিতিতে যে-কোনও আর্মি অফিসারই তাই করবে। 'ভয় পেয়ো না, বোকার মত আগেই হামলা করতে যাব না,' ফারার শুকনো মুখের দিকে তাকাল রানা। 'ওদের দেখতে পেলেই পিছিয়ে আসব। তারপর কী হবে জানি না।'

রানার চোখে বেগুনী দুটো মায়াবী চোখ রাখল ফারা, তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, যেন রানার অন্তর পড়ছে। তারপর নরম গলায় বলল, 'তুমি হার মানতে শেখোনি, রানা। জানি মানা করলে শুনবে না, কাজেই মানা করব না। যাও, যেতে চাইছ যখন। ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্যে প্রার্থনা করব আমি। আশা করি, খাঁটি একজন সত্যিকার মানুষকে সাহায্য করবেন তিনি।'

'রহমতের মালিক আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করব আমি আপনার জন্যে,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ঈসা, চিরবিষণ্ন চোখ দুটো ছলছল করছে তার। 'সত্যি যদি সাদা পিশাচরা না থাকে, তা হলে একশো বিশ রাকাত নফল নামায পড়ব।'

'ঠিক আছে, বাঁক থেকে একশো গজ আগে জঙ্গলে ঢুকে অপেক্ষা করবেন,' ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের বাঁকের দিকে পা বাড়াল রানা। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, স্ট্রেচার তুলে নিয়ে ধীর

গতিতে এগোচ্ছে ঈসা আজনবী। তার পাশে পাশে হাঁটছে ফারা।

এগোবার গতি বাড়াল রানা। একটু পরেই জঙ্গলে ঢুকতে হবে ওকে, সামনের এলাকাটা রেকি করতে হবে, তারপর অবশিষ্ট প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ চার্জগুলো বসাবে ও। এগিয়ে আসার প্রলোভন দেখাবে ওদের গ্রেনেড ছুঁড়ে, তারপর পিছিয়ে রিমোট কন্ট্রোল্ড ডেটোনেশন ঘটাবে উপত্যকা থেকে জঙ্গলে ঢুকবার পথে। যদি আমেরিকান সৈন্য থেকে থাকে, এবং আছে বলেই ওর ধারণা, তা হলে দেরি করিয়ে দিতে হবে তাদের যতটা সম্ভব। ততক্ষণে অনেক সরে যেতে পারবে ঈসা সোহেলকে নিয়ে।

বাঁকটা আর বড়জোর দশ গজ দূরে। জঙ্গলে ঢুকল রানা, গাছের ফাঁক দিয়ে এগোল। জঙ্গলের কিনারায় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখ রাখল সামনে। ফাঁকা পড়ে আছে উপত্যকা। ওপাশের জঙ্গলে কোনও নড়াচড়া নেই। তা হলে আওয়াজটা আসছে কোত্থেকে?

হাতের ডানদিকে তাকাল রানা। পঁচিশ-তিরিশটা ঘোড়া বেরিয়ে এসেছে ওদিকের একটা গিরিপথ থেকে। আরও ঘোড়সওয়ার আসছে। জঙ্গলের দিকে এগোচ্ছে তারা, পাকিস্তান সীমান্তের দিকে যাচ্ছে। ইউনূস মোসাদ্দেক ও আলফাজ কুশেকে চিনতে পারল রানা স্পষ্ট। দলের আগে আগে পাশাপাশি যাচ্ছে দু'জন। নিজেদের মধ্যে কী যেন বলছে।

ঠিক তখনই খড়খড় আওয়াজে স্টার্ট নিল কয়েকটা ইঞ্জিন। আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারের ডিজেল ইঞ্জিনের বিশ্রী আওয়াজ চিনতে দেরি হলো না রানার।

চমকে ওদিকে তাকাল গেরিলারা, কাঁধ থেকে রাইফেল নামাতে শুরু করেছে।

জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো তিনটে আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার। এতোই কাছে, ওগুলোর কামানের খাটো নল ভীতিকর লাগল দেখতে। প্রথমটার কামানের নলের ডগায় ধোঁয়া দেখল

রানা। গোলাটা আলফাজ কুশের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পিছনের কয়েকজন আফগান ঘোড়সওয়ারকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। কড়-কড়-কড়-কড় করে গর্জে উঠল আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারটার মেশিনগান। চার-পাঁচজন আফগান ঘোড়সওয়ার কচুকাটা হয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা, অসহায় বোধ করছে। চার্জগুলো বসানো হয়নি ওর। হলেও কোনও লাভ হতো না। আফগানরা জানত না এদিকের জংলা পথে পিছিয়ে গেলে ধাওয়া করতে গিয়ে বিস্ফোরণে উড়ে যাবে আগ্রাসী সাঁজোয়া বহর। কাঁধ থেকে গ্রেনেড লঞ্চারটা নামাল ও। ৪০ এমএম গ্রেনেড দিয়ে এপিসির আর্মারে সামান্য একটু টোল ফেলতে পারবে ও বড়জোর। তবে...

সামনের আর্মার্ড ক্যারিয়ারের বামদিকের প্রথম চাকায় লক্ষ্যস্থির করল রানা, তারপর চাপ দিল ট্রিগারে।

গ্রেনেড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ওদিকের দু'তিনটে চাকা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বামদিকে ছুটতে শুরু করল আর্মার্ড ক্যারিয়ার, ইঞ্জিন চালু থাকলে বৃত্তাকারে ঘুরতে হবে ওটাকে এখন, সামনে এগোতে পারবে না।

অন্য ক্যারিয়ারগুলোর টারেটে দাঁড়ানো গানাররা জঙ্গলের ভিতর থেকে গ্রেনেড লঞ্চারের ছিটকে বের হওয়া ধোঁয়া দেখেছে, ওগুলোর দুটো কামানের নলই রানার গোপন অবস্থানের দিকে ঘুরল। লাফিয়ে গাছের আড়াল নিলেও আগামী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছাতু হয়ে যাবে রানা।

ঠিক তখনই বাম পাশের জঙ্গল থেকে হুউইশ্ আওয়াজ করে কী যেন ছুটে গেল। এতোই দ্রুত গেল যে ওটার আকৃতি বোঝা গেল না। তারপর আবার একই আওয়াজ হলো। আবার।

অক্ষত দুটো আর্মার্ড ক্যারিয়ারই রকেট বিস্ফোরণে গোল দুটো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। গতির তাড়নায় খানিকটা এগিয়ে থামল জ্বলন্ত আর্মার্ড ক্যারিয়ারগুলো।

বামদিকের জঙ্গল থেকে অটোমেটিক রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে কারা এগিয়ে আসছে? সর্দার আহম্মদ আলীর দল? আপন মনে মাথা নাড়ল রানা। গুলি-বর্ষণের আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে অস্ত্রগুলোর ক্যালিবার ৭.৬৫, বাংলাদেশ আর্মির স্ট্যান্ডার্ড ইশু।

কারা ওরা?

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইউএস মেরিনদের একটা দল, সংখ্যায় বিশ-পঁচিশজন। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে বাড়ল তারা। ঘোড়া থেকে পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে গেরিলারা। আরও কয়েকজন আফগান যোদ্ধা ঘোড়া ছুটিয়ে ঢুকল উপত্যকায়, লাফ দিয়ে জিন থেকে নেমে অংশ নিল লড়াইয়ে। তাদের আগে আগে সর্দার আহম্মদ আলীকে দেখতে পেল রানা। ছুটে সামনে বাড়ছে তারা, প্রাচীন এনফিল্ডের গুলি ফুরিয়ে গেলে সশস্ত্র মেরিনদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করবে।

আহত তেলাপোকার মতো ক্রমাগত ঘুরছে ক্ষতিগ্রস্ত আর্মার্ড ক্যারিয়ারটা, থেমে দাঁড়াল হঠাৎ। টারেট ঘোরানো যায় বলে স্বদেশি সৈনিকদের সাহায্য করতে কামানের নল আফগানদের দিকে ফেরাতে শুরু করল ওটার গানার।

আবার গ্রেনেড ভরল রানা লঞ্চারে, টারেটে লক্ষ্যস্থির করেই ফায়ার করল। লক্ষ্যে আঘাত হেনে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। শকওয়েভের ধাক্কায় কয়েক টুকরো হয়ে গেল গানার, কিন্তু টারেটের কোনও ক্ষতি হলো না।

দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে দিশে হারাল ইউএস মেরিনরা। তাদের ডানদিক থেকে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে পনেরো-বিশজন নারী-পুরুষ। মরণের ভয় নেই যেন তাদের। থামছে, অস্ত্র তাক করছে, গুলি ছুঁড়ছে, আগে বাড়ছে বা পাশে সরছে, তারপর আবার লক্ষ্যস্থির করছে।

আফগানরা অযাচিত সাহায্য পেয়ে বিপুল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেরিনদের ওপর। বেশি ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে তাদেরই, কিন্তু

তোয়াক্কা নেই কোনও। যাদের এনফিল্ড রাইফেলের ডগায় বেয়োনেট আছে, তারা কাছাকাছি পৌঁছে বেয়োনেট চার্জ করে গেঁথে ফেলছে শত্রুকে।

এক নাগাড়ে গুলি করছে রানা মেরিনদের লক্ষ্য করে। রাইফেলটা খালি হবার আগে পাঁচজনকে ফেলে দিতে পারল ও। মুখ কুঁচকে গেল ওর ইউনূস মোসাদ্দেকের গোত্রের কসাই হারিস বিন বিল্লালের জবাই দেখে, ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা, ম্যাগাযিনে গুলি ভরতে শুরু করল।

মিনিট পাঁচেক স্থায়ী হলো খণ্ডযুদ্ধ। তারপর শেষ মেরিনও খতম হয়ে গেল আফগান ও অচেনা যোদ্ধাদের গুলিতে।

গুলির শব্দ থেমে যাবার পর চাকা ফাটা আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারের পিছন থেকে নামল ইউএস আর্মির দু'জন অফিসার। একজনের ইউনিফর্মে কর্নেলের ইনসিগনিয়া, আরেকজনের সার্জেন্টের। একবার দেখল তারা অগ্রসরমান আফগানদের, তারপর ঘুরেই ছুট দিল জঙ্গলের দিকে। যেন ডানা গজিয়েছে, উড়ে চলেছে তারা। তাদের পিছনে আরপিজি-৭-এর আঘাতে বিধ্বস্ত হলো আর্মার্ড ক্যারিয়ার।

প্রাণপণে ছুটছে দুই আমেরিকান, কিন্তু ঘোড়ার গতি মানুষের চেয়ে বেশি। কয়েকজন আফগান ঘোড়া দাবড়াল তাদের পিছনে। পায়ে আহম্মদ আলীর গুলি খেয়ে ল্যাংচাতে শুরু করল কর্নেল। অন্যান্য আফগানদের আগে তার কাছে পৌঁছে গেল হারিস বিন বিল্লাল। ঘোড়ার ওপর থেকে বাতাস কেটে গায়ের জোরে তলোয়ার চালাল সে। অভ্যস্ত হাত, নিয়মিত শান দেয়া ক্ষুরধার তলোয়ার হেনরি মর্গানের ঘাড়ের পেশী কেটে হাড় কাটল, তারপর মাংস-চামড়া ও উইন্ডপাইপ কেটে বেরিয়ে গেল ওপাশে।

কাটা মুণ্ডুটা ধুপ করে পড়ল তার পায়ের কাছে, তখনও কবন্ধ-কাটা দেহটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। উষ্ণ প্রস্রবণের মতো ওপরে ছিটকে উঠল রক্তের ধারা। মুণ্ডুর ওপর উপুড় হয়ে পড়ল দেহটা,

ঢেকে দিল ওটাকে। ঠিক যেন ফুটবলের গোলকীপার ডাইভ দিয়ে তার বুকে আগলে নিল অতিকাঙ্ক্ষিত বল।

পিছনে তাকিয়ে অন্তরাত্মা উড়ে গেল সার্জেন্ট লোকটার। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর হাত তুলল সে। সারেন্ডার বলবার সময় পেল না, হারিস বিন বিল্লালের তলোয়ারের কোপে বামহাত কাটা পড়ল, উইন্ডপাইপ কাটা গেল তারপর। ধড়াস করে মাটিতে পড়ল সে, গলাকাটা মুরগির মত লাফ-ঝাঁপ শুরু করল। ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে, সেই সঙ্গে গলা দিয়ে গলগল বেরোচ্ছে রক্ত।

বিজয়-হুঙ্কার ছাড়ল আফগান যোদ্ধারা। কয়েকজন ছুটে গেল পোড়া আর্মার্ড ক্যারিয়ারগুলোর দিকে। অন্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল শত্রুপক্ষের অস্ত্র সংগ্রহ করতে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো রানা, এতোই ক্লান্তি বোধ করছে যে ইচ্ছে হলো মাটিতে শুয়ে পড়ে। তারপরও কৌতূহলী চোখে বামদিকে তাকাল অপ্রত্যাশিত সাহায্যকারীদের দেখতে। চোখ কপালে উঠল ওর। ভাবল, শেষে মাথাটা খারাপই হয়ে গেল আমার?

সলীল, জাহেদ, সোহানা, রূপা, মিমি, তৌহিদ, হাকিম, আবির, ফরহাদ, আরিফ, হাসান... বিসিআই-এর কে নেই! সদ্য ট্রেইনিং শেষে নতুন জয়েন করা আবিদ, রূপম, তুহীন – সবাইকে দেখতে পেল রানা। আছে রানা এজেন্সির পেশোয়ার শাখার আসাদ রেযা ও তার সহকারীরাও!

কয়েকজনের হাতে বাযুকা। কয়েকজনের হাতে আরপিজি-৭। চাইনিজ অ্যাসল্ট রাইফেল রয়েছে প্রত্যেকের কাছে।

না, এ অসম্ভব! এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রানা। মাথা আরও বেশি ঘুরে উঠল। ভুল দেখছে ও। মাথা ঘুরছে তো, আসলে তাই...

টলে উঠল রানা, কাত হয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর।

কারা যেন ছুটে আসছে।

কারা?

পায়ের আওয়াজ আবছা।

দু'জন ওকে শক্ত হাতে ধরে দাঁড় করাল। অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওকে।

জাহেদ-সলীলের উদ্বিগ্ন চেহারা দেখতে পেল রানা ঝাপসা চোখে। তা হলে তো... 'কী করে? বিরাট বর্ডার... আমি কোন্‌দিক দিয়ে...' আর কিছু বলতে পারল না ও। চোখের দৃষ্টি কিছুটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। আশার জোয়ার জাগছে মনে। সোহেল বাঁচবে। ও পেরেছে! ও পেরেছে!

সামনে ঘোড়া নিয়ে স্ট্রেচার বয়ে বাঁক ঘুরে উপত্যকায় বেরিয়ে এলো ঈসা আজনবী। তার পিছনে হাঁটছে ফারা রেইনারে। তাদেরকে দেখে হই-হই করে উঠল বিসিআই-এর সবাই। সোহেলকে দেখতে পেয়েছে ওরা।

সোহানা, রূপা সহ ও আরও কয়েকজন ছুটে গিয়ে স্ট্রেচারটার ভার নিল ঈসা আজনবীর কাছ থেকে। রানার পাশে এসে স্ট্রেচার থামাল ওরা।

সোহানার প্রশ্নের জবাবে নিজের পরিচয় জানাল ফারা রেইনার, তারপর স্ট্রেচারের পাশে দাঁড়িয়ে সোহেলের বর্তমান অবস্থা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখল।

'বাঁচবে তো?' জিজ্ঞেস করল কয়েকটা উদ্বিগ্ন গলা।

আস্তে আস্তে মাথা দোলাল ফারা। 'আগের চেয়ে সুস্থ।'

'আমাদেরকে তোরা কী করে...' কথা শেষ করতে পারল না বিস্মিত রানা।

ওর মুখের কথা কেড়ে নিল সলীল, উদাস গলায় বলল, 'তাবিজ-কবচের জোরে রে, দোস্ত, তাবিজ-কবচের জোরে।'

তাবিজ-কবচ?

হাত দিয়ে রূপার চেইনে ঝুলন্ত দস্তার গোল তাবিজটা স্পর্শ করল রানা।

'হ্যাঁ, ওটাই; ধরেছিস ঠিক,' বলল সলীল। 'ডক্টর শামশের আলীর তৈরি মিডিয়াম রেঞ্জ ট্র্যান্সমিটিং ডিভাইস, প্রতি মিনিটে দু'বার করে ব্লিপ পাঠায়। সোহানা ওটা গছিয়ে দিয়ে এসেছিল তোর আদরের বুড়ি রাঙার মা'র হাতে।'

'দেরি না করে চল্, বুড়ো-বাঘ অস্থির হয়ে আছে,' তাগাদা দিল জাহেদ। 'তোদের দেরি দেখলে হয়তো হালুম করে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে বুড়ো, সোহেলকে বের করে আনতে গিয়ে শেষে তুই যদি আবার...'

'বুড়ো?' ভুল শুনেছে বলে মনে হলো রানার।

'বুড়ো?' দুর্বল গলায় রানার কথার প্রতিধ্বনি তুলল সোহেল। 'কোথায়?'

'তো আর কে?' বলল রূপা, মুচকি হাসল। কপট রাগ প্রকাশ পেল ওর গলায়: 'ওদিকের টিলার ওপর অপেক্ষা করছেন। সোহানাকে নালিশ করেছেন উনি, রাতে ঘুমাতে পারেন না, দুঃস্বপ্ন দেখে বারবার জেগে ওঠেন। শেষে কড়া কফি খেয়ে দুই রাত তিন দিন ধরে জেগে আছেন। তোমরা তাঁর কলজের দুই টুকরো, তোমাদের...'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিল জাহেদ: 'এদিকে বুড়োর বদমেজাজের জ্বালায় আমরা অস্থির। যখন সবাই একে একে ছুটি চাইলাম, কড়া করে ধমক মেরে সবাইকে ছুটি দিয়ে দিল বুড়ো। তারপর...'

জাহেদকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল সলীল, 'দোস্ত, কী বলব, বিকেলে রীতিমতো খ্যাপাটে চেহারায় কনফারেন্স রুমে সবাইকে ডেকে হুকুম দিল, "ছুটি-ফুটি হবে না, আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাদেরকে। দুই-দু'জন সহকর্মী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে, আর তোমরা সবাই..." ইত্যাদি ইত্যাদি। ...চল্ চল্, দেখবি, সঙ্গে করে বিসিআই-এর ফিযিশিয়ান ডক্টর আহমেদ কামালকেও নিয়ে এসেছে বুড়ো। বিসিআই স্যানাটোরিয়ামের স্পেশাল কেয়ার

ইউনিটের দু'জন নার্স সহ।'

জঙ্গলের বামদিকের উঁচু একটা টিলা দেখাল জাহেদ। 'ওই টিলার মাথায় ক্যাম্প ফেলে পায়চারি করছে বুড়ো।'

'বুঝতেই পারছ, সব ফেলে চলে এসেছি সবাই আমরা,' মৃদু হেসে বলল সোহানা। 'কিন্তু জলদি ফিরতে হবে আমাদেরকে। শুধু হেডকোয়ার্টারে কেন, গোটা বাংলাদেশে এখন একজন বিসিআই এজেন্টও নেই!'

অদ্ভুত মিষ্টি লাগল রানার কাছে সোহানার কথাগুলো, সেই সঙ্গে ওর অপরূপ, নির্মল হাসি। তারপরও কান্না পেল ওর। সত্যিই ওরা এতো ভালবাসে ওকে? আর বুড়ো? বুড়োও কি সত্যিই...?

'চলো, যাওয়া যাক,' বলল সোহানা। স্ট্রেচার নিয়ে কয়েকজন পা বাড়াতে যাচ্ছিল, থামতে হলো তাদের।

কয়েকটা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকে।

'ভাই!' ঘাড় ফেরাল রানা চড়া, কর্কশ গলার আওয়াজ পেয়ে।

সর্দার আহম্মদ আলী তার ঘোড়ার ওপর বসে আছে। তার পাশেই আছে সর্দার ইউনূস মোসাদ্দেক ও আলফাজ কুশে। অকৃত্রিম আন্তরিক হাসি তাদের মুখে।

ইউনূস মোসাদ্দেক বলল, 'শেষ পর্যন্ত আপনার ঋণ আমি আর শোধ করতে পারলাম না, বিদেশি বন্ধু। আপনি তো চলে যাচ্ছেন। মেয়েটাকে আমার... নিজের জীবন দিয়েও তো...' চুপ হয়ে গেল অকপট মানুষটা, অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল কঠোর মুখটা চোখের পানি লুকাতে।

'আমরা কৃতজ্ঞ,' বলল আলফাজ কুশে। সলজ্জ হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'যদি আফগান হতেন, তা হলে ঠিক আমার গোত্রের একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে রেখে দিতাম আপনাকে।' ঈসা আজনীবর দিকে তাকাল সে। 'তবে আপনাকে ছাড়ছি না। যদি বিবাহিত না হন তো শীঘ্রি বিয়ে দেব আপনার।'

সলজ্জ হাসল ঈসা আজনবী। হাসিটা দেখে বোঝা গেল

বিবাহিত নয় সে। মৃদু স্বরে বলল, 'পাকিস্তানে ফিরতে হবে আমাকে, জনাব রানার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, পরে দেখা হবে ইনশাল্লাহ্,' বলল আলফাজ কুশে।

'এবার আমাদের যেতে হয়, ভাই,' ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে অপেক্ষমাণ দলের দিকে যাবার আগে বলল আহম্মদ আলী। 'আল্লাহ্ চাইলে আবারও আমরা বুযকাশি খেলব। তবে এরপরের বার দাড়ি ধরে ওরকম জোরে টান দেয়া চলবে না! খোদা হাফেয!'

'খোদা হাফেয!' প্রায় একইসঙ্গে বলল ইউনূস মোসাদ্দেক ও আলফাজ কুশে।

'খোদা হাফেয,' বলল রানা। ওর মন ছুঁয়ে গেছে দেশপ্রেমিক, সাহসী মানুষগুলোর হৃদয়ের অকৃত্রিম উষ্ণতা।

তিন সর্দার রওনা হয়ে গেল তাদের গোত্রের যোদ্ধাদের দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে রানার উদ্দেশে হাত নাড়ছে ওরা। নিহতদের কবর দেবে, আহতদের নিয়ে যাবে পাকিস্তানে, লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে ফিরে আসবে আবার। ফিরবে বুক-ভরা নতুন উদ্যম নিয়ে, হয়তো গোটা দেশটাকে মুক্ত করতে পারবে, সত্যি সত্যিই স্বাধীন হতে পারবে। হয়তো সফল হবে, হয়তো ব্যর্থ হবে তারা। তবে সংগ্রাম শেষ হবে না তাদের আফগানিস্তান থেকে আগ্রাসী বিদেশি শত্রুদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত।

'চল্, রানা,' বলল সলীল।

দু'পাশ থেকে আরও শক্ত করে ওকে ধরল জাহেদ ও সলীল, হাঁটতে সাহায্য করছে। ওদের পাশে পাশে সোহেলকে ঘিরে এগোল সবাই।

টলমল পায়ে হেঁটে চলল রানা। ওর সঙ্গে চলেছে দুর্ধর্ষ, দেশপ্রেমিক, সাহসী একদল সহযোদ্ধা, বন্ধু – সত্যিকারের খাঁটি মানুষ।

টিলার মাথায় এদিকে চেয়ে দাঁড়ানো বুড়োর মুখে একগাল হাসি

দেখা দিয়েছে রানাকে হাঁটতে দেখে। নিচু গলায় ইলোরাকে বললেন, 'এই দেখো, ব্যাটার কাণ্ড দেখো! এই বিরান অঞ্চলেও কেমন একটা সুন্দরী মেয়ে জুটিয়ে ফেলেছে!'

রানার পাশে ফারাকে দেখে হাসি ফুটল ইলোরার মুখে।

টিলায় উঠে রানা দেখতে পেল বুড়ো বাঘকে। তাঁবুর সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। ওদের দেখে পায়চারি থামিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন, সোহেলকে কয়েক মুহূর্ত দেখে রানার সামনে থামলেন, খুকখুক করে কেশে নিয়ে বললেন, 'মেডিকেল লীভ লাগবে তোমারও।'

ডাক্তার আহমেদ কামাল ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সোহেলকে নিয়ে। তাঁকে সাহায্য করছে ফারা ও নার্স দু'জন।

সেদিকে চট্ করে একবার তাকিয়ে ঢোক গিলল রানা। 'সার...'

'কী অবস্থা, ডক্টর?' ডাক্তার আহমেদ কামালের দিকে ফিরলেন রাহাত খান।

'অন্তত একটা মাস কমপ্লিট বেড রেস্ট নিতে হবে, সার,' বললেন ডাক্তার। 'তবে সেরে উঠবে। ইমিডিয়েটলি হাসপাতালে নেয়া দরকার।'

'অ্যাই, তোমরা ক্যাম্প গোটাও,' তরুণ এজেন্টদের নির্দেশ দিলেন রাহাত খান। 'পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি আমরা। ...সলীল, জাহেদ, সোহানা, রূপা – তোমরা সিনিয়ররা তদারকি করো।'

সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আবার রানার দিকে তাকালেন তিনি। সামনে ঝুঁকে এলেন, তারপর হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন ওর কপালে। নিচু গলায় বললেন, 'মাই হার্ট অলওয়েয উইশেয ইউ অল দ্য বেস্ট, মাই সান।'

পানি চলে এল রানার চোখে।

'থ্-থ্যাঙ্ক ইউ, সার,' চট্ করে কমব্যাট ইউনিফর্মের আস্তিনে চোখের পানি মুছল রানা। বুকটা কান্নায় কান্নায় ভরে গেছে ওর

পিতৃসম বুড়োর আদর পেয়ে।

'বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো যে!' নিজেকে সামলে নিয়ে ধমক মারলেন রাহাত খান, 'তুমিও তো আহত, টেক প্রপার রেস্ট!' ভাবাবেগের কারণে দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে সেই আগের কঠোর ভাবমূর্তিতে ফিরে গেছেন তিনি।

বারোদিন পর।

ঢাকা, বিসিআই হেডকোয়ার্টার।

সকাল এগারোটা।

জাহেদের অফিস।

জড় হয়েছে সলীল, সোহানা, রূপা ও আরও বেশ কয়েকজন। ইতিমধ্যেই জাহেদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, যেহেতু ওরই ঘরে বসেছে আড্ডা, বেচারার ঘাড় ভেঙে ক্যান্টিন থেকে চা-নাস্তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তরুণ এজেন্টরাই এ-ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছে বেশি।

একটু আগে বিসিআই-এর স্যানাটোরিয়ামের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সোহেলের কেবিনে গিয়ে ব্যান্ডেজ মোড়া, ব্যথায় কাতর বন্ধুকে দেখে এসেছে ওরা সবাই। বারবার কয়েদখানা থেকে ওকে লুকিয়ে বের করে নিয়ে যাবার জন্য কাকুতি মিনতি করছিল সোহেল। কিন্তু কে অমান্য করবে মেজর জেনারেল রাহাত খানের আদেশ? কাজেই ওর অনুরোধ পানিতে ভেসে গেছে। রানা একবার ভেবেছিল লিফটম্যানকে ঘুষ দিয়ে... কিন্তু না, বসের গম্ভীর চেহারাটা মনে আসতেই আর সাহসে কুলায়নি ওর।

সোহেলকে নিয়েই কথা হচ্ছে এখন, জোর তর্ক বেধে গেছে। মতবিরোধের কারণে রীতিমতো দু'ভাগ হয়ে গেছে উপস্থিত বিসিআই এজেন্টরা। নবীনরা বলছে, বসের আদেশ অমান্য করবেন না সোহেল ভাই। সিনিয়র এজেন্টরা বলছে, মরার শখ

নেই সোহেলের যে, বুড়োর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করবে ও পড়ে পড়ে। ঠিকই কোনও না কোনও উপায়ে ডাক্তার-নার্সদের সতর্ক চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাবে ও, দেখে নিয়ো।

তর্ক জমে উঠেছে। কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান। এই যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ দরজার নীল সুতির পর্দা দুলে উঠতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল জাহেদ। ব্যান্ডেজ মোড়া মূর্তিটাকে ধীর পায়ে, খুঁড়িয়ে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ভিতরে ঢুকতে দেখে চোখ কপালে উঠল ওর।

রানা বিজয়ীর আন্তরিক হাসি চেপে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'বলেছিলাম না ওই মমি ব্যাটা ঠিক হাসপাতাল থেকে পালাবে, বুড়োর ভয় আটকে রাখতে পারবে না ওকে?'

চুপচাপ ব্যান্ডেজ মোড়া সোহেল ভাইকে দেখছে বিসিআই-এর নতুন এজেন্টরা। হাসি চাপতে পারছে না কেউ। স্বস্তিতে হাসছে ওরা, সোহেল ভাই তা হলে সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠছেন।

সচকিত হয়ে মিমি বলল, 'চলো, সবাই। বুড়োদের এবার একটু গল্প করার চান্স দেয়া উচিত।'

বেরিয়ে গেল তরুণরা।

'তা হলে শেষ পর্যন্ত এসেই পড়লি তুই, শালা?' ধমকের সুরে বলে উঠল জাহেদ। 'যাক শালা, ভালই করেছিস, আমাদের জিতিয়ে দিয়েছিস!'

পরক্ষণে রানার জোরাল চাপড় খেয়ে গাল কুঁচকে গেল ওর।

সানন্দে হুঙ্কার ছাড়ল রানা: 'সোহেল আবার কবে তোর শালা হলো রে, জাহেদ, ভায়রা-ভাই আমার! ও তো আমার রিজার্ভ করা শ্যালক!'

'গেছিরে!' রানার আরেকটা আদরের চাপড় খেয়ে ককিয়ে উঠল জাহেদ। 'আমি তো চাচা বলতে গিয়েছিলাম, মুখ ফসকে...' সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিত সে রানার কান মুচড়ে ধরে, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না সোহেলের কারণে।

'হ্যাঁ, বল্!' জাহেদের পাশে টেবিলের ওপর বসে পড়ল সোহেল, ঘাড় ফিরিয়ে স্নেহপরায়ণ চাচার মমতামাখা, রক্তলাল, জিজ্ঞাসু, ফোলা চোখের দৃষ্টিতে তাকাল জাহেদের দিকে। 'তোর খালাতো চাচার ফুপাতো ভাইয়ের মামাতো সম্বন্ধী – মানে তোর চাচা তো আমি বটেই! বল্, ভাতিজা, একটা সিগারেট হবে?'

অনুমতির তোয়াক্কা না রেখে টেবিল থেকে জাহেদের প্যাকেটটা তুলে নিল সোহেল।

দাঁত খিঁচাল জাহেদ, ভয়ঙ্কর একটা ভেঙচি কাটল সোহেলের দিকে চেয়ে। বিড়বিড় করে বলল, 'নাস্তার বিলটা ওরা আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে; না হলে, শালা হতভাগা, বদমাশ, হাড়-কেপ্পন, তোকেই বিল দিতে বলতাম।'

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

আবার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এসেছে বিসিআইতে।

ঠিক তখনই ইন্টারকমে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ ভেসে এল: 'বোধহয় কোনও কাজ নেই তোমার হাতে, জাহেদ? সোহেলকে বিদায় করে যত শীঘ্রি সম্ভব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

জানল কী করে বুড়ো!

নিঃশব্দে সুড়সুড় করে জাহেদের কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করল সবাই, সবার আগে রানা, সোহেল ও সলীল; তাদের পিছন পিছন রূপা ও সোহানা। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল ঘর।

দুরু দুরু বুকে প্রস্তুতি নিচ্ছে জাহেদ বসের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে বলে।

(সমাপ্ত)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

গুপ্ত সংকেত-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্যারিস। প্রিয় পাঠক, জান বাঁচানোর তাগিদে মারাত্মক এক গোপন মিশনে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন আপনি। আপনার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ ও চার্চ। আপনার সামনে নিষিদ্ধ ধর্মীয় আচার, গোপন দলিল, রহস্যময় সিম্বলিজম ও ধাঁধায় ভরা সম্পূর্ণ নতুন একটা জগৎ খুলে যাচ্ছে। পদে পদে আপনি হতচকিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। মাসুদ রানার ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করতে গিয়ে এই যে মহা বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন, এই অবস্থা থেকে আপনাকে উদ্ধার করবে কে?

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন – প্রয়োজনে ২টি কাগজ নিন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ আফজাল হোসেন

ভাঠাটিকর-১৭, টিলাগড়, সিলেট।

সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। অনেক দিনের লোভকে সামলে রেখে একসাথে পড়লাম 'রানা'র অসাধারণ কয়েকটি বই। আই লাভ ইউ ম্যান, অগ্নিপুরুষ, মুক্ত বিহঙ্গ, দংশন, শ্বেত সন্ত্রাস, কালো ফাইল, সংকেত, সাগর কন্যা – বইগুলো পড়ে নিজেকে প্রচণ্ড ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, 'রানা' নামক চরিত্রটির আরও গভীরে-প্রবেশ করতে পেরেছি। প্রায় প্রত্যেকটি বই-ই ছিল আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণে সৃষ্টি। তাই আপনাকে শুধু ধন্যবাদ দিব না, আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞও বটে।

আর, হ্যাঁ, কাজীদা, 'আই লাভ ইউ ম্যান' বইটির শেষে সোহানাকে দেওয়া রানার শপথটি আপনার মনে আছে তো?

☆ না তো! একদম ভুলে গেছি!

মিসেস তারানা ইসলাম

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

সালাম নিবেন। বেশ কয়েকদিন পর লিখতে বসলাম। শেষ হাসি, বন্দি রানা, নাটের গুরু বইগুলোর ধারাবাহিকতায় পড়লাম 'আসছে সাইক্লোন'। নামের সঙ্গে মিল রেখেই তৈরি করেছেন প্রায় সম্পূর্ণ কাহিনি। তাই বইটিকে 'রানা'র বই হিসেবে খুব একটা ভাল নম্বর দিতে পারছি না। আরেকটা বিষয় – 'মাসুদ রানা'র বইগুলোর মধ্যে এই প্রথম বোধহয় কোনও মেয়ের ক্ষেত্রে 'মাসুদ ভাই' সম্বোধনটা পাল্টে গিয়ে 'রানা' সম্বোধনে পরিণত হয়েছে। তবে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রহস্যে ঘেরা 'বসদের বস'কে সাদামাটাভাবে উপস্থাপনের পরও বইটির জন্য ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ বইটির

আলোচিত চরিত্র 'লাফাজা'। কল্পনাতেও আসেনি লোকটি রানার সাহায্যকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। পরিশেষে এখনও মাসুদ রানা চালিয়ে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

☆ আপনাকেও।

মোঃ শাহীন আক্তার হাবীব

৬৪/এ, স্বামীবাগ, ঢাকা ১২০৩।

প্রথমেই সালাম এবং শ্রদ্ধা নিবেন। 'নাটের গুরু' ও 'আসছে সাইক্লোন' পড়লাম। আসছে সাইক্লোন গতানুগতিক। নামের কোনও সার্থকতা খুঁজে পাইনি, এমনকী বই-এর পিছনের কাহিনি-সংক্ষেপের সঙ্গেও মিল খুঁজে পাইনি। এটাকে বিসিআই...লাভস্টোরি বলতে পারেন বড়জোর। 'বারহাপ্পা কাহিনি-ও বলা যায়' – এগুলো বইতে কোথায়? প্রচ্ছদ খুব সুন্দর হয়েছে। 'ভিক্টর নীল' এই ছদ্মনামের আড়ালে কে আছেন, বলবেন কী? এবার আসি 'নাটের গুরু' প্রসঙ্গে। প্রচ্ছদ ভাল হয়নি। কাহিনি তেমন না জমলেও হঠাৎ করে গিল্টি মিয়াকে পেয়ে গেলাম। পেট ভরে হেসেছি। শুধু এইটুকুই বলব গিল্টি মিয়ার কারণেই 'নাটের গুরু' ভাল লেগেছে। ধন্যবাদ কাজীদাকে, অনেক দিন পর গিল্টি মিয়াকে উপহার দেয়ায়।

☆ আসছে সাইক্লোন বইটি রচনার এক পর্যায়ে 'বারহাপ্পা' নামটি বদলে 'লাফাজা' করা হয়। তখন খেয়াল করা হয়নি যে, চতুর্থপ্রচ্ছদে আগেই 'বারহাপ্পা' হিসেবে ছাপা হয়ে গেছে নামটি। তালগোল পাকিয়ে ফেলার জন্য আমরা দুঃখিত।

সাকিব মাহমুদ

ফরিদপুর।

আপনাকে এবং সকল পাঠক-পাঠিকাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একটা কথা না বলে পারছি না, আপনি চমৎকার কৌতুক করেন। আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। 'আসছে সাইক্লোন' বইটি শেষ করলাম এক নিঃশ্বাসে। ভাল লেগেছে। বইটির প্রচ্ছদও চমৎকার হয়েছে। ভাল কথা, গিল্টি মিয়া ও সোহানা কি আমাদের ভুলে গেছে?

☆ হ্যাঁ। একদম। কাজে ব্যস্ত আছে কিনা।

শাহরিয়ার

ক্যাডেট নং-১৩১৪, পাবনা।

কাজী দা, আমার সালাম নিবেন। আপনার কি মনে আছে মিষ্টি মেয়ে তেরেসার কথা। আয় হায়, বলেন কি? রানার মেয়ের কথা মনে নেই? তেরেসা এখন অনেক দুষ্টু হয়েছে, সে বারবার তার বাবাকে দেখতে চায়। শীলাও আশায় আশায় বসে থাকবে কবে রানা আসবে। Please, নিয়ে যান না রানাকে শীলা দ্য হোমায়রার কাছে। আর ভাল কথা, বাংলার কিছু উজ্জ্বল তরুণ মেজর শামীম, মেজর হাসান, গোলাম পাশা বা আধা স্কট আধা আইরিশ জিমদের মত তরুণরা কি স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে? তা ছাড়া প্রতি পর্বেই নতুন নতুন মেয়ে আসে রানার জীবনে, কিন্তু পুরানো

প্রেমিকাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে দোষ কী? আর একটা কথা লানি সাটো কি ভাল হয়েছিল? ওর গলা কি আবার ঠিক হয়েছে? ক্যাডির মত আমিও ওর কণ্ঠ আর রান্নার পাগল কিনা। পরিশেষে রানার পাঠকদের আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা।

★ তোমার স্মরণশক্তি তো দারুণ! এত কিছু মনে রাখ কী করে? আমার তো এসব কিছুই মনে নেই, অনেস্ট। কাজেই, তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমার নিজেকেই দিয়ে নিতে হবে।

মোঃ ফখরুল ইসলাম

সুজাপুর সদর, নোয়াখালী।

এটা কি কোনও কথা হলো, কাজীদা? আমাদের তো সহ্যের একটা সীমা আছে, না কি? এত চমক আর টান টান উত্তেজনায় কোন্‌দিন যে আমাদের নার্ভ ছিঁড়ে ছাতু হয়ে যায়, আল্লাই মালুম। কাজীদা, আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কোন বইটির কথা বলছি? হ্যাঁ, 'আসছে সাইক্লোন'।

বইটি হাতে পাওয়া মাত্র এক প[illegible]কে পড়ে ফেললাম। এক কথায়, আমার ভাষায় বইটি 'ঝাঁকানাকা' হয়েছে। এরকম একটি দম ফাটানো বই-এর জন্য আপনি আমার উষ্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। অভিনন্দনটা একটু উষ্ণ দিলাম। কারণ সাইক্লোন এ ভিজিয়ে ভিজিয়ে আপনি আমার মাসুদ ভাই-এর নির্ঘাত সর্দি বানিয়ে ফেলেছেন। বেচারার শরীরের প্রতি কিছুটা যত্নশীল হলে মনে হয় ভাল হত। হাড়-গোড় ভেঙে বেচারার (মাসুদ রানা) অবস্থা তো করুণ।

অবশেষে সুন্দর বইটির জন্য সেবা পরিবারের সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা। আমার জন্য দোয়া করবেন।

★ দোয়া রইল।

আঁখি, ইমু সি.ইউ.এফ.এল,

বাসা নং ই/১১-২, রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৪০০০।

সবাই মাসুদ রানার এ-ত প্রশংসা করে যে, শত চেষ্টা করেও প্রশংসা করার মত আর কোনও বাক্য খুঁজে পেলাম না। ইস্, মাসুদ রানার মত যদি সত্যিই কেউ থাকত, তবে পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে যেত। তাই না?

আর একটা কথা, অন্যদের মত আমরাও মাসুদ রানার ভক্তদের সাথে পেন ফ্রেন্ডশিপে আগ্রহী। দয়া করে আমাদের পুরো ঠিকানাটা ছেপে দিবেন কি? সেবা পরিবারের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

পুনশ্চ: বইয়ের প্রচ্ছদগুলো কি আরও একটু সুন্দর করা যায় না? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় একই রকম। অনেক সময় মনমাতানো বইয়ের, মন উড়ানো প্রচ্ছদ দেখলে খুবই কষ্ট হয়!

★ যেমন? ঠিক কী রকম চাইছেন একটু বুঝিয়ে লিখলে উপকৃত হতাম। মানে, জানতে চাইছি, কোন্ প্রচ্ছদগুলো আরও সুন্দর করা যেত, অথচ হয়নি। ...পূর্ণ ঠিকানা ছেপে দিলাম, আশা করি বন্ধু মিলে যাবে।

মাসুদ রানা

সহযোদ্ধা

কাজী আনোয়ার হোসেন

আফগানিস্তানের উত্তর-পূবে, কোওতাল-ই দোরা'র কাছে হিন্দুকুশ পর্বতমালার কোথাও আমেরিকান আর্মির হাতে বন্দি হয়ে আছে রানার প্রাণের বন্ধু সোহেল আহমেদ,আহত।

রাহাত খান মিটিং ডেকে উপস্থিত এজেন্টদের জানিয়ে দিলেন, বাংলাদেশ সরকার নিরুপায়, সোহেলকে উদ্ধার করার কোন উপায় খোলা নেই।

"উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।"

সোহেলকে উদ্ধার করতে আফগানিস্তানে ঢুকল রানা একা,নিশ্চিতভাবে জানেও না সোহেল কোথায় বন্দি। তথ্যের জন্য স্থানীয় আফগান সর্দারদের উপর নির্ভর করতে হবে ওকে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস অর্জন করবে কি করে ও? ওকে মেরে ফেলা হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলছে সর্দারদের মধ্যে।

তারপর মূমুর্ষ সোহেলের হদিশ পেল রানা।

কিন্তু একা অসহায় রানা আগ্রাসী সাঁজোয়া বহরের বিরুদ্ধে কি করবে? সোহেলকে তো বাঁচাতে পারবেই না, নিজেরও মরতে হবে ওর। কিছুই করার নেই রানার।

কিন্তু......

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০

শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০